প্র. না. বি-র নিকৃষ্ট গল্প

মিত্র ও ঘোষ
১০নং শ্যামাচরণ দে স্ট্রীট, কলিকাতা—১২

উৎকৃষ্ট গল্পের লেখক

৺বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের

স্মৃতির উদ্দেশে

এই নিকৃষ্ট গল্পগুলি উৎসর্গীকৃত হইল

ভূমিকা

সহৃদয় পাঠক,

এই রচনাগুলিকে আমার নিকৃষ্ট গল্পের শ্রেষ্ঠ উদাহরণ মনে করিও না। এগুলির চেয়েও নিকৃষ্ট গল্প আমি লিখিতে পারি, অনেক লিখিয়াছি। শীঘ্রই সেগুলি 'নিকৃষ্টতর গল্প' নামে আত্মপ্রকাশ করিবে।

প্র. না. বি.

সংক্ষিপ্ত আলোচনার আদর্শ

বহু কার্যভারপীড়িত দরদী সমালোচক, তোমার দুঃখ ও সমস্যা আমি কতকটা বুঝিতে পারি। যেহেতু আমি নিজেও একজন ভুক্তভোগী। তোমার হাতে নিত্যই কত বই সমালোচনার জন্য আসিয়া থাকে। মনে করো—এ বইখানাও আসিল। এখন তুমি কি লিখিবে? পত্রিকায় সংক্ষিপ্ত সমালোচনা লিখিবার জন্য কেহ টাকা দেয় না, আম উৎসর্গের দক্ষিণা আম, বইখানা মাত্র দেয়। ঐখানেই তোমার সুযোগ ও অসুবিধা। সুযোগ এই জন্যই যে টাকা দিতে অপারগ বলিয়া সম্পাদক খুব জোর করিতে পারে না—তোমাকে স্বাধীনতা দিতে বাধ্য হয়। আর অসুবিধা এই যে, বিনা পয়সায় পণ্ডশ্রম করিতে কে চায়? তবু যে তুমি এই কষ্ট স্বীকার করিয়া থাকো—তাহার কারণ সম্পাদক এ উপলক্ষ্যে তোমাকে টাকা দিতে না পারিলেও অন্য উপলক্ষ্যে পুষাইয়া দেন, মাঝে মাঝে তোমার এক-আধটা রচনা ছাপিয়া কিছু দাক্ষিণ্য করেন। তাঁহাকে ছাড়া যেমন তোমার চলে না, তেমনি তোমাকে ছাড়িলেও তাঁহার অচল। কাজে কাজেই তুমি সমালোচক।

কংগ্রেস ভলান্টিয়ার যেমন কিছুদিন পরে কংগ্রেস সমিতির সেক্রেটারি, এবং তারপরে নির্বাচনপ্রার্থী দেশসেবক, সংক্ষিপ্ত সমালোচকের বিবর্তন ঠিক সেইরূপ। প্রথমে সংক্ষিপ্ত সমালোচক, তারপরে বিস্তৃত গল্প-লেখক, তারপরে একেবারে গ্রন্থকার। নিন্দা করিতেছি ভাবিও না—আমিও ঐ বিবর্তন ধরিয়া চলিয়াছি। কাজেই তোমার দুঃখ ও সমস্যা আমি না বুঝিব তো কে বুঝিবে?

এখন, তোমার কর্তব্যভার লাঘব উদ্দেশ্যে আমি একটি সংক্ষিপ্ত সমালোচনা লিখিয়া ছাপিয়া দিতেছি—সামান্য কিছু ভাষান্তর করিয়া তুমি সম্পাদকের হাতে দিতে পারো—তিনি পড়িয়া বলিবেন যেমন নিরপেক্ষ তেমনি মৌলিক, এক কথায় আদর্শ সমালোচনা।

গল্প / হাস্য
"গ্রন্থখানিতে ত্রিশটি———আছে। গল্পগুলি———রসাত্মক, পড়িতে
প্রবন্ধ / করুণ

হাস্য
বসিলে——সম্বরণ করা যায় না। গ্রন্থখানার প্রচার অনিবার্য, যেহেতু পাইবামাত্র
অশ্রু

আমার টেবিল হইতে কে লইয়া গিয়াছে। এক শ্রেণীর বই আছে বুমেরাং জাতীয়, টেবিলের বই আবার ঘুরিয়া টেবিলে আসে। এ বই সেরূপ কিনা

বুঝিতে পারিতেছি না—এখনো ঘুরিয়া আসে নাই। লেখকের ভাব ও ভাষা পুরাতন কিন্তু লেখকের নাম ইতিপূর্বে শুনিয়াছি মনে হয় না, তাঁহার ভবিষ্যৎ দিবাভাগের ন্যায় উজ্জ্বল না হইলেও অর্দ্ধচন্দ্র-দীপ্ত রাত্রির ন্যায় যে উজ্জ্বল তাহাতে সন্দেহ নাই। রচনাগুলি পড়িয়া মনে হয় লেখক বাঙালী সমাজের গুণে মুগ্ধ এবং লেখক একজন খাঁটি বাঙালী অতএব দেশে এখনো যে-কয়জন খাঁটি বাঙালী আছেন—তাঁহারা বইখানার আদর করিতে ভুলিবেন না। রচনায় সামান্য সামান্য যে-সব ত্রুটি-বিচ্যুতি আছে প্রকাশক, ছাপাখানা ও দপ্তরীতে মিলিয়া তাহা পূরণ করিয়া দিয়াছে। এক একবার মনে হয় ছাপার অক্ষরগুলি না থাকিলে বইখানা ডায়ারী হইতে পারিত এবং তাহাতে আদর বাড়িত বই কমিত না। মূল্য পাঁচ টাকা বেশী বলিয়া মনে হইলে সিকি করিয়া মোট পাঁচ সিকায় (১৯৩৯-এর মূল্যমান অনুসারে) পরিণত করিলেই মনে সান্ত্বনা পাইবেন। লেখকের সঙ্গে অন্য বিষয়ে আমাদের মতভেদ থাকিলেও গল্পের নাম-করণে কিছুমাত্র দ্বিমত নাই! সত্যই এগুলি নিকৃষ্ট গল্পের প্রকৃষ্ট উদাহরণ—একমাত্র প্রমথনাথ বিশীর রচনা ছাড়া আর কোথাও এসব উদাহরণ দেখিয়াছি মনে পড়ে না। বইখানার জন্য আমরা প্রকাশক, ছাপাখানা, কাগজ-ব্যবসায়ী সকলকেই ধন্যবাদ জ্ঞাপন করিতেছি।"

প্র. না. বি.

সূচীপত্র

চেতাবনী

বিন্নুনি বাপ-মা মরা মেয়ে। তার সংসারের অবস্থা ভালো নয়, থাকবার মধ্যে আছে বাড়ীখানা, পাড়াগাঁ বলেই চলে, আর থাকবার মধ্যে আছে তার মুখের হাসিটা। যখন তার বয়স অল্প ছিল, তখন যারা তার হাসি দেখে খুশী হ'ত এখন তারা বলে—আ মলো যা, বিয়ের বয়স হ'ল, তবু হো হো হাসি যায় না। তারা বলে—আরে এত হাসবার কি আছে, যার তিন কুলে কেউ নেই তার আবার হাসি কিসের? বিন্নুনি সেকথা শুনে আরো উচ্চস্বরে হাসে। বৃদ্ধেরা মুখ ভার করে সরে যায়। বিন্নুনির বিয়ের বয়স হ'য়েছে সত্য, গাঁয়ের মেয়ের পক্ষে তো বটেই, এমন কি সহরের মেয়েকেও ও বয়সে আর অবিবাহিত রাখা যায় না। শ্রীদামের সঙ্গে তার বিয়ের কথা হ'য়েছিল তখন তার বাপ বেঁচে ছিল। এমন সময়ে তার বাপ মলো—শ্রীদামের বাপ বেঁকে বসলো—বল্‌লো, অমন মেয়েকে ঘরে এনে কোন সুখ নেই, খুব সম্ভব শ্রীদামের মত ভিন্ন, কিন্তু হলে কি হয়—বিয়ের কর্তা বাপ—শ্রীদাম মুখ ভার করে, মন ভার করে, কিন্তু কিছু বল্‌বার সাহস নেই। শ্রীদামদের অবস্থা বেশ ভালো, জোত জমা অনেক। বিন্নুনির কিছু বলতে কিছু নেই, আছে হাসিটা, তাতে শ্রীদাম ভুলতে পারে, কিন্তু তার স্বচ্ছল অবস্থার বাপ ভুলতে যাবে কেন? শ্রীদাম ভাবে আহা ওর অবস্থা যদি ভালো হ'ত। আবার কখনো কখনো ভাবে আহা আমাদের অবস্থা যদি ওর মতো হ'তো, তবে বোধ করি বাধা হ'ত না।

বিন্নুনি সব বোঝে, সব জানে, কিন্তু তার অদম্য হাসি বাধা মানে না—সে হী হী ক'রে হেসে ওঠে। বৃদ্ধেরা বলে নির্লজ্জ, যুবকরা বলে—মিষ্টি, শ্রীদাম মনে মনে বলে—ঐ হাসি চিরকাল দূর থেকেই শুনতে হবে, ভাবে আহা আমাদের অবস্থা ওর মতো হয় না কেন?

এমন সময় গাঁয়ে রটে গেল যে, আগামী ১৫ই শ্রাবণ চেতাবনী হবে, চেতাবনী কিনা সেদিন পৃথিবী ওল্‌টাবে, গাছপালা বাড়ীঘর নদীনালা মায় জমিদারের বাড়ী শিবমন্দির সব ধ্বংস হবে। ঐ দিন নাকি কলিকালের শেষ। গাঁয়ের সর্বত্র ঐ এক কথা—অন্য কথা নাই। সকলেই বলে—ভাই আর অন্য কথায় কাজ কি? এবার তো সব শেষ হতে চল্‌ল, ১৫ই শ্রাবণ যে চেতাবনী

হবে। হাটে বাজারে, মাঠে ঘাটে, স্কুলে টোলে সর্বত্র আসন্ন চেতাবনীর আলাপ। গাঁয়ে একখানা বাংলা খবরের কাগজ আসে। ডাকঘরেই সেখানা খুলে সকলে পড়া সুরু করে, যার কাগজ তার কাছে পরদিন যায়। সেই কাগজেও নাকি চেতাবনীর খবর আছে। পোষ্ট মাষ্টার উচ্চস্বরে পড়ে সকলকে বুঝিয়ে দেন যে, চেতাবনী কেবল আমাদের জোড়াদীঘি গাঁয়ে হবে না, পৃথিবীর যেখানে যত সহস্র গ্রাম আছে, সর্বত্র চেতাবনী হবে, এমন কি কল্‌কাতা সহরও বাদ যাবে না। খবরের কাগজে চেতাবনীর সংবাদ আছে শুনে সকলের আশা ভরসা নির্মূল হ'ল—খবরের কাগজের কথা তো মিথ্যা হবার নয়। অনিবার্য চেতাবনীর আশঙ্কায় সকলের মুখ শুকিয়ে গেল—সম্মুখে মাত্র আর পনেরোটি দিন, তারপর ১৫ই শ্রাবণ মধ্যরাত্রে—সে মুহূর্তে যা ঘটবে, নাঃ, আর কেউ ভাবতে পারে না।

কেবল বিন্নুনির মুখের হাসি বাগ মানে না, ভয়ের কালো পাথর ঠেলে সে হাসি উছলে ওঠে। মেয়েরা শুধোয়—ওলো এত হাসবার কি পেলি? মরতে চল্‌লি তবু হাসি থামে না?

বিন্নুনি বলে—সবাই ম'লে দুঃখটা কিসের?

একজন বৃদ্ধা উত্তর দেয়—সবাই মরতে যাবে কেন?

বিন্নুনি বলে—নইলে চেতাবনী কিসের?

মেয়েরা ভাবে তাও তো বটে। তারা সদুত্তর খুঁজে না পেয়ে চলে যায়—বিন্নুনির হাসি তাদের পিছন থেকে ধাক্কা মারে—তারা মনে মনে ভাবে—আ মলো যা!

জমিদার বাড়ীর ঝি সুখদা, বয়স তিনকুড়ি দশের কম হবে না, একদিন জমিদার কন্যাকে বল্‌ল—শুনেছো দিদিমণি, পৃথিবী ওল্‌টাবে।

দিদিমণি বল্‌ল—তাই তো শুনছি।

সুখদা বল্‌ল—আমি এসে তোমাদের ঠাকুরঘরের দরজায় ধর্ণা দিয়ে পড়ে থাকবো।

দিদিমণি বলে—তাতে কি লাভ হবে? পৃথিবী ওল্‌টালে কি ঠাকুরঘর বাঁচবে?

সুখদা জিব্ কেটে বলে—অমন কথা বল্‌তে নেই।

এই বলে সে প্রস্থান করে, বেশ বুঝ্‌তে পারা যায় ঠাকুরের প্রতি তার অচলা ভক্তি সত্ত্বেও ঠাকুরের অচলত্বের প্রতি তার সন্দেহ জন্মায়।

সকলে গিয়ে একদিন টোলের পুরুৎ ঠাকুরকে ধরলো, বল্‌লো, দেখতো দাদাঠাকুর তোমার শাস্তরে কি বলে ?

শাস্ত্রে চেতাবনীর খবর আছে কি না তা পুরুৎ ঠাকুরের জানবার কথা নয়—কারণ শাস্ত্রের সঙ্গে তার পরিচয় অল্পই। কিন্তু তাই বলে শাস্ত্রে নেই বলা চলে না। যে কথা সবাই জানে শাস্ত্রে তা না থাক্‌লে চলবে কেন ? যদি সত্যই পৃথিবী ওল্‌টায় তা হলে কি আর শাস্ত্রের উপরে কারো আস্থা থাকবে ? তাই পুরুৎ ঠাকুর মুখ গম্ভীরতর ক'রে বলে, সংবাদ সত্য, তারপর বলে, তোমাদের খবরের কাগজে বের হ'বার অনেক আগেই আমি জানতাম, কেবল তোমরা ভয় পাবে বলেই এতকাল বলিনি।

সকলে হতাশ হয়ে ফিরে আসে। কারো আর সংশয় থাকে না।

এই ঘটনার পরদিন মহকুমা সহর থেকে পাটের হাকিম গাঁয়ে এলো। পাটের হাকিম তো আর টোলের পুরুৎ ঠাকুর নয়, তার কাছে সবাই যেতে পারে না। গাঁয়ের চার পাঁচজন মাথাওয়ালা লোক হাকিম সাহেবের দরবারে গিয়ে দেখা দিল, শিষ্ট সম্ভাষণাদির পরে শুধোলো—হুজুর কি সব কথা শুনছি !

হাকিম সাহেব আগেরবারে এসে দফাদারের কাছ থেকে পাঁচ টাকা ঘুষ নিয়েছিল, হঠাৎ তার মনে হ'ল সেই কথাই বা এরা শুনে থাকবে। এরকম ক্ষেত্রে কি উত্তর দেওয়া যায় ভাবছে, এমন সময়ে সরকারী ডাক্তার ব্যাখ্যা করে বল্‌ল—সবাই বলছে যে, ১৫ই শ্রাবণ নাকি—

আর বলতে হ'ল না, পাটের হাকিমও কথাটা শুনেছে, বিশেষ যেকথা সবাই বল্‌ছে তা পাটের হাকিমের পক্ষে না জানা সম্ভব নয়।

সে বল্‌ল—হাঁ, তাই তো শুনছি।

সরকারী ডাক্তার আবার শুধোলো—কল্‌কাতায় কি শুনলেন ?

হাকিম সাহেব গত ছয় মাসের মধ্যে কল্‌কাতায় যায় নি, কিন্তু সেকথা কি এতগুলো লোকের কাছে স্বীকার করা চলে ?

সে বল্‌ল—কল্‌কাতাতেও ঐ কথাই শুনে এলাম !

হাকিম ভাব্‌লো—ভাগ্যে বিপরীত কথা বলে ফেলি নি, তা হলে লোকে কল্‌কাতায় যাওয়ার কথাটাতেই অবিশ্বাস করতো।

হতাশ ভদ্রমণ্ডলী বল্‌ল—তা হ'লে—

হাকিম বল্‌ল—তাহলে আর কি ! সবই তো বুঝতে পারছেন !

সকলে মুখ কালো ক'রে ফিরে এলো।

পথে বিন্নুনির সঙ্গে দেখা, সকলের মুখের অবস্থা লক্ষ্য ক'রে তার হাসি আরও যেন বেশী ক'রে উচ্ছল হয়ে উঠ্‌ল—

সরকারী ডাক্তার বল্‌ল—ঐ হাসি নিয়েই মরবি।

বিন্নুনি বল্‌ল—তোমরা মুখ গোমরা ক'রে থেকেই কি বাঁচবে নাকি?

ডাক্তারের উত্তরহীন অসহায় অবস্থা লক্ষ্য ক'রে বিন্নুনির হাসি ঝলকে উঠ্‌ল—নিস্তব্ধতার মেঘে শব্দের বিদ্যুতের মতো। শাস্ত্র ও রাজসরকারের প্রতিনিধি সবাই যখন স্বীকার করলো, চেতাবনী অনিবার্য ও আসন্ন, তখন সকলের মন থেকে সংশয়ের শেষ বিন্দুটি অপসৃত হ'ল। অতঃপর সকলে চেতাবনীর জন্য প্রস্তুত হ'তে সুরু করলো।

২

চেতাবনীর আশঙ্কায় সকলেই নিজ নিজ জমি-জমা বিক্রি করতে আরম্ভ করলো, কেবল বসতবাড়ীটুকু রাখলো। গোটা পৃথিবীটাই যখন ওল্‌টাবে আর তা যখন এত শীগ্‌গীর, জমি-জমা দিয়ে আর কি দরকার। সবাই বিক্রেতা, কাজেই জমি-জমার দর পড়ে গেল, কেনে কে? কিন্তু এখানে প্রশ্ন হ'তে পারে, তবে লোকে কিনছেই বা কেন? ওটা বোধকরি মানুষের অভ্যাস। সস্তায় কোন জিনিষ পেলে কিনে ফেলাই তার স্বভাব। তাই যে কিনলো সে স্বভাবের তাগিদেই কিনলো—নতুবা আর কোন হেতুবাদ তো দেখা যায় না। অন্যান্য লোকের সঙ্গে শ্রীদামের বাপও জমি-জমা জলের দরে ছেড়ে দিলো। আসন্ন চেতাবনীর মুখে সবাই বেশ হাল্কা হ'য়ে যাত্রা করবার উদ্দেশ্যে প্রস্তুত হ'ল।

চরম বিদায়ের কালে গাঁয়ের লোকের যেখানে যত আত্মীয়-স্বজন ছিল, সবাই এসে উপস্থিত হল। জমি-জমা বিক্রি ক'রে যে যা পেলো তাই দিয়ে ধুম খাওয়া দাওয়া সুরু হ'ল, সবাই বলে টাকা কড়ি জমিয়ে রেখে আর কি ফল—সকলকে পেট ভ'রে খাইয়ে নিই। কিন্তু এ খাওয়া তো উৎসবের ভোজ নয়—এ হচ্ছে গিয়ে পাইকারি ফাঁসির আসামীর ভোজ! গাঁয়ের লোকের কাজ দাঁড়ালো চার বেলা পেট ভ'রে খাওয়া আর খাওয়ানো—আর তার ফাঁকে ফাঁকে সবাই মিলে বুক চাপড়ে হা-হুতাশ করা। ভুলেও কেউ ঠাকুর-দেবতার নাম মুখে আনতো না। দেবী চৌধুরাণীর হরবল্লভ ডুবে গিয়েছে ভেবে দুর্গানাম করা বাহুল্য মনে করেছিল। কিন্তু জোড়াদীঘির অবস্থা তার চেয়েও

শোচনীয়—চরম শোচনীয়। যেখানে মানুষ ও ঠাকুর-দেবতা দুই-ই ধ্বংস হ'তে চলেছে, দুইয়েরই সমান দুরবস্থা, সেখানে মানুষে দেবতার নাম মুখে আনবে কেন?

এদিকে ডিম্যাণ্ড এণ্ড সাপ্লাই-এর নিয়ম অনুসারে সন্দেশ, রসগোল্লার দাম চারগুণ হ'ল। কিন্তু তাতে কার কি ক্ষতি? সামনে আর মাত্র পাঁচটি দিন—কাজেই সকলে পাঁচ টাকা সেরে রসগোল্লা কিনে খেতে আর খাওয়াতে লাগলো। ময়রার মুখে আর হাসি ধরে না—এই ক'দিনে সে এত লাভ করলো যা সারা জীবনে করেনি। লোকে বলে বেশ দু'পয়সা আসছে, কি বলো?

ময়রা বলে—কিন্তু ভাই ক'দিনের জন্য?

একদিন বিনুনিকে নির্জনে পেয়ে শ্রীদাম একমুঠা সন্দেশ দিয়ে বল্‌ল—বিনুনি খা।

বিনুনি দ্বিধামাত্র না করে একটা সন্দেশ মুখে পুরে দিয়ে শ্রীদামকে একটা খেতে বল্‌ল।

শুষ্ক জিহ্বায় সন্দেশ চর্বণ সহজ নয়—শ্রীদাম এ ক'দিনে অনেকবার পরীক্ষা ক'রে দেখেছে, তাই সে আপত্তি করলো।

বিনুনি শুধালো—কি হ'ল?

শ্রীদাম শুষ্ক মুখে বল্‌ল—চেতাবনী হবে যে।

বিনুনি বল্‌ল—তাতে ভয়টা কি? তোমার সঙ্গে আমিও তো যাবো।

এমন সহমরণের আশ্বাসে শ্রীদামের ভাব পরিবর্তন হ'ল বলে মনে হয় না, বরঞ্চ সেই অত্যাসন্ন মুহূর্তের কথা মনে পড়ে যাওয়াতে তার চোখ ছল্ ছল্ ক'রে উঠ্‌ল।

শ্রীদামকে আমরা কাপুরুষ বলি না, কেননা, এ অবস্থায় সকলেরই অনুরূপ ভাব হয়। অবশ্য কবিরা বলেন যে, প্রেমের জন্য প্রেমিক মাত্রেই মরতে প্রস্তুত। কিন্তু কবিদের সব কথা কি বিশ্বাসযোগ্য? বিশেষ ও কথাটা প্রেমিকরা ব'লে থাকে প্রণয়িনীর কানে তাদের অচল মনটাকে সচল করবার আশায়।

শ্রীদাম বল্‌ল—বিনুনি তার চেয়ে দু'জনে বেঁচে থাক্‌লেই কি ভাল হত না?

বিনুনি বলে—কিন্তু তার উপায় কি? গোটা পৃথিবীটাই যখন ওল্‌টাবে তখন তুমি আমি বাঁচি কি ক'রে?

তারপর বল্‌ল—এই তো ভালো হ'ল। বেঁচে থাক্‌লে তো তোমাকে পেতাম না, চেতাবনী হ'লে নিশ্চয় ক'রে পাবো।

নিষ্ঠুরা নারী—তুমি এমন মর্মান্তিক প্রেমবাক্য বল্‌তে পারলে?

শ্রীদাম শুধোয়—তুই হাসিস কেন?

বিনুনি বলে—ঐ জন্যেই তো হাসি। তাছাড়া সবাই মিলে মরলে দুঃখটা কোথায়?

শ্রীদাম আর এসব কথা সহ্য করতে পারলো না—সে চলে গেল। চলে যাবার আগে বিনুনি তার হাতে থেকে বাকি সন্দেশ ক'টা রেখে দিল।

৩

আজ ১৫ই শ্রাবণের প্রাতঃকাল, মধ্যরাত্রে আজ চেতাবনী ঘটবে। ভোর থেকে ঘরে ঘরে রোদনের রোল উঠলো, কেবল মাঝে মাঝে তাতে ছেদ পড়ে, সন্দেশ রসগোল্লাগুলো যখন ক্ষণকাল তরে কণ্ঠরোধ ক'রে দেয়। কেউ বুক চাপড়িয়ে কাঁদছিল—এমন সময়ে প্রিয়জন তার মুখের কাছে একটা রসগোল্লা ধরলো, ক্রন্দনরতা ক্ষণকাল থেমে সেটি গলাধঃকরণ ক'রে নিয়ে আবার পূর্বোক্ত বাক্যাংশ আবৃত্তি ক'রে বুক চাপড়াতে লাগলো। সেদিন কারো ঘরে হাঁড়ি চড়লো না, প্রয়োজনও ছিল না, কেননা অবশিষ্ট মিষ্টান্নগুলা তো আজকার মধ্যেই শেষ করা দরকার। এই ব্যাপক ক্রন্দনের রোলের মাঝে এখানে ওখানে উত্থিত হয় বিনুনির কচিকণ্ঠের হাসি, জ্বলন্ত অগ্নিকুণ্ডের শিখাসমূহের মধ্যবর্তিনী জানকীর মতো।

ক্রমে সন্ধ্যা আসন্ন হল। শ্রাবণের সন্ধ্যা, মেঘে অন্ধকার, তার উপরে চেতাবনীর আভাস প'ড়ে গাঁয়ের লোকের চোখে শ্মশানকালীর ছায়ার মতো প্রতিভাত হ'ল। রাত্রি যতই গভীরতর হচ্ছে ক্রন্দনের রোল ততই উচ্চতর হচ্ছে। রাত্রি বারোটা! এখন কত হবে কে জানে! কিছুক্ষণ পরে উৎকট বিদ্যুৎঝলিক সহ এক বিকট মেঘগর্জন। ঐ চেতাবনী হ'ল। গাঁয়ের সমস্ত লোক ছুটে বেরিয়ে পড়লো হাটতলার মাঠখানার দিকে। ঐ যেন পৃথিবী কাঁপছে, ঐ যেন দুলছে, ঐ যেন মেঘ থেকে শত শত হাতি শুড় নামিয়ে দিয়েছে! ওঃ কি বিদ্যুৎ! ওঃ কি ভীষণ মেঘের ডাক! নাঃ আর তাকিয়ে থাকা যায় না—সকলে চোখ বুঁজে মাথা নত করে বসে দণ্ড পল গুণতে লাগলো—এখনি চরম ঘাতকের খড়্গ পড়বে শিরে। বিনুনিকে

যতই চপল বলি না কেন, সমবেত ভয়ে ভীত হ'য়ে সে-ও মাঠে এসেছিল এমন হ'তে পারে আশঙ্কা ক'রে সে আগে থেকেই আঁচলে বেঁধে রেখেছিল কয়েকটা সন্দেশ! এখন সে চুপ ক'রে ব'সে চপ্ চপ্ করে সন্দেশগুলো খেতে লাগলো। সন্দেশ খাওয়ার চপ্ চপ্ আওয়াজকে কান্নার চাপা শব্দ মনে ক'রে তার পার্শ্ববর্তিনী বল্‌ল—কেমন ছুঁড়ি এখন কানতে হলো তো। বিন্নুনি হাঁ, না কিছুই বল্‌ল না।

৪

কালরাত্রি ক্রমে ভোর হ'ল—চেতাবনী হ'ল না! তখন সকলের মনে হ'ল —চেতাবনী হয়তো আদৌ হবে না। পুরুৎ ঠাকুর অবশ্য শাস্ত্র ঘেঁটে বলে দিয়েছিলেন চেতাবনী অনিবার্য—কিন্তু শাস্ত্রের সব কথা যে কলিকালে ফলে না —একথাও অনেকের মনে পড়লো! তখন সকলে স্বস্তির নিশ্বাস ফেলে বাড়ী ফিরে এলো!

এবারে বাস্তব অবস্থা ভীষণাকারে সকলের মনে পড়লো! গাঁয়ের অধিকাংশ লোকই যে নিঃস্ব। বাড়ী ঘরটুকু আছে, তা ছাড়া আর সবই যে বিক্রি হ'য়ে গিয়েছে। টাকাও নেই, মিষ্টান্নরূপে সে সব অতলে তলিয়ে গিয়েছে। কিছু বলতে কিছু নেই! সকলেই হত-দরিদ্র! বিন্নুনি তাদের মৌন দেখে বলে— এইতো চেতাবনী! বলে—পৃথিবী না ওল্‌টালে কি বড়লোক গরীব হয়! আর ঐ দেখো মস্ত ময়রার আজ কত টাকা!

অতঃপর ঘটনা সংক্ষিপ্ত। বিন্নুনি গরীব বলেই শ্রীদামের সঙ্গে বিয়ে দিতে শ্রীদামের বাপের আপত্তি ছিল। এখন সেই আপত্তির কারণ অন্তর্হিত। ফলে বিন্নুনির সঙ্গে শ্রীদামের বিয়ে হ'য়ে গেল।

জোড়াদীঘির খবর আর বড় রাখি না, শুনেছি ক্রেতা বিক্রেতারা আপোষে যে যার সম্পত্তি ফিরিয়ে নিয়েছে—দিয়েছে, বিশেষ ক্ষতি কাউকে সহ্য করতে হয়নি। শ্রীদামের বাপ জমি-জমা ফিরে পেলেও শ্রীদাম-বিন্নুনির বিয়ের রদবদল ঘটেনি। আরও শুনেছি যে, ওদের বিয়েতে মস্ত ময়রা বিনা পয়সায় মিষ্টান্ন সরবরাহ করেছিল। লোকে কারণ শুধোলে সে বলে—চেতাবনী না ঘটলে তারও দু'পয়সা হ'ত না আর বিন্নুনিরও বিয়ে হ'ত না! সে বলে—এরচেয়ে আর কি জরুরী কারণ হতে পারে?

ভিক্ষুক-কুকুর-সংবাদ

পাঠক, তুমি হয়তো লক্ষ্য করিয়াছ যে, অনেক সময়েই বড়লোকের বাড়ির দরজায় কুকুর বাঁধা থাকে, কিম্বা হয়তো আরও লক্ষ্য করিয়া থাকিবে যে, অনেক কুকুর বেড়াইতে বাহির হইবার সময়ে শিকল বাঁধিয়া একটি সৌখীন লোককে টানিয়া লইয়া চলে। পাঠক, তুমি হয়তো এ সমস্তকে ধনী বা ধনীর কুকুরের একটি সখ বলিয়া মনে করিয়াছ, বস্তুত তা নয়! ভিখারী বা পাওনাদার তাড়াইবার উদ্দেশ্যেই ধনীরা কুকুর পুষিয়া থাকে। কুকুরের ঘ্রাণশক্তি অতিশয় প্রবল, মানুষ চিনিয়া রাখিবার শক্তিও তাহাদের অসাধারণ। কুকুরের সাহায্যে দাগী আসামী ধরিবার কাহিনী নিশ্চয় তুমি শুনিয়াছ। ধনীরা কুকুরের সেই শক্তিকেই কাজে লাগাইয়া বিরক্তিকর পাওনাদার এবং ভিক্ষুকদের হাত হইতে আত্মরক্ষা করে। বড় বড় কুকুরের আড়তে গিয়া কেবল জানাইলেই হইল যে, তোমার শিক্ষিত কুকুর আবশ্যক। মালিক তোমার আবশ্যকের প্রকৃতি জানিয়া লইয়া নগদ মূল্যে তোমাকে শিক্ষিত কুকুর বিক্রয় করিবে। ভিখারী-তাড়ানো কুকুর, পাওনাদার-ঠেকানো কুকুর, মাইনরিটীকে বাধা দেওয়া কুকুর, বিরুদ্ধ রাজনৈতিক দলের লোককে কামড়াইয়া দেওয়া কুকুর, অবাঞ্ছিত শাশুড়ী বা শালা-সম্বন্ধীকে বাড়িতে না ঢুকিতে দেওয়া কুকুর প্রভৃতি হরেক রকমের কুকুর এই সব আড়তে পাওয়া যায়। ধনীরা প্রয়োজন মতো কুকুর কিনিয়া লইয়া যায়। এই সব কুকুরের শিক্ষা এমনি মজবুত যে, কখনো স্বকার্যে তাহারা ব্যর্থ হয় না। আজ এইরূপ একটি কুকুরের ইতিহাস তোমাদের বলিব মনস্থ করিয়াছি।

এক ধনীর দরজায় শিকলে বাঁধা একটি কুকুর বসিয়াছিল—এমন সময়ে সেখানে একটি ভিক্ষুক আসিয়া হাঁকিল—হরে কৃষ্ণ, হরে কৃষ্ণ, বাবা দুটো ভিক্ষা পাই গো।

তাহার কথা শুনিয়া কুকুরটি বলিল—এখানে কিছু হবে না, অন্যত্র যাও।

পাঠক, কুকুরের কথা শুনিয়া নিশ্চিয় তুমি বিস্মিত হও নাই, কারণ মানুষের কথার সহিত কুকুরের কথা যুক্ত না হইলে সংসারের গণ্ডগোল কখনই এমন বিচিত্র হইতে পারিত না। বিশেষ কত মানুষ কুকুরের মতো কথা বলে, একটি কুকুর যে মানুষের মতো কথা বলিবে, তাহাতে আর বিস্ময়ের কি আছে?

কুকুরের কথা শুনিয়া ভিক্ষুক বলিল,—সবাই বলে অন্যত্র যাও,অন্যত্র যাও, বাপু, সেই অন্যত্রটা কোথায় ব'লে দিতে পার ?

কুকুর—আমার মনিব কুম্ভকর্ণ পার্টির লোক। তুমি বিভীষণ পার্টির কোন কোন লোকের বাড়িতে যাও—তারা আমাদের শত্রু।

ভিক্ষুক—কুম্ভকর্ণ পার্টিটা কি শুনতে পাই ?

কুকুর—আমার, মনিব ও তৎশ্রেণীর লোকেরা সারাদিন পড়ে ঘুমোয়, মাঝে মাঝে খাবার জন্য জাগে—তাঁদের আদর্শ কুম্ভকর্ণ বলে পার্টির নাম কুম্ভকর্ণ পার্টি।

ভিক্ষুক—তোমার মনিব কি ধনী ? ধনী না হলে শুধু ঘুমিয়ে ও খেয়ে কি দিন চলে ?

কুকুর—ধনী বলে ধনী। দিবাভাগে মোসাহেবদের ধ্বনি ও রাত্রে বাবুর নিজের নাসাধ্বনিতে পাড়া প্রকম্পিত!

ভিক্ষুক—এত বড় ধনী—আর আমার জন্য একটা পয়সা বরাদ্দ নাই।

কুকুর—সমুদ্রগামী প্রকাণ্ড জাহাজের তলায় ছোট একটি ছিদ্র থাকলে জাহাজের উদ্দেশ্য কি ব্যর্থ হয়ে যায় না ? একটি পয়সা ভিক্ষার ছিদ্রপথে কত সাম্রাজ্য রসাতলে গিয়েছে, তার হিসাব রাখো ?

ভিক্ষুক—ভাই কুকুর, তোমার যুক্তি ও উপমা বড়ই হৃদয়গ্রাহী।

কুকুর—কেন না হবে ? পূর্বজন্মে আমি সাহিত্যিক ছিলাম। সাহিত্যিক-সুলভ স্বজনবিদ্বেষ ও পরশ্রীকাতরতার তাড়ায় আমি এ-জন্মে কুকুর-যোনির গুহায় ঢুকতে বাধ্য হয়েছি।

ভিক্ষুক—তুমি দেখি জন্মান্তরবাদের খবর রাখো ?

—না রেখে উপায় কি ? সংসারে ঐ তো একমাত্র সত্য এবং সান্ত্বনা।

ভিক্ষুক—কিন্তু জন্মান্তরের জন্য অপেক্ষা করে থাকতে যে আর ভরসা হয় না।

কুকুর—জন্মান্তরের জন্য অপেক্ষা করে থাকবে কেন ? 'এই জনমে ঘটালে মোর জন্ম-জনমান্তর।'

ভিক্ষুক—তুমি দেখি কবিগুরুর গানও জানো।

কুকুর—না জেনে পারি কই ? বেতার-সঙ্গীতের কৃপায় সব কুকুর যে শিক্ষিত হয়ে উঠল।

ভিক্ষুক—তুমি কি বলতে চাও—এর বিপরীতটাও সত্য ? অর্থাৎ সব মানুষ অশিক্ষিত রয়ে গেল।

কুকুর—তুমি কি বলতে চাও যে, কুকুর আর মানুষ পরস্পর বিপরীত?

ভিক্ষুক—আমি না বললেই বা কি আসে-যায়?

কুকুর—ভাই ভিক্ষুক, তোমার যুক্তি ও বিদ্যার খাড়াই দেখে মনে হচ্ছে, আগামী জন্মে তুমি বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক হতে পারো।

ভিক্ষুক—আমি তো বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপকই ছিলাম।

কুকুর—'ভিখারীর দশা তবে কেন তোর আজি?' ভাই, আমি বাঙালী কুকুর কিনা, তাই উপযুক্ত কোটেশন না হোলে মনোভাব প্রকাশ করতে পারি না। তা তোমার চাকরিটা গেল কেন?

ভিক্ষুক—দুঃখের কথা আর বলবো কি? বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপকদের কাছে কেউ বিদ্যা আশা করে না, এ-খবর বোধ করি তুমি রাখো। একদিন পথে যেতে একদল লোকে তর্ক করছিল, পাঁচ-সাততে কত হয়! আমি বলে ফেললাম—পঁয়ত্রিশ। তারা আমার বিদ্যা দেখে অবাক হয়ে আমার পেশা শুধালো। আমি বললাম—বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক। তারা তো শুনে হেসেই অস্থির, বলল, মিথ্যা কেন বলছ বাবা? তুমি পাঠশালার পণ্ডিত।

কুকুর—কেন পাঠশালার পণ্ডিত কি অধ্যাপকের চেয়ে বেশি জানে?

ভিক্ষুক—পণ্ডিতে অন্তত নামতাটা জানে। বিশ্ববিদ্যালয় পর্যন্ত পৌছতে পৌছতে অধ্যাপকরা সেটাও ভুলে যায়। হিমালয়ের চূড়ায় উঠলে পৃথিবী যেমন সমান আর সমতল মনে হয় বিশ্ববিদ্যালয়ের চেয়ারে গিয়ে উঠলে বিদ্যাজগতের সব তথ্য খাঁদা নাকের মতো সমান চেপ্টা দেখায়। যাই হোক, বিশ্ববিদ্যালয়ের ঐতিহ্য দূষিত করবার অপরাধে আমার চাকরিটি গিয়েছে, কিন্তু ভাই, এসব তো অবান্তর কথা। তুমি যে বল্‌লে—এই জন্মেই জন্মান্তর লাভ করা যায়, তাতে আমি বড় কৌতূহল বোধ করছি। আর একটু খুলে বলো।

কুকুর—তোমাদের একটি ভ্রান্ত ধারণা আছে যে, দেহান্তর না ঘটলে জন্মান্তর ঘটে না। একথা আদৌ সত্য নয়। অবস্থা ও পরিচ্ছদের পরিবর্তন মাত্রেই জন্মান্তর ঘটে যায়—এই সত্য উপলব্ধির পরেই কবি লিখেছিলেন—'এই জনমে ঘটালে মোর জন্ম-জন্মান্তর।' প্রাণীর অবস্থা ও পোষাকটাই আসল; দেহটা পোষাক ঝুলিয়ে রাখবার একটা উপলক্ষ্য মাত্র। চশমার জন্যই নাক, টুপির জন্যই মাথা, আর সোনার হারের জন্যই গলার প্রয়োজন।

এই দেখ না কেন, রূপার চেন ও বকলসের জন্যই আমি কুকুর, ছেঁড়া কাপড়, ঝুলি ও লাঠির জন্যই তুমি ভিক্ষুক। আমাদের পোষাকের অদল-বদল করবামাত্র তুমি কুকুর হবে, আমি ভিক্ষুক হব।

ভিক্ষুক—একথা কি সত্য?

কুকুর—কেন সত্য নয়? আমার পরীক্ষিত ব্যাপার। একদিন আমার মনিবের রাত্রে আসতে বিলম্ব হ'ল। আমি কোনরূপে শিকলমুক্ত হ'য়ে মনিবনির শয্যায় উপস্থিত হলাম। তিনি আমাকে কুকুর বলে বুঝতে পারলেন না, স্বামী বলে গ্রহণ করলেন।

ভিক্ষুক—এ বড় আশ্চর্য!

কুকুর—মোটেই আশ্চর্য নয়। মনিবনির পুত্রগণকে দেখো। তাদের কুকুর বলে বুঝতে শিকল ও বকলসেরও প্রয়োজন হয় না।

ভিক্ষুক—আর তোমার মনিবের কি দশা হল?

কুকুর—মনিব অনেক রাত্রে আমার শিকল নিয়ে ঘরে ঢুকল। মনিবনি বলে উঠলেন—ওই দেখ, কুকুরটা শিকল খুলে ফেলেছে। তখন তিনি ও আমি দুজনে মিলে তার গলায় শিকল পরালাম। শিকল পরাবামাত্র মনিব কুকুরের ন্যায় ঘেউ ঘেউ করতে লাগল—আর আমি মহানন্দে তার খাদ্য, পোষাক, ইত্যাদি ভোগ করতে থাকলাম। অনেকদিন পরে তিনি কোনরূপে শিকলমুক্ত হলে আমি শিকলগ্রস্ত হ'য়ে আবার কুকুর জন্ম পরিগ্রহ করলাম।

ভিক্ষুক—একথা আমার বিশ্বাস হয় না।

কুকুর—তবে এসো না কেন, দুইজনে পোষাক বিনিময় করি।

তখন কুকুর ও ভিক্ষুক পোষাক বিনিময় করিল। কুকুর ভিক্ষুকের ঝুলি ও লাঠি লইল, আর ভিক্ষুকটি গলায় চেন বকলস বাঁধিয়া বসিল। এমন সময়ে মনিব আসিয়া উপস্থিত। সে শিকলবদ্ধ কুকুরটিকে ভিক্ষুক বলিয়া বুঝিতে না পারিয়া তাহার গায়ে হাত বুলাইয়া 'টম', 'টম', বলিয়া আদর করিল—পকেট হইতে বিস্কুট বাহির করিয়া খাইতে দিল। আর ঝুলি ও লাঠিধারী ভিক্ষুকটিকে অর্থাৎ জন্মান্তরের কুকুরটিকে তাড়া মারিয়া বলিল—এখানে কিছু হবে না, যাও।

মনিব বাড়িতে প্রবেশ করিলে পূর্বজন্মের কুকুর পূর্বজন্মের ভিক্ষুককে বলিল—এসো, এবারে বেশ বদলানো যাক! কিন্তু নবজন্ম প্রাপ্ত কুকুর বলিল—না, ভাই আর বেশ বদলাইবার ইচ্ছা নাই, বেশ আছি—ভিক্ষুক

হইয়া বৃথা ঘুরিয়া বেড়াইবার চেয়ে ধনীর কুকুর-জন্ম অনেক বেশি আরামের। তখন পূর্বজন্মের কুকুরটি শিকল কাড়িয়া গলায় পরিবার জন্য পূর্বজন্মের ভিক্ষুককে আক্রমণ করিল। প্রাক্তন ভিক্ষুক আর্তস্বরে ঘেউ ঘেউ করিয়া উঠিল। তাহার স্বর শুনিতে পাইয়া দারোয়ান আসিয়া প্রাক্তন কুকুরকে লাঠি মারিয়া তাড়াইয়া দিল। সে হরে কৃষ্ণ, হরে কৃষ্ণ হাঁকিতে হাঁকিতে প্রস্থান করিল।

পাঠক, আমার এই গল্প হয়তো তোমরা বিশ্বাস করিলে না; কিন্তু গল্প হইলেও ইহা মিথ্যা নয়। কত মানুষকে কুকুরত্ব লাভের আশায় ধনীর বাড়িতে, মন্ত্রীর বাড়িতে, পারমিট আফিসে ও রাজনীতিক আড্ডায় ঘুরিতে স্বচক্ষে দেখিয়াছি। ইহার পরেও যদি বিশ্বাস না হয়, তবে গলায় শিকল ও বকলস বাঁধিয়া কুকুর বিক্রয়ের দোকানে গিয়া উপস্থিত হইও—এমন নগদ মূল্যের অঙ্ক শুনিতে পাইবে, মানব-জীবনের মূল্যস্বরূপ যাহা কল্পনা করিবার সাহসও তোমার হয় নাই।

মোটর গাড়ী

১

রজতকুমার একজন অনেষ্ট অফিসার, সে সময় মতো অফিসে যায়, নির্দ্দিষ্ট সময় অতীত হইবার আগে অফিস ত্যাগ করে না, আর যতক্ষণ অফিসে থাকে চা, সিগারেট ও বন্ধুদের যতদূর সম্ভব বর্জন করিয়া চলে—তাহা ছাড়া সে ঘুষ নেয় না—এমন কি যে ঘুষ নেয় তাহার বাড়ীতে পদার্পণ করা দূরে থাকুক তাহার প্রদত্ত সিগারেটটিও গ্রহণ করে না। ইহার ফলে বন্ধু অফিসারেরা তাহাকে ভয় করে, যদিচ ভয়টাকে প্রকাশ করিবার সময় তাচ্ছিল্যের আকার দেয়, অন্য পরিচিতগণ আড়ালে তাহাকে লইয়া হাসাহাসি করে, বলে কলির যুধিষ্ঠির! যুদ্ধোত্তর যুগে ঘুষ লওয়া পাপ কিনা জানি না, তবে এটা জানি যে ঘুষ না লইলে সংসার কোন ক্রমে চলিলেও মোটর চলে না। রজতকুমারের মোটর নাই।

একদিন রজত অফিস হইতে ফিরিয়া আসিয়া দেখিল তাহার স্ত্রী কমলরাণী মুখ গম্ভীর করিয়া বসিয়া আছে। রজত সুধাইল—কি হিমাংশুর বাড়ী যাওনি।

হিমাংশু কমলরাণীর ভাই।

কমলরাণী বলিল—গিয়েছিলাম, কিন্তু না যাওয়াই বোধ করি ভাল ছিল।

—কেন? কি হলো আবার?

—কি আবার হবে; ভাড়া গাড়ী ক'রে সিনেমায় যাওয়া চলে! কিন্তু যে ভাইয়ের বাড়ীতে তিনখানা মোটর সেখানে ট্যাক্সি ক'রে যাওয়ার চেয়ে না যাওয়াই ভালো।

রজত বলিল—ওর তো একখানা মোটর রাখবারও অবস্থা নয়, কাজেই বুঝে নেওয়া উচিত ওর মোটর রাখবার টাকা আসে কোথা—

তাহার বাক্য শেষ হইতে পারিল না, কমলরাণী ঝঙ্কার দিয়া বলিল—জানি গো জানি, সবাই চোর ছ্যাঁচড় আর তুমি একাই যুধিষ্ঠির। তুমি সশরীরে স্বর্গে যেয়ো তাতে আমার আপত্তি নেই। কিন্তু যতদিন সংসার আছে ততদিন আর দশজনের মতো চল্‌লেই ভালো হয়।

রজত বলিল—তার মানে ঘুষ নিতে হবে।

স্ত্রী বলিল কি নিতে হবে তা তুমিই জানো। কিন্তু আমি জানি যে মোটর না হ'লে আর মুখ রক্ষা হয় না।

এমন সময়ে তিন বৎসরের ছেলেটি ঘরে ঢুকিল, বলিল—দেখো মা কি পেয়েছি—

এই বলিয়া সে একখানা খেলার মোটর গাড়ী দেখাইল।

—ঐতে চ'ড়ে তোমার বাপ আর তুমি হাওয়া খেতে যেও—বলিয়া তাহার পিটে দুই চড় মারিয়া কমলরাণী প্রস্থান করিল।

রোরুদ্যমান ছেলেটিকে কোলে তুলিয়া লইয়া বাপ বলিল—বাঃ বাঃ চমৎকার গাড়ী।

ছেলেটি বলিল—বাবা—এবার একখানা সত্যি গাড়ী কিনে দিয়ো! রাজুদের মোটর গাড়ী আছে, আমাদের নেই কেন?

এমন সময় পাশের বাড়ীর দরজায় মোটরের শব্দ শুনিতে পাইয়া ছেলেটি কোল হইতে নামিয়া বলিল—বাবা, রাজুদের গাড়ী ফিরেছে দেখে আসি—এই বলিয়া সে ছুটিয়া পালাইল।

রজতকুমার শুষ্ক মুখে নিজের বসিবার ঘরের উদ্দেশ্যে প্রস্থান করিল।

২

রজতকুমার পাড়ার V-16 ক্লাবের মেম্বার। সেখানে সন্ধ্যাবেলায় তাশ দাবা পাশা এবং পরচর্চা প্রভৃতি বিবিধ উপায়ে চিত্ত-বিনোদন চলে। রজতকুমার সিঁড়ি হইতে শুনিতে পাইল কলির যুধিষ্ঠিরের উল্লেখ করিয়া একজন সকলকে আনন্দ দান করিতেছে রজতকুমার ঘরে ঢুকিতেই যে-যাহার হাতের দানে মন দিল—কেহ তাহাকে দেখিয়াও দেখিল না। একবার তাস খেলা শেষ হইতেই রজত তাস তুলিয়া লইল—কিন্তু কাহারো আর খেলায় উৎসাহ দেখা গেল না—এক এক জন এক এক ছুতায় উঠিয়া পড়িল। দুর্মুখ রাম চাটুজ্জে বলিল—না বাপু, যুধিষ্ঠিরের সঙ্গে খেলায় ব'সে শকুনি নাম নিতে পারবো না।

অদূরবর্ত্তী একজন মৃদুস্বরে অপরকে বলিল—কলির দ্রৌপদী আর যুধিষ্ঠিরের সঙ্গে বনগমন করবেনা। আমার স্ত্রীর কাছে থেকে অনেক কথাই শুনেছি।

তাহার শ্রোতা অনেক কথার বাকী কথাগুলি শুনিবার আশায় বক্তাকে টানিয়া লইয়া বারান্দায় গিয়া বসিল।

খেলার আশা নাই দেখিয়া রজত একখানা সংবাদপত্র টানিয়া লইয়া চিৎ

হইয়া শুইয়া পড়িল। অনেকক্ষণ পরে যখন তাহার চৈতন্য হইল, দেখিল সে একাই শুইয়া আছে—ঘর খালি। সে উঠিয়া বাড়ীর দিকে রওনা হইল।

সেদিন অবিশ্রান্ত বৃষ্টি। রজত অফিস হইতে বাহির হইয়া দেখিল ট্রাম বন্ধ। ট্যাক্সির অত্যধিক চাহিদা। নিরুপায় হইয়া সে হাঁটিয়া রওনা হইল। দুই ঘণ্টা পরে যখন সে বাড়ীতে পৌছিল—তখন তাহার সর্বাঙ্গ সিক্ত, পোষাকে কাদা আর মাটি।

ছেলেটি তাহাকে দেখিয়া বলিল—বাবা বপ্ কেনো—তাহলে তোমার কষ্ট হবে না।

কাপড় ছাড়িয়া রজত ঘরে বসিতে না বসিতেই কমলরাণী একখানা হিসাবের খাতা টেবিলের উপরে রাখিয়া দিয়া বলিল—এখন থেকে তোমার সংসার তুমি চালিও—আমি এর মধ্যে নেই।

এই বলিয়া সে ঝড়ের মতো চলিয়া গেল।

পরদিন রবিবার। পাড়ার অফিসার-পত্নীগণ কোথায় চড়িভাতিতে যাইবেন—অনেকগুলি মোটর প্রস্তুত। সিভিল সাপ্লাই অফিসারের পত্নী আসিয়া ডাকিল, কমলদি চলো—তারপরে বলিল—তোমাকে ভাই আমার মোটরে যেতে হবে।

কমল বলিল—না ভাই আমার বড্ডো মাথা ধরেছে।

অনেক অনুনয়েও সে গেল না।

রজত বলিল—গেলে না যে?

স্ত্রী বলিল——লজ্জা করে না। স্বামী হয়ে পরের মোটরে পাঠাতে চাও।

স্বামী বিনীতভাবে বলিল—দেখ্‌ছ তো এমনিতেই খরচ চলে না—মোটর কোথায় পাই।

স্ত্রী বলিল—তবে বিয়ে করতে বলেছিল কে?

রজত বলিলে বলিতে পারিত যে কমলরাণীর পিতাই উক্ত কার্যটি করিতে বলিয়াছিলেন।

রজত মনে মনে বলিল—বিবাহ করিয়া কি ভুলই না করিয়াছি। অনেক স্বামীই অনেক সময়েই এমন কথা মনে মনে বলিয়া থাকে—বিবাহ করিয়া কি ভুলই না করিয়াছি।

ঘোগ

১

লবঙ্গ দেশে একটি প্রবাদ আছে যে বাঘের ঘরে কখনো কখনো ঘোগ প্রবেশ করিয়া থাকে। সকলেই জানে যে, বাঘ অতিশয় মারাত্মক জন্তু, এখন তাহার ঘরে ঘোগ প্রবেশ করে শুনিয়া লোকে ভাবে যে, ঘোগ নিশ্চয় বাঘের চেয়েও অধিকতর মারাত্মক। বাঘের চেহারা ও আচরণ সম্বন্ধে লোকের একটা পরোক্ষ ধারণা আছে, প্রত্যক্ষ ধারণা যাহাদের হয়, তাহারা সে অভিজ্ঞতা বলিবার জন্য প্রায়ই থাকে না—এই ভাবে কল্পনার ধাক্কায় ধাক্কায় ঘোগের ভাগ্যে অনেকগুলি অতিশয়োক্তি অলঙ্কার জুটিয়া গিয়াছে। কিন্তু এবারে লবঙ্গ দেশে গিয়া ঘোগ সম্বন্ধে আমার ভুল ভাঙিয়া গেল—ঘোগকে আমি প্রত্যক্ষ দেখিয়া আসিয়াছি—এই একটি বিষয় হইতেই বুঝিতে পারা যাইবে, ঘোগ আদৌ মারাত্মক নয়। বাঘের প্রত্যক্ষ দর্শন ঘটিলে কি ফিরিতে পারিতাম ?

ঘোগ অতিশয় নিরীহ, এমন কি, তাহার সহিত তুলনায় যে কোন বাঙালী মধ্যবিত্ত কেরাণীকেও অধিকতর হিংস্র মনে হইবে। এমন নিরীহ প্রাণী কখনো বাঘের মতো নরঘাতক জন্তুর গৃহে প্রবেশ করিতে পারে না, করা সম্ভব নয়, এই অসম্ভবতাই ওই প্রবাদের নিগূঢ় অর্থ।

অত কথায় কাজ কি, ঘোগের বর্ণনা করিলেই আমার উক্তির সত্যতা বুঝিতে পারা যাইবে। ঘোগের চেহারা আমার চাক্ষুষ অভিজ্ঞতা। ঘোগ মানুষ, মধ্যবিত্ত শীর্ণ কেরাণীর মতো চেহারা, বুকে পিঠে প্রায় এক, উদরের বালাই নাই বলিলেই চলে, আর থাকিলেই বা কি, খাদ্যের অভাবে পাক-যন্ত্রগুলিতে মরিচা পড়িবার উপক্রম হইয়াছে, তাহার গায়ে গলাবন্ধ জিনের জীর্ণ কোট, ইহাই তাহার একমাত্র পৈত্রিক সম্পত্তি, পরনে নানা রঙের তালিমারা ধুতি, পায়ে ছেঁড়া জুতা, বারংবার তালি পড়িতে পড়িতে অরিজিন্যাল চামড়ার এক তিলও আর অবশিষ্ট নাই। তাহার ঘাড়ের উপরে ভাঁজ করা একখানা মলিন চাদর—ইহাতেই তাহার কৌলীন্য। লেজহীন জানোয়ার যেমন কল্পনা করা যায় না, নিশ্চাদর ঘোগও তেমনি কল্পনার অগম্য। ঘোগের চোখে নিকেলের চশমা, দুশ্চিন্তার কালি, অসহায় ভাব এবং ব্যাঘ্র-দর্শনজনিত ভীতি! ঘোগ ধীরে ধীরে চলে, জোরে চলিতে গেলে পাছে

দেহের হাড় ক'খানা খসিয়া পড়ে এবং ধুতি ছিঁড়িয়া যায় সেই ভয়ে সে সংযতচরণ। হাড় খসিয়া পড়িলে তাহার তেমন দুঃখ নাই, ধুতি ছিঁড়িলে যেমন দুশ্চিন্তা। ঘোগকে স্বেচ্ছায় কখনো হাসিতে দেখা যায় না, কেবল কোন ব্যাঘ্র সম্মুখে পড়িয়া গেলে একটি করুণ মিনতির পোষমানা হাসি তাহার দন্তপংক্তিতে ফুটিয়া ওঠে। এই চাক্ষুষ বর্ণনাতেও ঘোগের স্বরূপ কাহারো বুঝিতে অসুবিধা হইলে একবার লালদীঘি অঞ্চল ঘুরিয়া আসিলেই চলিবে। আফিসের কেরাণীদের সহিত ঘোগের একটা সুদূর সম্পর্ক আছে বলিয়া মনে হয়—কোন নৃতত্ত্ববিদ্ এ বিষয়ে গবেষণা আরম্ভ করিলে একটা দুরূহ সমস্যার সমাধান হইয়া যায়।

২

লবঙ্গ দেশের প্রাণিতত্ত্ব হইতে জানিতে পারা যায় যে, সেখানকার প্রাণিজগৎ দুই শ্রেণীতে বিভক্ত, বাঘ ও ঘোগ। বলা-বাহুল্য, বাঘও এক প্রকার মানুষ। বঙ্গদেশে বাঘের যে অর্থই হোক না কেন, লবঙ্গ দেশের অভিধানে বাঘ বলিতে এক শ্রেণীর মনুষ্যকে বুঝায়। সে দেশের বাঘ আমি স্বচক্ষে দেখিয়াছি, আর স্বচক্ষে দেখিবার পরেও যখন জীবিত আছি তখন বুঝিতে বিলম্ব হইবে না যে, লবঙ্গ দেশের বাঘ বঙ্গদেশের বাঘের মতো মারাত্মক নয়, তবে ঘোগের উপরে তাহার প্রতিক্রিয়া কিরূপ তাহা বলিতে পারি না। আমার বিদেশী চোখে বাঘে মানুষে কোন প্রভেদ নাই, তবে যদি কোন সূক্ষ্ম প্রভেদ থাকে, তাহা বলিতে পারি না। বাঘগুলি বলিষ্ঠ, স্থূলকায়, স্ফীতোদর, কোট-প্যান্টলুন পরিহিত, অবশ্য আজকাল কেহ কেহ সখ করিয়া মিহি ধুতি পরিতে সুরু করিয়াছে। বাঘের গলায় একটি সরু করিয়া সোণার হার। নৃতাত্ত্বিকগণ ওই হারটি দেখিয়া অনুমান করেন, বিবর্তনের নিয়মানুসারে প্রাচীনকালের লোহার শিকল এই অবস্থায় আসিয়া পৌছিয়াছে। বাঘ দ্বিপদ, তবে শুনিয়াছি, রাত্রি বেলা ইহারা চতুষ্পদ হইয়া শিকার সন্ধানে বাহির হয়। ঘোগের ডাক শুনিয়াছি, তাহারা কখনো 'হুজুর' বলে, কখনো 'স্তর' বলে, কখনো কখনো বা 'Excuse me Sir'—এই কথাও বলিয়া থাকে। বাঘের ডাক শুনি নাই, তবে তাহারা না কি 'বেয়ারা', 'চাপরাশি' 'চোপরাও', 'শূয়ারকি বাচ্ছা' বলিয়া গর্জ্জন করে। এমন ভীষণ বাঘের ঘরে ঘোগ প্রবেশ করিবে তাহা কি সম্ভব? তবে শুনিতে পাওয়া যায় যে,

মাঝে মাঝে রাত্রি বেলা কাঁচা মাংসের লোভে বাঘ ঘোগের ঘরে প্রবেশ করিয়া থাকে। ঘোগের কচি মাংস বাঘের কাছে অতিশয় রমণীয়। ফলতঃ বঙ্গদেশের বাঘ ও ঘোগের সম্বন্ধ অনেকটা বঙ্গদেশের ধনী ও দরিদ্রের সম্বন্ধের অনুরূপ।

ঘটনাচক্রে একটি ঘোগের সঙ্গে আমার পরিচয় হইয়া গেল। রাত্রে সে আমাকে আহারের নিমন্ত্রণ করিল। আফিস হইতে বাহির হইয়া ঘোগ যখন বাজারের দিকে চলিল, আমিও সঙ্গ লইলাম, বলিলাম, চলুন, আপনাদের বাজারটা দেখিয়া আসি। তাহার সঙ্গে বাজারে গিয়া দেখি যে, বাঘ ও ঘোগগণ পাশাপাশি কেনাকাটি করিতেছে, কে বলিবে তাহারা পরস্পরের শত্রু। আমার ঘোগবন্ধু বড় দেখিয়া একটি রুই মাছ কিনিয়া ফেলিল, তারপর আমাকে লইয়া তাহার বাড়ীর মুখে রওনা হইল। পথিমধ্যে হঠাৎ এক ব্যক্তিকে দেখিয়া ঘোগের মুখ শুকাইয়া গেল, তাহার গা কাঁপিতে লাগিল।

সেই ব্যক্তি ঘোগকে বলিল—পয়সা বেশী হ'য়েছে, না? মস্ত মাছ যে কেনা হয়েছে? ওদিকে তো বলা হয় যে, মাইনেতে কুলোচ্ছে না, বলি, ব্যাপারখানা কি?

ঘোগ কাঁপিতে কাঁপিতে বলিল, মাছটা কি হুজুরের বাড়ীতে পৌঁছে দেবো?

মনে হইল, বাঘ যেন খুশী হইয়াছে। বলিল, সখ ক'রে নিয়ে যাচ্ছ যাও, তার চেয়ে রাত্রি বেলা আমিই একবার ওদিকে যাবো।

ঘোগ খুশী হইয়া আভূমিনত সেলাম করিল। সেই ব্যক্তি দূরে চলিয়া গেলে আমি শুধাইলাম, ও ব্যক্তি কে?

ঘোগ বলিল—উনি একজন বাঘ, শুধু তাই নয়, আমার আফিসের বড়বাবু।

তাই বটে, রূপার ছড়ি, বাঁধানো দাঁত, দামী শাল, সোনার বোতাম—এ সমস্তই তাঁর ছিল, তবে বাঘ না হইয়া যায় কি প্রকারে?

আহার্য প্রস্তুত হইয়াছে, আমরা বাঘের জন্য অপেক্ষা করিতেছি, এমন সময়ে বাঘের মোটরের হর্ণ শোনা গেল। ঘোগ গিয়া শশব্যস্তে তাহাকে অভ্যর্থনা করিয়া নামাইয়া আনিল, বলিল, হুজুর শাক-ভাত প্রস্তুত।

বাঘ বলিল, বেশ, বেশ! তোমরা খাও। আমি একবার বরঞ্চ ঘুগনিকে নিয়ে ঘুরে আসি।

ঘোগ ব্যস্ত হইয়া ভিতরে চলিয়া গেল, এবং কিছুক্ষণ পরে একটি মহিলাকে লইয়া বাহিরে আসিল। অনুমান করিলাম, মহিলাটি ঘোগের পত্নী। বাঘ কোন ভূমিকা না করিয়া তাহার হাত ধরিয়া গিয়া মোটরে উঠিল, start দিয়া একবার মুখ বাহির করিয়া বলিল, ব্যস্ত হ'য়ো না, শেষরাতে ফিরিয়ে দিয়ে যাবো।

ঘোগকে শুধাইলাম, ঘুগনি অর্থ কি? সে বলিল, ঘোগের পত্নীকে ঘুগনি বলে। আমি তাহাকে পুনরায় শুধাইলাম—এ কি কাণ্ড?

সে নীরবে হাতখানা কপালে ঠেকাইল। আমি ক্রুদ্ধ হইয়া বলিলাম—আপনি ছাড়লেন কেন?

ঘোগ বলিল—উনি যে আমার বড়বাবু, ওঁর মর্জির উপরেই আমার পরিবারের সাতটি প্রাণীর গ্রাসাচ্ছাদন নির্ভর করে।

আমি বিরক্ত হইয়া বলিলাম, আপনার স্ত্রী গেলেন কেন?

ঘোগ কাঁদ-কাঁদ স্বরে বলিল—একবার যাননি। ছেলে-মেয়েরা সাত দিন খেতে পায় না! তখন নিজে যেচে যেতে হয়েছিল।

তারপর একটু থামিয়া বলিল—এ দেশের বাঘে শিকারে বের হয় না, শিকার তার গর্তে আপনি গিয়ে ধরা দেয়।

আমি শুধাইলাম, দেশে কি আইন নেই।

ঘোগ বলিল—বাঘেরাই আইন প্রণয়নের কর্তা!

বলিলাম, আপনাদের কি নীতিজ্ঞানও লোপ পেয়েছে?

সে বলিল—ঘোগের নীতিজ্ঞান-বিলাসিতার অবসর কোথায়? নীতিজ্ঞান বাঘ-সমাজের অলঙ্কার। না থাকলে ক্ষতি নেই, থাক্‌লে শোভা বাড়ে। সামাজিক নিমন্ত্রণের দিনে বাঘের পরিবারেরা অলঙ্কার, আর বাঘ মহাশয়েরা নীতিজ্ঞানে আপাদ-মস্তক সজ্জিত হ'য়ে বহির্গত হন! কিন্তু ঘোগের সে সুযোগ কোথায়? পুত্র-কন্যার নিশ্চিত উপবাস সম্মুখে নিয়ে নীতিবোধের পরীক্ষা দিতে পারে এমন দৃঢ়তা ঘোগ সমাজে বিরল।

তারপরে বলিল—হ্যাঁ, হোক আমার টাকা, আমি বাঘে পরিণত হই—তখন ও-সব উপদেশ মেনে চল্‌তে পারবো, কারণ তখন নিশ্চয় জানবো যে, বাঘনিকে নিয়ে ঘোগের রাত্রে হাওয়া খেতে যাবার কিছুমাত্র আশঙ্কা নেই।

একটু থামিয়া বলিল—নিন, চলুন আহারে বসা যাক্ গিয়ে।

ঘোগ চাকরের উদ্দেশে বলিল—ওরে, তোর মা'র জন্যে একটু দুধ থাকে যেন, এলে গরম করে দিতে ভুলিস্ না!

৩

তারপর দিন লবঙ্গ দেশে ছুটির দিন। সহরটা ঘুরিয়া দেখিবার জন্য বাহির হইয়াছি। কিছুদূর চলিয়া পথে একটি ভিড় দেখিতে পাইলাম। ব্যাপারটা কি জানিবার জন্য নিকটে গেলাম। জনতার কেন্দ্রে প্রবেশ করিতে পারিলাম না, গোটাদুই লাল পাগড়ির আভাস পাইলাম, অনুমান করিলাম, কোন একটা অপরাধী ধরা পড়িয়াছে, আমি জনতার পিছনে পিছনে চলিলাম। এমন সময়ে জনতার কেন্দ্র হইতে একজন লোক বাহির হইয়া আসিল, তাহাকে শুধাইলাম, মহাশয়, ব্যাপারটা কি?

লোকটি বলিল—একটা চোর ধরা পড়িয়াছে।

আমি শুধাইলাম, কি চুরি করিয়াছে?

সে বলিল—মাটি।

মাটি চুরি বলিতে কি বুঝায় বুঝিতে পারিলাম না, অবাক হইয়া রহিলাম। পূর্বোক্ত ভদ্রলোক আমার বিস্ময় দেখিয়া বলিল—আপনি যে অবাক্ হইলেন?

আমি বলিলাম, তা হইয়াছি বই কি! আমি কিছুই বুঝিতে পারিতেছি না, কারণ, মাটি চুরি এমন কি অপরাধ?

লোকটি বলিল—বলেন কি? মাটি চুরির চেয়ে বড় অপরাধ আর কি হইতে পারে? সংসারে যত যুদ্ধ-বিগ্রহ, বিপদ্-অশান্তি, সবই তো মাটি চুরির জন্য। দুর্যোধন হইতে হিটলার সকলেই মাটিচোর। বড় বড় সাম্রাজ্য মাটি-চুরির বণিয়াদেই প্রতিষ্ঠিত, মাটি-চুরি আপনি এত সামান্য মনে করিতেছেন কেন?

আমি বলিলাম, সাধারণ ভাবে আপনার কথা সত্য! কিন্তু বর্তমান চোর কতখানি মাটি চুরি করিয়াছে, কাহার মাটি চুরি করিয়াছে, কি উদ্দেশ্যে চুরি করিয়াছে—তাহার উপরেই সব নির্ভর করে না কি?

সে বলিল—না। একটা দেশ দখল করিলেও যে অপরাধ, আর এক মুঠা মাটি চুরি করিলেও বস্তুতঃ সেই একই অপরাধ, কারণ অন্যায়, অন্যায় ছাড়া আর কিছু নয়।

বস্তুতঃ চোরটা এক মুঠা মাটি চুরি করিয়াছে, সাধারণের দখলী জমি হইতে উনুন নিকাইবার জন্য সে এক মুঠা মাটি চুরি করিয়া লইয়া যাইতেছিল, এমন সময়ে পাহারওয়ালা তাহাকে গ্রেপ্তার করিয়াছে!

আমি শুধাইলাম, লোকটার বিচারে কি দণ্ড হইবে?

সে বলিল প্রাণে বাঁচিয়া গেলেও যাইতে পারে কিন্তু নির্বাসন সুনিশ্চিত!

সর্বনাশ!

আমি বলিলাম, আপনাদের দেশে অনেক রাজা, মহাজন, ধনী আছে—তাহারা সকলেই কি মাটি-চোর নহে?

সে বলিল—না, তাহারা যাহা করে, দেশের বিধি-বিধান রক্ষা করিয়া তাহা করিয়াছে, কাজেই তাহারা চোর নহে। এই লোকটা দেশের বিধি-বিধান লঙ্ঘন করিয়া প্রকাশ্যভাবে মাটি চুরি করিয়াছে।

আমি বলিলাম,—লোকটা নিশ্চয় দরিদ্র?

সে বলিল—লবঙ্গ দেশে দরিদ্র হওয়াই যে সবচেয়ে বড় অপরাধ।

আমি শুধাইলাম—তবে কি এই লোকটাই এ দেশে একমাত্র দরিদ্র?

সে বলিল—না, আরও আছে। তবে এ লোকটা ঘোগ।

—ঘোগ কি, মহাশয়?

পূর্বোক্ত ব্যক্তি বলিল—যে ব্যক্তি একই সঙ্গে দরিদ্র ও নির্বোধ—সে ঘোগ। তারপরে বলিল—আমি এক সময় ঘোগ ছিলাম, কিন্তু বুদ্ধিবলে প্রচুর সম্পত্তি অর্জন করিয়া এখন বাঘ হইয়াছি।

এই পর্যন্ত বলিয়া সে বলিল—আচ্ছা, এখন আসি। এই বলিয়া সে দ্রুত চলিয়া গেল।

কিয়দ্দূর গিয়া জনতাও ক্রমশঃ ক্ষীণ হইয়া আসিল—এবারে আমি ভিতরের দৃশ্য দেখিবার সুযোগ পাইলাম। দেখিলাম, একজন পাহারাওয়ালার হাতে এক মুঠা মাটি। বুঝিলাম—ইহাই চোরাই মাল। আরও দেখিলাম, অপর পাহারাওয়ালা একটা লোকের কোমরে দড়ি বাঁধিয়া লইয়া যাইতেছে। বুঝিলাম, লোকটা চোর। কিন্তু চোরের মুখ দেখিয়াই চমকিয়া উঠিলাম—এ যে আমার পূর্বপরিচিত ঘোগ।

বেচারা!

পাছে সে লজ্জা পায় এই আশঙ্কায় আমি আর দেখা দিলাম না। কিছুক্ষণ পরেই পাহারাওয়ালারা ঘোগকে লইয়া গিয়া থানায় প্রবেশ করিল! জনতার অবশিষ্ট লোক ফিরিল, আমিও ফিরিলাম।

আমি মনে মনে স্থির করিলাম, ঘোগের বিচারকালে উপস্থিত থাকিতে হইবে, তাহাতে ইহার বিচার এবং এ দেশের বিচার-পদ্ধতি দুই-ই দেখিতে পাওয়া যাইবে।

অথ কৃষ্ণার্জুন সংবাদ

১

পাঠক, তুমি অর্জুন সিং ও কৃষ্ণ রায়ের নাম নিশ্চয় অবগত আছো। কখনো না কখনো তাহাদের নাম তোমার কানে প্রবেশ করিয়াছে। কিন্তু মুস্কিল এই যে মহৎ নাম শুনিয়া থাকিলেও সব সময়ে মনে পড়িতে চায় না, পড়িলে সংসারের চেহারা ভিন্নরূপ ধরিত। যাই হোক, মনে করাইয়া দেওয়া সত্বেও যদি নাম দুটি তোমার মনে না পড়ে তবে এই কাহিনী তাহাদের কীর্তি স্মরণ করাইয়া দিবে। তাহাদের কীর্তি স্মরণ করিলেও দেহ পবিত্র হয়, মন উন্নত হয়, সর্বপ্রকার মোহ ও সংস্কার বিলুপ্ত হইয়া মানব সংসার-সমুদ্রের পরমহংসে পরিণত হয়। আমি সেই পুণ্য-কাহিনী বিবৃত করিতে উদ্যত—ইহা নব কুরুক্ষেত্রের অভিনব কৃষ্ণার্জুন-সংবাদ। পাঠক, আমাকে আগাম ধন্যবাদ দিও।

অর্জুন সিং ও কৃষ্ণ রায় পরম বান্ধব। একদিন একখানি নূতন মডেলের স্টুডিবেকার মোটরে (যে গাড়ী আসে কি যায় পথিকের পক্ষে বুঝিয়া ওঠা কঠিন) করিয়া লালদীঘির অভিমুখে চলিতেছিল। কৃষ্ণ মোটর চালাইতেছে, অর্জুন পিছনের সীটে আসীন, অর্থাৎ অর্জুন রথী আর কৃষ্ণ সারথি। এই দৃশ্যে অধীত-গীতা পাঠকের কুরুক্ষেত্র যুদ্ধের কথা মনে পড়িতে পারে, কিন্তু আমি সত্য করিয়া বলিতেছি—সে কাহিনীর সহিত এই গল্পের কোন সংস্রব নাই। আমার কাহিনী বর্তমানকালের।

মোটর লালদীঘি ছাড়াইয়া ক্লাইভ ষ্ট্রীটে উপস্থিত হইলে একটি সুবৃহৎ অট্টালিকা দেখাইয়া কৃষ্ণ বলিল—এই সেই বাড়ী।

তখন দুইজনে গাড়ী হইতে নামিল, নামিয়া বাড়ীতে প্রবেশ করিয়া তেতলায় সুসজ্জিত একটি অফিস ঘরে প্রবেশ করিল, দুইজনে পুরু গদি-আঁটা চেয়ারে বসিল, বসিয়া দুইটি সিগারেট ধরাইল। আগুন সিগারেটের মাঝামাঝি নামিয়া আসিলে কৃষ্ণ বলিল—অর্জুন, তবে শোনো।

তখন দুইজনের সিগারেটের ধোঁয়া ঘর আচ্ছন্ন করিয়া ফেলিয়াছে, মনে হইতেছে কৃষ্ণের ষোল-শত প্রকৃতি যেন তাহাদের ঘিরিয়া দাঁড়াইল। কৃষ্ণ বলিল—শোনো, ১৯৪১ সালে আমার কিছুই ছিল না, আজ আমি এই অফিসের মালিক, এই বাড়ীর মালিক, এই রকম দশ-বারোটি বাড়ীর মালিক। সে বলিল—আমার সঞ্চিত অর্থ ও সম্পত্তির হিসাব রাখিবার জন্য পঞ্চাশ জন কেরাণী দিবারাত্রি খাটিয়া মরে। সে বলিল—মরে শব্দটা রূপক মাত্র নয়, অতি-

শ্রমে আট দশ জন কেরাণী কেবল এই বছরেই মরিয়াছে, বাকিরা প্রতি মুহূর্তে হিংসায় মরিতেছে।

অর্জুন বিস্মিত ভাবে শুধাইল—কেমন করিয়া ইহা সম্ভব হইল?

কৃষ্ণ আর একটি সিগারেট ধরাইয়া বলিল—বলিবার আগে একবার হাসিল, তারপরে বলিল—এ সমস্তই ব্ল্যাক মার্কেটের ফল। কৃষ্ণ ব্যাখ্যা করিয়া বুঝাইল—ধনলাভের সুড়ঙ্গ-পথের নাম চোরাবাজার। কিন্তু সখা, চোরের পিতার সাধ্য নাই যে চোরাবাজারে প্রবেশ করে—তাহারা কেবল নিরীহ পথিকের পকেট মারিয়া হয় মার খায় নয় জেলে যায়।

সে বলিল—চোরাবাজারে কেবল ডাকতেরাই প্রবেশ করিতে সক্ষম এবং সেখানে দিনে-দুপুরে ডাকাতি চলিতেছে। চোরাবাজারের ডাকাতেরা রাতে ডাকাতি করিতে লজ্জাবোধ করে, দিনের ডাকাতির ফল তাহারা রাতের বেলায় সাধু-বেশে সজ্জন-বেশে, কৃষ্টিসম্পন্ন সামাজিক জীব হিসাবে ভোগ করে।

কৃষ্ণ বলিয়া চলিল—চোরাবাজারের ডাকাতেরা মালকোঁচা মারিয়া কাপড় পরে না, কানে জবা ফুল গোঁজে না, হাতে লাঠি ধরে না, তাহারা 'হারে রে রে' শব্দে শিকারের ঘাড়ে আসিয়াও পড়ে না। সে আরও বলিল—এ ডাকাতগণের পরনে সূক্ষ্ম কোঁচানো ধুতি, গায়ে গিলা-করা আদ্দির জামা, মুখে ব্ল্যাক এণ্ড হোয়াইট সিগারেট—ইহাদের বাহন নূতন মডেলের মোটর।

সমস্ত বিবরণ শুনিয়া অর্জুন দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিল। কৃষ্ণ বলিল দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিবার দরকার নাই—তুমিও এই পথ ধরো—এক বছরের মধ্যেই অন্ততঃ একখানা বাড়ীর মালিক হইতে পারিবে।

ভীত অর্জুন বলিল—পুলিশ!

কৃষ্ণ হাসিয়া বলিল—পুলিশ! হাঁ, স্বাধীন দেশের পুলিশ বেশ reasonable! অবশ্য inflationএর বাজারে তাদের demand কিছু চড়া বটে, তা আমাদের লাভও যে চৌষট্টি গুণ বেশি!

তার পরে মন্তব্য করিয়া বলিল—ব্ল্যাক করছি বলেই আমরা যে unreasonable, এমন নই।

অর্জুন বলিল—কিন্তু আইন যে কড়া।

কৃষ্ণ বলিল—আইন অবশ্য কড়া, কিন্তু তাতেই কি প্রমাণ হয় না যে আমাদের প্রতাপ অসীম। ম্যালেরিয়ার কড়া ঔষধ কুইনিন—কিন্তু তাই বলে

অথ কৃষ্ণার্জুন সংবাদ

১

পাঠক, তুমি অর্জুন সিং ও কৃষ্ণ রায়ের নাম নিশ্চয় অবগত আছো। কখনো না কখনো তাহাদের নাম তোমার কানে প্রবেশ করিয়াছে। কিন্তু মুস্কিল এই যে মহৎ নাম শুনিয়া থাকিলেও সব সময়ে মনে পড়িতে চায় না, পড়িলে সংসারের চেহারা ভিন্নরূপ ধরিত। যাই হোক, মনে করাইয়া দেওয়া সত্বেও যদি নাম দুটি তোমার মনে না পড়ে তবে এই কাহিনী তাহাদের কীর্তি স্মরণ করাইয়া দিবে। তাহাদের কীর্তি স্মরণ করিলেও দেহ পবিত্র হয়, মন উন্নত হয়, সর্বপ্রকার মোহ ও সংস্কার বিলুপ্ত হইয়া মানব সংসার-সমুদ্রের পরমহংসে পরিণত হয়। আমি সেই পুণ্য-কাহিনী বিবৃত করিতে উদ্যত—ইহা নব কুরুক্ষেত্রের অভিনব কৃষ্ণার্জুন-সংবাদ। পাঠক, আমাকে আগাম ধন্যবাদ দিও।

অর্জুন সিং ও কৃষ্ণ রায় পরম বান্ধব। একদিন একখানি নূতন মডেলের স্টুডিবেকার মোটরে (যে গাড়ী আসে কি যায় পথিকের পক্ষে বুঝিয়া ওঠা কঠিন) করিয়া লালদীঘির অভিমুখে চলিতেছিল। কৃষ্ণ মোটর চালাইতেছে, অর্জুন পিছনের সীটে আসীন, অর্থাৎ অর্জুন রথী আর কৃষ্ণ সারথি। এই দৃশ্যে অধীত-গীতা পাঠকের কুরুক্ষেত্র যুদ্ধের কথা মনে পড়িতে পারে, কিন্তু আমি সত্য করিয়া বলিতেছি—সে কাহিনীর সহিত এই গল্পের কোন সংস্রব নাই। আমার কাহিনী বর্তমানকালের।

মোটর লালদীঘি ছাড়াইয়া ক্লাইভ ষ্ট্রীটে উপস্থিত হইলে একটি সুবৃহৎ অট্টালিকা দেখাইয়া কৃষ্ণ বলিল—এই সেই বাড়ী।

তখন দুইজনে গাড়ী হইতে নামিল, নামিয়া বাড়ীতে প্রবেশ করিয়া তেতলায় সুসজ্জিত একটি অফিস ঘরে প্রবেশ করিল, দুইজনে পুরু গদি-আঁটা চেয়ারে বসিল, বসিয়া দুইটি সিগারেট ধরাইল। আগুন সিগারেটের মাঝামাঝি নামিয়া আসিলে কৃষ্ণ বলিল—অর্জুন, তবে শোনো।

তখন দুইজনের সিগারেটের ধোঁয়া ঘর আচ্ছন্ন করিয়া ফেলিয়াছে, মনে হইতেছে কৃষ্ণের ষোল-শত প্রকৃতি যেন তাহাদের ঘিরিয়া দাঁড়াইল। কৃষ্ণ বলিল—শোনো, ১৯৪১ সালে আমার কিছুই ছিল না, আজ আমি এই অফিসের মালিক, এই বাড়ীর মালিক, এই রকম দশ-বারোটি বাড়ীর মালিক। সে বলিল—আমার সঞ্চিত অর্থ ও সম্পত্তির হিসাব রাখিবার জন্য পঞ্চাশ জন কেরাণী দিবারাত্রি খাটিয়া মরে। সে বলিল—মরে শব্দটা রূপক মাত্র নয়, অতি-

শ্রমে আট দশ জন কেরাণী কেবল এই বছরেই মরিয়াছে, বাকিরা প্রতি মুহূর্তে হিংসায় মরিতেছে।

অর্জুন বিস্মিত ভাবে শুধাইল—কেমন করিয়া ইহা সম্ভব হইল?

কৃষ্ণ আর একটি সিগারেট ধরাইয়া বলিল—বলিবার আগে একবার হাসিল, তারপরে বলিল—এ সমস্তই ব্ল্যাক মার্কেটের ফল। কৃষ্ণ ব্যাখ্যা করিয়া বুঝাইল—ধনলাভের সুড়ঙ্গ-পথের নাম চোরাবাজার। কিন্তু সখা, চোরের পিতার সাধ্য নাই যে চোরাবাজারে প্রবেশ করে—তাহারা কেবল নিরীহ পথিকের পকেট মারিয়া হয় মার খায় নয় জেলে যায়।

সে বলিল—চোরাবাজারে কেবল ডাকতেরাই প্রবেশ করিতে সক্ষম এবং সেখানে দিনে-দুপুরে ডাকাতি চলিতেছে। চোরাবাজারের ডাকাতেরা রাতে ডাকাতি করিতে লজ্জাবোধ করে, দিনের ডাকাতির ফল তাহারা রাতের বেলায় সাধু-বেশে সজ্জন-বেশে, কৃষ্টিসম্পন্ন সামাজিক জীব হিসাবে ভোগ করে।

কৃষ্ণ বলিয়া চলিল—চোরাবাজারের ডাকাতেরা মালকোঁচা মারিয়া কাপড় পরে না, কানে জবা ফুল গোঁজে না, হাতে লাঠি ধরে না, তাহারা 'হারে রে রে' শব্দে শিকারের ঘাড়ে আসিয়াও পড়ে না। সে আরও বলিল—এ ডাকাতগণের পরনে সূক্ষ্ম কোঁচানো ধুতি, গায়ে গিলা-করা আদ্দির জামা, মুখে ব্ল্যাক এণ্ড হোয়াইট সিগারেট—ইহাদের বাহন নূতন মডেলের মোটর।

সমস্ত বিবরণ শুনিয়া অর্জুন দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিল। কৃষ্ণ বলিল দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিবার দরকার নাই—তুমিও এই পথ ধরো—এক বছরের মধ্যেই অন্ততঃ একখানা বাড়ীর মালিক হইতে পারিবে।

ভীত অর্জুন বলিল—পুলিশ।

কৃষ্ণ হাসিয়া বলিল—পুলিশ! হাঁ, স্বাধীন দেশের পুলিশ বেশ reasonable! অবশ্য inflation-এর বাজারে তাদের demand কিছু চড়া বটে, তা আমাদের লাভও যে চৌষট্টি গুণ বেশি!

তার পরে মন্তব্য করিয়া বলিল—ব্ল্যাক করছি বলেই আমরা যে unreasonable, এমন নই।

অর্জুন বলিল—কিন্তু আইন যে কড়া।

কৃষ্ণ বলিল—আইন অবশ্য কড়া, কিন্তু তাতেই কি প্রমাণ হয় না যে আমাদের প্রতাপ অসীম। ম্যালেরিয়ার কড়া ঔষধ কুইনিন—কিন্তু তাই বলে

কি দেশ থেকে ম্যালেরিয়া লোপ পেয়েছে? বরঞ্চ সরকারী রিপোর্ট বিশ্বাস করলে মানতে হবে যে কুইনিন যথেষ্ট থাকা সত্ত্বেও ম্যালেরিয়া বাড়ছে।

অর্জুন বলিল—যদি ধরা পড়ি।

কৃষ্ণ বলিল—কেউ কেউ তো ধরা পড়বেই। যুদ্ধে যারা যায় সবাই কি বেঁচে ফেরে? তবু তো সৈন্যের অভাব হয় না।

তখন অর্জুন বলিল—ধরা পড়লে যে বিষম লজ্জা!

কৃষ্ণ বলিল—ঠিক উল্টা। না ধরা পড়িলেই লজ্জার কথা। লোকে মনে করবে যে তুমি ব্ল্যাক করো না—অর্থাৎ তুমি দরিদ্র! সখা, দারিদ্র্যের চেয়ে আর বেশী লজ্জার বিষয় কি?

চোরাবাজারের বিরুদ্ধে যে শেষ যুক্তি অর্জুনের মনে ছিল তাহাই বলিল। বলিল—ধর্ম বলে একটা কিছু আছে তো?

—আছে না কি? বলিয়া কৃষ্ণ হো-হো হী-হী হে-হে হৈ-হৈ হৌ-হৌ হঃ-হঃ হাঃ-হাঃ রবে সমস্ত স্বরবর্ণগুলি ধ্বনিত করিয়া হাসিয়া উঠিল, বলিতে লাগিল—আছে না কি? আছে না কি?

কৃষ্ণ বলিল—ধর্ম তো ঠানদিদির গল্প, ছেলেভুলানো ছড়া!

সে বলিল—ভায়া, একটু বৈজ্ঞানিক দ্বন্দ্ববাদ পড়ো—সব দ্বিধা ঘুচে যাবে। সংসার তো সরল রেখায় চল্‌ছে না, চল্‌ছে দুই ভিন্ন শক্তির ধাক্কার পরিণামের রেখায়। বন্য মহিষ যেমন দুই শিঙের ধাক্কায় আততায়ী জন্তুকে মৃত্যুমুখে ঠেলে নিয়ে যায়, তেমনি সংসারের একদিকে ঠেলছে ভগবান আর এক দিকে ঠেলছে শয়তান, একটা thesis, আর একটা antithesis, আর এ দুইয়ের synthesis বা সমন্বয় হচ্ছে আমরা এই যা করছি, এবারে বুঝলে তো? আর এখনও যদি না বুঝে থাকো তবে আজ রাতে ক্লাবে ডিনারের পরে তোমার সমস্ত মোহ ও সংস্কারকে দূর করে দেবো—ততক্ষণ অপেক্ষা করো। কাল থেকে হবে তুমি নূতন মানুষ।

এই বলিয়া সে থামিল, অর্জুন আগেই থামিয়াছিল! তার পর নীরবে আরও কয়েকটি সিগারেট দগ্ধ করিয়া দুইজনে মোটরে করিয়া বাড়ীতে ফিরিয়া আসিল।

২

পাঠক, কৃষ্ণ রায়ের পরিচয় তুমি কিছু কিছু পাইলে, এবারে অর্জুনের পরিচয় শোনো। অর্জুন সিং বড়ই ভালো মানুষ, বাংলা ভাষায় যাহার বিশদ অর্থ

সাত চড়ে যাহার মুখে রব নির্গত হয় না। পেশাতে ছিল সে ইস্কুল-মাষ্টার। পূর্ববঙ্গ হইতে বাস্তত্যাগ করিয়া সে পশ্চিম-বঙ্গে আসিয়াছে। পশ্চিম-বঙ্গে আসিয়া সে পথে পথে ঘুরিতেছিল, এমন সময়ে কৃষ্ণ রায়ের সহিত তাহার সক্ষাৎ। তাহারা দুই জনে এক সময়ে বিদ্যালয়ের এক শ্রেণীতে সহপাঠী ছিল। কৃষ্ণ রায় তাহার বন্ধুকে বাড়ীতে লইয়া গিয়া আশ্রয় দিল। কয়েক দিন পরে অর্জুনকে সে বলিল—চলো, সংসারে উন্নতির আসল পথটা তোমাকে দেখাইয়া দিই। এই বলিয়া সে নিজের উন্নতির বিবরণ তাহার সম্মুখে ধরিল। অর্জুন শুনিল, পাঠক তুমিও শুনিয়াছ।

পূর্ব-নির্দ্দিষ্ট সময়ে অর্জুন ও কৃষ্ণ ক্লাবে আসিয়া উপস্থিত হইল। ক্লাব একটি সুসজ্জিত, সুবৃহৎ অট্টালিকা। তাহার মেঝে চক্‌চকে, তাহার দেয়াল চক্‌চকে, তাহার চাতাল চক্‌চকে। মুখ দেখা যায় এমন আসবাব-পত্রে তাহার প্রতিটি কক্ষ পূর্ণ। রাত্রে সেখানে হাজার বিদ্যুতের আলো জ্বলে, সে আলো প্রতিফলিত হয় বেয়ারাগণের উজ্জ্বল চাপরাশে, মেম্বারগণের মসৃণ টাকে এবং বিনোদিনীগণের বার্ণিশ-করা গালে ও গহনায়। ঘরে-ঘরে ছোট ছোট মেহগনির টেবিলে আহারের ব্যবস্থা। দরজায় মোটর আসিয়া থামে, মোটা মোটা দেহগুলি নামে, তাহাদের ডাহিনে ও বামে ডাকিনী যোগিনীর মতো কৃশাঙ্গিনীগণ। মোট কথা, পাঠক, তুমি যদি কোন প্রথম শ্রেণীর সাহেবী হোটেল দেখিয়া থাকো—তবে তাহাই কল্পনা করিয়া লও, কেবল প্রভেদের মধ্যে এই যে এখানে যে ইংরাজি ভাষা কথিত হইয়া থাকে তাহা শেক্সপীয়রের পিতারও বুদ্ধির অগম্য। লোকে কুসংস্কার বশতঃ ভাবিয়া থাকে চোরাবাজার একটি অন্ধকার স্যাতসেঁতে স্থান, ভাবিয়া থাকে সেখানে মলিন ও ছিন্ন বস্ত্রপরিহিত শীর্ণ ব্যক্তিগণ যাতায়াত করে। সমস্তই ভুল। দেশের বুদ্ধিমান পুলিশ বৃথা গলি-ঘুঁজি খুঁজিয়া মরে। চোরাবাজারের মতো উজ্জ্বল, পরিচ্ছন্ন, সংস্কৃতি-মাৰ্জ্জিত স্থান অল্পই আছে। চোরাবাজারের হেড কোয়ার্টার এই ক্লাবটিকে রবীন্দ্র-সাহিত্য, আলডুস হাক্সলি ও আইনষ্টাইনের সম্মিলিত solution-এ ধৌত মার্জিত বলিয়া মনে হয়। এখানকার সদস্যগণের মধ্যে চোখে-চোখে ইসারা হয়, মোটা টাকার নোট-বিনিময় হয়, এ ওর সিগারেট ধরাইয়া দেয়, ইহাদের ক্ষীণতম কাশিও অর্থপূর্ণ, টাকার মূল্যে বিচার করিলে কোনটার দাম আড়াই হাজার টাকার কম হইবে না!

কৃষ্ণ ও অর্জুন একটি কক্ষে আসিয়া বসিল। সে ঘরে আর কেহ ছিল

না। দুজনে ভোজন সমাধা করিল। ভোজনের পরে পানীয় আসিল। ইস্কুলমাষ্টার অর্জুন শিহরিয়া উঠিল। কৃষ্ণ সস্নেহে হাসিয়া বলিল—আচ্ছা থাক। এই বলিয়া সে পান সুরু করিল। বৃন্তে যেমন ফুল, ভোজ্যের বৃন্তে তেমনি পানীয়—সেটাই আসল, ভোজ্য কেবল উপলক্ষ্য।

আশে-পাশের ঘরগুলিতে ফটাফট শব্দ হইতেছিল, অর্জুন চমকিয়া উঠিয়া জিজ্ঞাসা করিল—ও কিসের শব্দ?

কৃষ্ণ বলিল—কিছু নয়, শ্যাম্পেনের বোতলের ছিপি ছুটছে।

ঠিক সেই সময়ে একটি ছিপি উড়ুক্কু বোমার মতো উড়িয়া অর্জুনের সদ্যোত্থিত টাকে আসিয়া আঘাত করিল। বেচারা কয়েক দিন মাত্র পথে পথে ঘুরিয়াই টাকার বদলে একটি সুমার্জিত টাক অর্জন করিয়াছে।

আবার সে পাশের ঘরে খস-খস শব্দ শুনিল, শুধাইল—ওটা কিসের শব্দ?

কৃষ্ণ বলিল—সিল্কের শাড়ী ও হাজার টাকার নোটের শব্দ মিশিয়া গিয়াছে।

এমন সময়ে অর্জুন শুনিল, পাশের একটা ঘরে কে যেন বক্তৃতা করিতেছে। সে শুনিতে পাইল, বক্তা সবেগে বলিয়া চলিয়াছে—

চোরাবাজার দমন করতে না পারলে মুদ্রাস্ফীতির দৈত্য দেশের কণ্ঠ চেপে মেরে ফেলবে। চোরাবাজারীরা দেশের শত্রু, মানুষের শত্রু, স্বয়ং ভগবানের শত্রু। আমরা গভর্ণমেণ্টকে সনির্বন্ধ অনুরোধ করছি, তাঁরা যেন এক্ষুনি এদিকে মন দেন। গভর্ণমেণ্ট আইন করুন, অর্ডিনান্স করুন, চোরা-বাজারীদের ধরে জেলে দিন, ফাঁসি দিন, তাঁদের সম্পত্তি বাজেয়াপ্ত করুন—আমরা সকলে গভর্ণমেণ্টের পিছনে আছি।

এই পর্যন্ত বলিতেই চটাপট করতালি উঠিল। তারপর সেই ফটাফট ধ্বনি।

বিস্মিত অর্জুন বলিল—বক্তা কে?

কৃষ্ণ বলিল—চোরাকারবারীদের সেক্রেটারি।

অধিকতর বিস্মিত অর্জুন বলিল—তবে যে তিনি এমন বক্তৃতা দিলেন?

কৃষ্ণ রায় চোখে হাসির আভাস আনিয়া বলিল—This is politics.

তার পরে বলিল—বাংলায় যাকে বলে চোরের মায়ের ডাগর গলা—তাই আর কি!

আরও অধিকতর বিস্মিত অর্জুন বলিল—আমি তো কিছুই বুঝতে পারছি না।

কৃষ্ণ বলিল—সব বুঝিয়ে দিচ্ছি, আমি চোরাকারবারীদের প্রেসিডেন্ট কি না।

এই বলিয়া সে ঘরের দরজা বন্ধ করিয়া দিল, করিয়া দিয়া চেয়ারে আসিয়া বসিল, বসিয়া সময়োচিত গম্ভীর স্বরে বলিতে আরম্ভ করিল—

"হে মহাবাহো, তুমি আমার বাক্য শ্রবণে আনন্দিত হও, সেই জন্য আমি তোমার হিতকামনায় উৎকৃষ্ট তত্ত্বকথা পুনরায় বলিতেছি, তাহা শ্রবণ করো।

"কি রাজনীতিকগণ, কি মন্ত্রিগণ কেহই আমার উৎপত্তি অবগত নহেন। কেন না, আমিই রাজনীতি ও মন্ত্রিগণের সর্বপ্রকার আদি কারণ।

"যিনি আমাকে আদিহীন, জন্মরহিত ও সর্বলোকের প্রভু বলিয়া জানেন, মনুষ্য মধ্যে তিনিই মোহশূন্য হইয়া জ্ঞানাজ্ঞানকৃত সর্ব মোহ হইতে মুক্ত হন।

আমি সমস্ত রাজনীতির উৎপত্তি-স্থান, আমা হইতে সমস্তই প্রবর্তিত হয়, ইহা জানিয়া জ্ঞানীগণ ভক্তিভাবে আমার ভজনা করেন।"

অর্জুন বলিল—আপনি যে যে বিভূতি দ্বারা এই লোক সমূহ ব্যাপিয়া রহিয়াছেন, সেই সকল দিব্য আত্ম-বিভূতি সম্যকরূপে বর্ণনা করিতে একমাত্র আপনিই সমর্থ

কৃষ্ণ বলিল—"হে নরশ্রেষ্ঠ, আমার প্রধান প্রধান দিব্য অবলম্বন বস্তুসমূহ তোমাকে বলিব, কারণ আমার কীর্তির অন্ত নাই।

"আমি অক্ষর-সমূহের মধ্যে অকার, সমাস মধ্যে দ্বন্দ্ব, কালের মধ্যে আমি অকাল, ফলের মধ্যে আমি কুষ্মাণ্ড, সংহারগণের মধ্যে আমি দুর্ভিক্ষ, পুষ্পের মধ্যে আম নলিনী এবং নারীগণের আমি লাবণ্য।

"আমি শাসকগণের দণ্ড, আমি জিগীষুগণের নীতি, গোপনীয় বিষয়-সমূহের কারণ-স্বরূপ মৌন এবং আমি জ্ঞানিগণের প্রকৃত জ্ঞান।

"হে অর্জুন, যাহা সর্বভূতের বীজস্বরূপ তাহাও আমি। স্থাবর বা জঙ্গম এমন কোন বস্তু নাই যাহা আমা-ব্যতীত সত্তাবান হইতে পারে। হে অর্জুন, আমার দিব্য বিভূতির অন্ত নাই। কত আর বলিব। সংক্ষেপে এই সকল বিভূতির বর্ণনা করিলাম।

"ত্রিভুবনে যাহা যাহা ঐশ্বর্যযুক্ত, শ্রীসম্পন্ন বা শক্তিমান্, সেই সকলই আমার শক্তির অংশ সম্ভূত বলিয়া জানিবে। অথবা এত অধিক তোমার জানিবার প্রয়োজন কি? এই মাত্র জানিয়া রাখো যে আমিই সমগ্র জগৎ এক পাদ দ্বারা ব্যাপ্ত করিয়া রাখিয়াছি।"

তখন অর্জুন বলিল—"হে কৃষ্ণ, আমার প্রতি অনুগ্রহ করিয়া অতি গুহ্য যে অধ্যাত্ম-তত্ত্ব বলিলেন, তাহার দ্বারা আমার মোহ দূর হইয়াছে—এখন আমি যদি বিশ্বরূপ দেখিবার যোগ্য হইয়া থাকি তবে আমাকে বিশ্বরূপ প্রদর্শন করান।"

ইহা শুনিয়া কৃষ্ণ রায় বদন ব্যাদান করিল—তাঁহার ওষ্ঠ আকাশে ঠেকিল, অধর রসাতলে প্রবেশ করিল, তাঁহার বক্ত্র মহা গহ্বর প্রকাশ করিয়া আকাশ জুড়িল। তখন অর্জুন সেই দেবদেবের দেহে দেব, পিতৃ, মনুষ্যাদি নানা ভাবে বিভক্ত সমগ্র জগৎ অবয়বরূপে দেখিতে পাইল। তাহা দেখিয়া রোমাঞ্চিত-কলেবর অর্জুন তাহাকে প্রণাম করিল এবং যুক্তকরে বলিতে লাগিল—"হে দেব, আপনার এই বিশ্বরূপে সমস্ত দেবতা, অপদেবতা, মানব, মানবী, মন্ত্রী ও মেম্বর, জীবিত ও মৃত সকলকেই দেখিতে পাইতেছি। হে বিশ্বেশ্বর, আপনার বহু বাহু, বহু উদর, বহু মুখ ও বহু নেত্র, আপনি অনন্তরূপ, আপনি অমিত-ক্ষুধা। হে জগৎ-কারণ, এখন আমি বুঝিতে পারিতেছি যে আপনিই ভোট ও ভোটার, আপনিই কর্ম ও কর্মচারী, আপনিই মন্ত্রী ও মন্ত্রীত্ব, আপনিই চোর ও পুলিশ এবং আপনিই আসামী ও বিচারক।"

অর্জুন বলিল—"হে পরম কারণ, আপনিই শ্রমিক ও মালিক, আপনিই বক্তা ও শ্রোতা, আপনিই চালক ও চালিত এবং আপনিই রাষ্ট্র ও রাষ্ট্র-নায়ক।"

অর্জুন বলিল—"হে দেবদেব, যাহারা মনে করে আপনি ব্যতীত আর কিছু আছে, আপনাকে ব্যতীত আর কিছু হয়, তাহারা একান্ত ভ্রান্ত, তাহাদের পরিণাম হয় কারাগার নয় অরণ্য।"

"হে প্রভু, বহু মুখ, বহু বক্ষ, বহু বাহু, বহু উরু, বহু চরণ ও বহু উদর বিশিষ্ট এবং অসংখ্য বৃহৎ দন্ত দ্বারা ভীষণ আপনার বিরাট রূপ দেখিয়া সকল প্রাণী ভীত হইয়াছে এবং আমিও ভীত হইয়াছি।"

অর্জুন দেখিতে পাইল, লোক সমূহ' রাজনীতিক, অর্থনীতিক স্বার্থনীতিক, নরমপন্থী চরমপন্থী সকলেই তাঁহার মুখ-বিবরে প্রবেশ করিতেছে। যেমন নদী-সমূহের বদ্ধ জলস্রোত সমুদ্রাভিমুখে ধাবিত হইয়া বিলীন হয়, তেমনি পঁয়ত্রিশ লক্ষ লোক তাঁহার মুখে প্রবেশ করিতেছে। সে শুধাইল—বিশ্বমূর্তি আপনি কে তাহা আমাকে বলুন।

তখন কৃষ্ণ বলিল—"আমি লোকক্ষয়কারী সাক্ষাৎ কাল। এখন লোক

সংহার করিতে প্রবৃত্ত হইয়াছি। আমি মূর্তিমান চোরাবাজার। তুমি চোরাবাজারে প্রবৃত্ত না হইলে সেখানে যাইবার লোকের অভাব হইবে না এবং সংসারে কেহই জীবিত থাকিবে না। অতএব তুমি চোরাবাজার করিবার জন্য উত্থিত হও, যশোলাভ করো এবং শত্রু-মিত্র পরাজিত করিয়া নিষ্কণ্টকে সংসার ভোগ করো। আমা কর্তৃক সকলে পূর্বেই নিহত, হে অর্জুন তুমি নিমিত্ত মাত্র হও।

"হে অর্জুন, তুমি কাহার ভয় করিতেছ? মন্ত্রী, পুলিশ, প্রেসিডেণ্ট, গভর্ণর প্রভৃতিকে আমি পূর্বেই নিহত করিয়াছি, সেই মৃতদিগকে তুমি বধ করো। তুমি নিশ্চয়ই জয়লাভ করিবে, অতএব চোরাবাজারে প্রবেশ করো।"

কৃষ্ণের ব্যাদিত-বক্ত্রে দৃষ্টিপাত করিয়া সে দেখিতে পাইল—সেখানে গাঁট-গাঁট বস্ত্র, খাদ্য, চাল' ডাল, তেল ঘি সরিষা, আটা, ময়দা, কুইনাইন, সেফ্‌টি ব্লেড, পমেড, পাউডার, বিস্কুট, লজেন্স, চিনি, সোডা, কেরোসিন, পেট্রোল, সিমেণ্ট, লোহা-লক্কড়, চুণ-শুরকি, পাথরের টুক্‌রা, বড় বড় দোকান-পাট, ট্রাম-বাস, বহু জাহাজ ও নৌকা এবং প্রকাণ্ড সব সহর রহিয়াছে।

অর্জুন আরও দেখিল—সব নীচে রহিয়াছে পঁয়ত্রিশ লক্ষ লোকের কঙ্কাল। এবং তাহার নীচে একখানা জাতীয় পতাকা ও শাসনতন্ত্রের খসড়া-পুস্তক বিরাজমান।

অর্জুন শুধাইল—"প্রভু, জাতীয় পতাকা গ্রাস করিয়াছেন কেন?"

কৃষ্ণ বলিল—"এখনই কি হইয়াছে? ইহার পরে যে সমস্ত জাতিটাকেই গ্রাস করিব।"

অর্জুন পুনরপি শুধাইল—"আর ঐ শাসনতন্ত্রের খসড়াখানা কেন?"

কৃষ্ণ বলিল—"আমি শাসন ও শাসনতন্ত্র, আমার উদরেই উহার প্রকৃত স্থান।" তখন—দিব্যদৃষ্টিপ্রভাবে অর্জুন দেখিতে পাইল যে সংসার একটি বৃহদারণ্যক। এখানে যে যাহাকে পারে লুটিয়া লইতেছে, লজ্জা নাই, সঙ্কোচ নাই, বিচার নাই, কিছুমাত্র দ্বিধা নাই। সে দেখিতে পাইল, পতি পত্নীর বস্ত্রখানা কাড়িয়া লইয়া গিয়া চোরাবাজারে বিক্রয় করিয়া আসিতেছে, পত্নী স্বামীর তণ্ডুল-মুষ্টি লইয়া চোরাবাজারে বিক্রয় করিতেছে, আর পতি পত্নী উভয়ে মিলিয়া পুত্র-কন্যার অন্ন-বস্ত্র বেচিয়া দুটি 'honest pice' করিতেছে। সে দেখিতে পাইল, নেতাগণ বেনামে চোরাকারবারী। যে-ব্যক্তি দেড় মাস জেল খাটিয়াছে সে দেড় মণ অভিমান লইয়া সদর্পে চোরাবাজারে অবতীর্ণ।

পথের ভিক্ষুক হইতে রাজা মহারাজা অবধি স্ব স্ব শক্তি অনুসারে চোরাকারবার করিতেছে। বালক, যুবক, বৃদ্ধ বৃদ্ধা কেহ বাদ যায় নাই, মুমূর্ষু ব্যক্তি শেষ-নিশ্বাস পরিত্যাগ করিবার পূর্বে প্রিয়তম পুত্রকে চোরাবাজারের গুপ্ত সুড়ঙ্গের নির্দেশ জানাইয়া তবে মরিতেছে—এমন কি শিশুটিও ভূমিষ্ঠ হইয়া পারমিট, পারমিট বলিয়া চীৎকার করিয়া উঠিতেছে। এই সমস্ত দেখিয়া অর্জুনের ভীতি এবং সংস্কার দূরীভূত হইল।

তখন অর্জুন কৃষ্ণকে বলিল—"প্রভু, আপনার মধ্যে চোরাবাজারের বিশ্বরূপ দর্শন করিয়া আমার মোহ অপগত হইয়াছে, সংস্কার দূরীভূত হইয়াছে—আপনার প্রসাদে আমি মোহমুক্ত পুরুষে পরিণত হইয়াছি। এবারে আপনি দয়া করিয়া আপনার মানব-রূপ ধারণ করুন। আমার প্রতি প্রসন্ন হোন।"

তখন কৃষ্ণ তাহার বিশ্বরূপ সংবরণ করিয়া কৃষ্ণ রায় মূর্তি ধারণ করিল এবং বলিল—"হে অর্জুন, তোমার প্রতি প্রসন্ন হইয়া স্বীয় ঈশ্বরীয় শক্তিপ্রভাবে আমি অন্তঃশূন্য, আদিভূত উত্তম বিশ্বরূপ তোমাকে দেখাইলাম। তুমি ভিন্ন অন্য কেহ পূর্বে এইরূপ দেখে নাই। যে ব্যক্তি আমার কর্মকারী, কনিষ্ঠ ও মদ্ভক্ত এবং আত্মীয়-স্বজনাদিতে আসক্তি-শূন্য ও সর্বভূতে মায়াহীন, তিনিই আমাকে প্রাপ্ত হন।"

অর্জুনের মোহাপগত হইলে কৃষ্ণের সারথ্যে কৃষ্ণের মোটরে আরোহণ করিয়া দুই জনে ক্লাব পরিত্যাগ করিল। পরদিন প্রাতঃকালে অর্জুন বিশ্বরূপ দর্শনান্তর-জ্ঞানে বলীয়ান হইয়া চোরাবাজারে প্রবেশ করিল। মাত্র তিন বৎসরে সে তিন পুরুষের অর্থ সঞ্চয় করিয়া ফেলিল। পাঠক, তোমাদিগকে অর্জুন সিংহের ঠিকানা বলিতে পারিতাম—কিন্তু তাহার প্রয়োজন নাই। যেহেতু এ সংসারে সকলেই অর্জুন আর সকলেই কৃষ্ণ, তাছাড়া চোরাবাজারের আত্মাও পরমাত্মা। ইহাই এই কাহিনীর মর্মার্থ—এই কাহিনীটি একটি রূপক ভিন্ন আর কিছুই নয়। অতএব হে পাঠক—

"তস্মাৎ ত্বমুত্তিষ্ঠ যশো লভস্ব জিত্বা শত্রূন্ ভুঙ্ক্ষ রাজ্যং সমৃদ্ধম্।
ময়ৈবৈতে নিহতাঃ পূর্বমেব নিমিত্তমাত্রং ভব সব্যসাচিন্॥"

হে পাঠক, অর্জুনের মতো তোমার মোহ অপগত হোক, তুমি চোরাবাজারে প্রবেশ করো, তোমার সর্বাঙ্গীন শ্রীবৃদ্ধি হোক—ইহাই লেখকের আন্তরিক কামনা।

ভগবান কি বাঙালী ?

পাঠক, আমি একজন বাঙালী। আমার পিতা বাঙালী, পিতামহ বাঙালী, আমার চৌদ্দপুরুষ বাঙালী। আমি আপদমস্তক বাঙালী, মাথায় বহরে বাঙালী, একেবারে নিরেট বাঙালী—অর্থাৎ আমি ষোল আনা বাঙালী। নিন্দুকেরা বলিয়া থাকে ষোল আনা বাঙালী পনেরো আনা বর্বর।

পাঠক, মাঝে মাঝে আমার বাঙালী রক্ত টগবগ করিয়া ফুটিতে থাকে, দেহের শিরা উপশিরায় বাঙালী রক্ত যখন আশ্বিনের ক্ষেপা কুকুরের মত উত্তাল হইয়া ওটে, তখন আর নিশ্চলভাবে বসিয়া থাকিতে পারি না, চেয়ার ছাড়িয়া লাফাইয়া উঠি, পার্শ্ববর্তী কেরাণীটি শুধায়, কি হ'ল আপনার গৌড়চন্দ্র বাবু! কি হইল কেমন করিয়া বুঝাই? আমার শোণিত-সমুদ্রে যে তখন বিজয় সিংহের সিংহলযাত্রী নৌবহর ছুটিয়াছে—আমি কেমন করিয়া আফিসের লেজারের হিসাব মিলাইব?

একদিন আমার হিতাকাঙ্ক্ষী আত্মীয় স্বজন আমাকে ডাক্তারের কাছে ধরিয়া লইয়া গেল। বিজ্ঞ ডাক্তার পরীক্ষা করিয়া বলিল—ব্লাড প্রেশার। ব্লাড প্রেশারই বটে তবে সাধারণ প্রেশার নয়। বাঙালীর আবহমান কালের রক্তধারা তখন আমার মস্তিষ্কে চাপিয়াছে, আমি উতলা না হইয়া করি কি?

আজ যখন শুনিতে পাই যে আসামী, বিহারী, মাদ্রাজী, মুসলমান, ওড়িয়া বাঙালীকে মারিতেছে, তখন আমার অভিমন্যুর কথা মনে পড়ে। অভিমন্যু সপ্তরথীর মার খাইয়াছিল তাই বলিয়া কি সে বীর ছিল না? অবশ্য মার খাইয়া আমি ফিরিয়া মারি না, "রক্তচাই" বলিয়া বক্তৃতা করি এবং বাঙালী জীবনের শেষ ভরসা সংবাদপত্রে তাহার প্রতিবাদ করি।

পাঠক, যদি শুধাও যে সবাই বাঙালীকে কেন মারিতেছে। এক কথায় তাহার উত্তর দিতে পারি, ঈর্ষা। বাঙালী যে বড়, বাঙালী যে পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ জাতি, তাই সকলের চোখ টাটায়, তাই তাহারা মারে। বাঙালী বড় চাকুরী করে তাই সকলের চোখ টাটায়। অন্য প্রদেশের মূর্খরা বুঝিতে পারে না যে বড় চাকুরি করিবার সনদ লইয়াই বিধাতার নিকঠ হইতে বাঙালী আসিয়াছে। যে প্রদেশে যত মোটা মাহিনার চাকুরী আছে, সবগুলিতে বাঙালীর জন্মগত অধিকার। বিহারে, আসামে, উড়িষ্যায়, মাদ্রাজে, বোম্বাইতে, পাঞ্জাবে যেখানে যত মোটা

পথের ভিক্ষুক হইতে রাজা মহারাজা অবধি স্ব স্ব শক্তি অনুসারে চোরাকারবার করিতেছে। বালক, যুবক, বৃদ্ধ বৃদ্ধা কেহ বাদ যায় নাই, মুমূর্ষু ব্যক্তি শেষ-নিশ্বাস পরিত্যাগ করিবার পূর্বে প্রিয়তম পুত্রকে চোরাবাজারের গুপ্ত সুড়ঙ্গের নির্দেশ জানাইয়া তবে মরিতেছে—এমন কি শিশুটিও ভূমিষ্ঠ হইয়া পারমিট, পারমিট বলিয়া চীৎকার করিয়া উঠিতেছে। এই সমস্ত দেখিয়া অর্জুনের ভীতি এবং সংস্কার দূরীভূত হইল।

তখন অর্জুন কৃষ্ণকে বলিল—"প্রভু, আপনার মধ্যে চোরাবাজারের বিশ্বরূপ দর্শন করিয়া আমার মোহ অপগত হইয়াছে, সংস্কার দূরীভূত হইয়াছে—আপনার প্রসাদে আমি মোহমুক্ত পুরুষে পরিণত হইয়াছি। এবারে আপনি দয়া করিয়া আপনার মানব-রূপ ধারণ করুন। আমার প্রতি প্রসন্ন হোন।"

তখন কৃষ্ণ তাহার বিশ্বরূপ সংবরণ করিয়া কৃষ্ণ রায় মূর্তি ধারণ করিল এবং বলিল—"হে অর্জুন, তোমার প্রতি প্রসন্ন হইয়া স্বীয় ঈশ্বরীয় শক্তিপ্রভাবে আমি অন্তঃশূন্য, আদিভূত উত্তম বিশ্বরূপ তোমাকে দেখাইলাম। তুমি ভিন্ন অন্য কেহ পূর্বে এইরূপ দেখে নাই। যে ব্যক্তি আমার কর্মকারী, কনিষ্ঠ ও মদ্ভক্ত এবং আত্মীয়-স্বজনাদিতে আসক্তি-শূন্য ও সর্বভূতে মায়াহীন, তিনিই আমাকে প্রাপ্ত হন।"

অর্জুনের মোহাপগত হইলে কৃষ্ণের সারথ্যে কৃষ্ণের মোটরে আরোহণ করিয়া দুই জনে ক্লাব পরিত্যাগ করিল। পরদিন প্রাতঃকালে অর্জুন বিশ্বরূপ দর্শনান্তর-জ্ঞানে বলীয়ান হইয়া চোরাবাজারে প্রবেশ করিল। মাত্র তিন বৎসরে সে তিন পুরুষের অর্থ সঞ্চয় করিয়া ফেলিল। পাঠক, তোমাদিগকে অর্জুন সিংহের ঠিকানা বলিতে পারিতাম—কিন্তু তাহার প্রয়োজন নাই। যেহেতু এ সংসারে সকলেই অর্জুন আর সকলেই কৃষ্ণ, তাছাড়া চোরাবাজারের আত্মাও পরমাত্মা। ইহাই এই কাহিনীর মর্মার্থ—এই কাহিনীটি একটি রূপক ভিন্ন আর কিছুই নয়। অতএব হে পাঠক—

"তস্মাৎ ত্বমুত্তিষ্ঠ যশো লভস্ব জিত্বা শত্রূন্ ভুঙ্ক্ষ রাজ্যং সমৃদ্ধম্।
ময়ৈবৈতে নিহতাঃ পূর্বমেব নিমিত্তমাত্রং ভব সব্যসাচিন্॥"

হে পাঠক, অর্জুনের মতো তোমার মোহ অপগত হোক, তুমি চোরাবাজারে প্রবেশ করো, তোমার সর্বাঙ্গীন শ্রীবৃদ্ধি হোক—ইহাই লেখকের আন্তরিক কামনা।

ভগবান কি বাঙালী ?

পাঠক, আমি একজন বাঙালী। আমার পিতা বাঙালী, পিতামহ বাঙালী, আমার চৌদ্দপুরুষ বাঙালী। আমি আপদমস্তক বাঙালী, মাথায় বহরে বাঙালী, একেবারে নিরেট বাঙালী—অর্থাৎ আমি ষোল আনা বাঙালী। নিন্দুকেরা বলিয়া থাকে ষোল আনা বাঙালী পনেরো আনা বর্বর।

পাঠক, মাঝে মাঝে আমার বাঙালী রক্ত টগবগ করিয়া ফুটিতে থাকে, দেহের শিরা উপশিরায় বাঙালী রক্ত যখন আশ্বিনের ক্ষেপা কুকুরের মত উত্তাল হইয়া ওটে, তখন আর নিশ্চলভাবে বসিয়া থাকিতে পারি না, চেয়ার ছাড়িয়া লাফাইয়া উঠি, পার্শ্ববর্তী কেরাণীটি শুধায়, কি হ'ল আপনার গৌড়চন্দ্র বাবু! কি হইল কেমন করিয়া বুঝাই ? আমার শোণিত-সমুদ্রে যে তখন বিজয় সিংহের সিংহলযাত্রী নৌবহর ছুটিয়াছে—আমি কেমন করিয়া আফিসের লেজারের হিসাব মিলাইব ?

একদিন আমার হিতাকাঙ্ক্ষী আত্মীয় স্বজন আমাকে ডাক্তারের কাছে ধরিয়া লইয়া গেল। বিজ্ঞ ডাক্তার পরীক্ষা করিয়া বলিল—ব্লাড প্রেশার। ব্লাড প্রেশারই বটে তবে সাধারণ প্রেশার নয়। বাঙালীর আবহমান কালের রক্তধারা তখন আমার মস্তিষ্কে চাপিয়াছে, আমি উতলা না হইয়া করি কি ?

আজ যখন শুনিতে পাই যে আসামী, বিহারী, মাদ্রাজী, মুসলমান, ওড়িয়া বাঙালীকে মারিতেছে, তখন আমার অভিমন্যুর কথা মনে পড়ে। অভিমন্যু সপ্তরথীর মার খাইয়াছিল তাই বলিয়া কি সে বীর ছিল না ? অবশ্য মার খাইয়া আমি ফিরিয়া মারি না, "রক্তচাই" বলিয়া বক্তৃতা করি এবং বাঙালী জীবনের শেষ ভরসা সংবাদপত্রে তাহার প্রতিবাদ করি।

পাঠক, যদি শুধাও যে সবাই বাঙালীকে কেন মারিতেছে। এক কথায় তাহার উত্তর দিতে পারি, ঈর্ষা! বাঙালী যে বড়, বাঙালী যে পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ জাতি, তাই সকলের চোখ টাটায়, তাই তাহারা মারে। বাঙালী বড় চাকুরী করে তাই সকলের চোখ টাটায়। অন্য প্রদেশের মূর্খরা বুঝিতে পারে না যে বড় চাকুরি করিবার সনদ লইয়াই বিধাতার নিকঠ হইতে বাঙালী আসিয়াছে। যে প্রদেশে যত মোটা মাহিনার চাকুরী আছে, সবগুলিতে বাঙালীর জন্মগত অধিকার। বিহারে, আসামে, উড়িষ্যায়, মাদ্রাজে, বোম্বাইতে, পাঞ্জাবে যেখানে যত মোটা

চাকুরী সব আমি করিব, আমার ভাই করিবে, আমার ভাইপো করিবে, আমার ভাগ্‌নে করিবে, আমার শালা, সম্বন্ধী, তাঐ, শ্বশুর, তাহার শ্বশুর করিবে। সেই প্রদেশের লোকে সামান্যমাত্র আপত্তি করিলে তাহারা দেশদ্রোহী, বঙ্গদ্রোহী। পৃথিবীর বড় বড় চাকুরীগুলিতে একচেটিয়া অধিকার স্থাপন করিবার উদ্দেশ্যে শীঘ্রই সম্মিলিত জাতিপুঞ্জের দরবারে আমরা একটি ডেপুটেশন পাঠাইব। অবশ্য সব চাকুরী আমরা চাহি এমন স্বার্থপর নই, চৌকীদারী, দফাদারী, কেরাণীগিরি অন্য প্রদেশের লোকদের ছাড়িয়া দিতে রাজি আছি। বাঙালী আর যাই হোক স্বার্থপর নয়। হইবেই বা কেমন করিয়া? "Service is our birthrght!" এমন উদার-বাণী গৌতম বুদ্ধের পরে জগতে আব ধ্বনিত হইয়াছে কি?

বাঙালী যে বড়, বড় চাকুরী তাহার প্রথম প্রমাণ। আরও প্রমাণ আছে। পাঠক তুমি কি জানো যে জগতে যেখানে যত মহাপুরুষ হইয়াছেন সবাই বাঙালী ছিলেন। বাঙালী রক্ত ছাড়া মহাপুরুষ সম্ভবে না। এক ফোঁটা বাঙালী রক্তে তিনকোটি বিলিয়ন মহত্বের বীজাণু কিলবিল করিতেছে। বাঙালীর ইতিহাস যখন বাঙালীর কলমে লিখিত হইবে—তখন সমস্ত রহস্য আমূল প্রকাশিত হইয়া পড়িবে। ততদিন যদি সবুর করিতে না পারো, সামান্য কিছু আভাষ দিতে পারি। বুদ্ধ, যীশু, আলেকজাণ্ডার, আমেন হোটেপ, নেবুকাডনেজার, টুটেন খামেন, কনফিউসিয়াস, শঙ্করাচার্য, কালিদাস, কোমাগাটা মারু, মাউণ্ট ভিসুভিয়াস, টাইটানিক, ক্রমওয়েল, সিজার, নেপোলিয়ান, ইকোয়েটার, ল্যাটিচুড, জুপিটার, জেনারেল রোমেল, হিটলার, প্রেসিডেণ্ট রুজভেল্ট, Radar, হনুলুলু এবং লেখক স্বয়ং গৌড়চন্দ্র সবাই বাঙালী। নামের তালিকা বাড়াইয়া লাভ নাই—কোন মহাপুরুষের নাম মনে পড়িলেই ধরিয়া লইবে সে বাঙালী। প্রমাণ? ওইতো, তোমার মনে নিশ্চয় কোন অবাঙালী মন উঁকিঝুঁকি মারিতেছে নতুবা বাঙালীর গৌরব নির্ধারণের সময়ে প্রমাণের অপেক্ষা করিবে কেন? বরঞ্চ সিদ্ধান্ত আগে স্থির করিয়া আমার কাছে পাঠাইয়া দিও, আমি প্রয়োজনমতো প্রমাণ আবিষ্কার করিব।

বাঙালীর মহত্বের আরও প্রমাণ আছে। মানুষের ইতিহাস তাহারই কীর্তির ইতিহাস। বাঙালীর ভয়েই আলেকজাণ্ডারকে পাঞ্জাব হইতে ফিরিতে হইয়াছিল। তুমি ভাবিতেছে এ আবার কি? এইমাত্র বলিয়াছি; আলেকজাণ্ডার বাঙালী ছিলেন—তবে আবার তিনি ফিরিবেন কেন? ফিরিবেন না কেন?

বাঙালী বলিয়াই তিনি বাঙালীর বীরত্ব জানিতেন। কেমন খুশী হইলে তো? প্রমাণের চাহিদা মিটিল তো? এরূপ প্রমাণ আমি ঝুড়ি ঝুড়ি দিতে পারি। আরও চাও? বাঙালী বিজয়সিংহ সিংহল জয় করিয়াছিল। বাঙালী সিজার বৃটেন জয় করিয়াছিল। (দুয়ো ইংরাজ!) বাঙালী নেপোলিয়ান ইউরোপ জয় করিয়াছিল। বাঙালী মাউণ্ট এভারেষ্ট পৃথিবীর উচ্চতম ব্যক্তি। আরও দৃষ্টান্ত চাও? পাণ্ডবগণ বাঙালীর ভয়েই এদেশে আসে নাই। গৌতম বুদ্ধ পার্শ্ববর্তী মগধে ঘোরাফেরা করিয়াছে। এদেশে পদার্পণ করিতে সাহস করে নাই। জৈন তীর্থঙ্কর মহাবীর এদেশে আসিলে আদর্শবাদী বাঙালীরা তাহার প্রতি কুকুর লেলাইয়া দিয়াছিল। আর এই গৌরবের পুস্তকে উচ্চতম পৃষ্ঠাখানি সম্প্রতি যুক্ত হইয়াছে। বাঙালী গান্ধীর মস্তকে লাঠি মারিয়াছে। তাহার গায়ে ঢিল ছুঁড়িয়াছে। এই সংবাদ শুনিবামাত্র আমার হৃদয় বেলুনের মত ফুলিয়া উঠিয়া আমি গৌরবের আকাশে আনন্দে ভাসিয়া বেড়াইতেছি। একি কম গর্ব, কম উল্লাসের কথা? যাহা নোয়াখালির গোঁয়ার মুসমলানে পারে নাই, অসভ্য ইংরেজ পারে নাই, বাঙালীর ছেলে সেই কাজ করিয়াছে। পাঁচশত যুবকে মিলিয়া একক বৃদ্ধকে লাঠির আঘাত করিয়াছে, আগে ঘরের বাতি নিভাইয়া দিয়া, টেলিফোনের তার কাটিয়া দিয়া, তারপরে আঘাত করিয়াছে। উঃ, কি অপূর্ব রণকৌশল। ইহাতেও কি প্রমাণ হয় না যে নেপোলিয়ান ও রোমেল বাঙালী ছিল?

আক্রমণকারীগণ পূর্বাহ্নে মদ পান করিয়া লইয়াছিল, প্রত্যেকে নগদ পঞ্চাশ টাকা পাইয়াছিল এবং গান্ধীকে স্থানচ্যুত বা পৃথিবীচ্যুত করিতে পারিলে প্রত্যেকে একখণ্ড জমি ও নারী পাইবে আশ্বাস লাভ করিয়াছিল। ইহাই তো যুদ্ধের চিরাচরিত রীতিনীতি। কোন সৈনিক মগ্ত পান না করিয়া যুদ্ধে নামে? কোন সৈনিক বেতন না লইয়া অগ্রসর হয়? আর প্রত্যাবর্তনের পরে পুরস্কারের আশা না করিয়া থাকে কে? গান্ধী একক বলিয়া নগণ্য নয়। যে গান্ধী বৃটিশ সাম্রাজ্যকে পরাভূত করিয়াছে, বাঙালী সেই গান্ধীর মাথায় লাঠি মারিয়াছে, অতএব বাঙালী বৃটিশ সাম্রাজ্যকে পরাভূত করিয়াছে! কেমন, ন্যায়শাস্ত্রের নিয়মানুসারে ঠিক বলিয়াছি কিনা?

পাঠক তুমি শুধাইতে পারো বর্তমানে আমি কি করিতেছি। আমি একটি কঠিন, কঠিনতম গবেষণায় যুক্ত আছি। এই গবেষণায় সিদ্ধিলাভ করিলে বাঙালীর মহিমা, আর ভগবানের মহিমা সমার্থক হইয়া দাঁড়াইবে। আমি

প্রমাণ করিতে চেষ্টা করিতেছি যে স্বয়ং ভগবান বা ঈশ্বর বা God বাঙালী। অনেক প্রমাণ সংগ্রহ করিয়াছি। পুস্তকখানি সমাপ্ত হইলে সাতচল্লিশ হাজার পৃষ্ঠায় সমাপ্ত হইবে। ইহাতে পাঁচ হাজার প্লেট, দশ হাজার নক্‌সা, পঞ্চাশ হাজার diagram প্রভৃতি থাকিবে। অনেক বিচক্ষণ ব্যক্তি ইতিমধ্যেই বলিতে সুরু করিয়াছে যে এতবড় নিরেট পুস্তক পৃথিবীতে লিখিত হয় নাই, কিম্বা আর লিখিত হইবারও সম্ভাবনা নাই। কারণ ভগবান বাঙালী বলিয়া প্রমাণ হইয়া গেলে আর কি বলিবার বা ভাবিবার থাকিবে ?

এই নিরেট গবেষণার আর কিছু কিঞ্চিৎ আভাস তোমাকে দিব।

ভগবানের স্বভাব চরিত্র আচার ব্যবহার সম্বন্ধে শাস্ত্রাদি হইতে যাহা জানিতে পারা যায়, তাহাতে তিনি যে বাঙালী অর্থাৎ বাঙালী জাতিকে যে তাঁহার নিজের প্রকৃতি অনুসারে সৃষ্টি করিয়াছেন তাহাতে আর কোন সন্দেহ করিবার কারণ থাকে না।

(১) পাঠক, প্রথমেই দেখো, ভগবান অদৃশ্য, কিন্তু কোন কোন লোককে তিনি নাকি দেখা দিয়া থাকেন, বাঙালীর কি ইহাই স্বভাব নয় ?

অন্তঃপুর-আশ্রয়ী বাঙালী সাধারণের চোখে অদৃশ্যপ্রায় কিন্তু কোন কোন লোক অর্থাৎ নিজের দেন্দারের নিকটে সে অত্যন্ত দৃশ্য এবং অত্যন্ত স্পষ্টভাষী।

(২) দ্বিতীয় প্রমাণ ভগবান শক্তের ভক্ত, কিন্তু ভক্তকে বেঘোরে ফেলিয়া পলায়ন করেন। রাবণ ও নৃসিংহকশিপুকে তিন জন্মেই তিনি উদ্ধার করিয়াছেন অথচ যীশু, সক্রেটিস প্রভৃতি তাঁহার নাম-করা প্রচারকগণ মরিলেও তিনি অঙ্গুলিটিও উত্তোলন করেন নাই।

বাঙালীদেরও কি ইহাই স্বভাবগত নয় ? বাঙালী শক্তের ভক্ত নরমের যম। প্রমাণ ? প্রমাণ, তুমি আমি সকলেই। যে আসিয়া প্রণাম করে, তাহাকে খড়ম পেটা করি, আর যে লোককে শক্ত বলিয়া মনে হয়, তাহার খড়ম মাথায় ধরি।

(৩) ভগবান স্তাবকতা প্রিয়। এ পর্যন্ত গীতা, বাইবেল, বেদ প্রভৃতি যে-সব ধর্মগ্রন্থ লিখিত হইয়াছে তাহার পনেরো আনাই নিছক এবং নির্লজ্জ খোশামুদি। ভগবান তাহাতেই মুগ্ধ।

স্তুতি না করিলে কোন বাঙালী চোখ মেলিয়াও চাহে না।

(৪) ভগবান সর্বশক্তিমান, অথচ কাজের বেলায় দেখি তোমার পাঁচটাকা মাহিনা বৃদ্ধি করিতেও অক্ষম।

এ বিষয়ে বাঙালী ভগবানের অনুকরণস্থল। বাঙালী ইচ্ছা করিলে সাগর শুষিতে পারে, গিরি লঙ্ঘিতে পারে, ঘণ্টায় ঘণ্টায় বিপ্লব সাধন করিতে পারে কিন্তু সাগরের পরিবর্তে তাহারা পুঁইডাটা ও কলের জল গেলে, রাস্তার এপার হইতে ওপারে যাইতেও চাহেনা—আর বিপ্লব সাধন সে কেবল কাগজে কলমেই করে।

(৫) ভগবান পরম কারুণিক। করুণায় বাঙালীই বা কি কম? সে তাহার স্ত্রী পুত্র কন্যা পৌত্র পৌত্রী এবং শ্যালক শ্যালিকাগণের প্রতি করুণায় ভরপুর। এত করুণা যে অপরের জন্য আর কিছুই অবশিষ্ট থাকে না।

পাঠক, এইসব প্রমাণের একটিও নিশ্চয় অগ্রাহ্য করিবার মতো নয়। কিন্তু এতো সবে কলির সন্ধ্যা। আরও প্রমাণ আছে, সাতচল্লিশ হাজার পৃষ্ঠাব্যাপী প্রমাণ আছে, এইটুকুতে কত আর লিখিব? জ্যামিতি বীজগণিত, পদার্থবিদ্যা ও রসায়নশাস্ত্রের সহায়তায় আমি প্রমাণ করিয়াছি যে ভগবান বাঙালী। কেবল একটি সন্দেহ এখনও মনের মধ্যে খচ খচ করিতেছে, কোন সিদ্ধান্তে উপনীত হইতে পারি নাই, তাহা এই যে ভগবান বাঙালীকে সৃষ্টি করিয়াছেন, না বাঙালী ভগবানকে সৃষ্টি করিয়াছে—অথবা দুই-ই তৃতীয় কোন সত্তার দ্বারা সৃষ্ট। যাহাই হউক না কেন আমার এই নিরেট গবেষণা প্রকাশ হইলে বাঙালীর ভগবৎসমত্ব প্রমাণ হইবে। তখন বাঙালী বিশ্বের যাবতীয় জাতির পূজা আদায় করিবে এবং যথার্থভাবে বলিতে পারিবে—"আমরা বাঙালী"—অর্থাৎ পাঠক, তুমি আমি খুদু নেড়া যদু মধু এবং ভগবান—সবাই বাঙালী।

চোখে-আঙুল দাদা

পুরাকালে জম্বুদ্বীপে চোখে-আঙুল-দাদা নামে এক ব্যক্তি বাস করিত। তাহার এই অদ্ভুত নামটি নিজের কীর্তি দ্বারা অর্জিত। তাহার পিতৃদত্ত নাম সকলে ভুলিয়া গিয়াছিল। সকলের দোষ সে চোখে আঙুল দিয়া দেখাইয়া দিত বলিয়া সকলে তাহাকে চোখে-আঙুল-দাদা বলিয়া ডাকিত। তাহার দৃষ্টিতে কেহ বা কিছু নিখুঁৎ ছিল না। কোন লোককে সকলে সুপুরুষ বলিয়া প্রশংসা করিবামাত্র তাহার ভ্রূকুঞ্চিত চোখের দৃষ্টি ছিদ্রান্বেষী হইয়া উঠিত, সুপুরুষ ব্যক্তিটিকে সে আপাদ-মস্তক খুঁটিয়া দেখিয়া বলিয়া উঠিত—এই যে। এই বলিয়া তাহার অঙ্গুলি সুপুরুষের গালের একটি তিলের উপরে গিয়া পড়িত। সে বলিত—এত বড় একটা তিল থাকিতে তোমরা সুপুরুষ বলিতেছ! ছিঃ!

পূর্ণিমার চন্দ্রালোকে কোন ব্যক্তি মুগ্ধ হইলে চোখে-আঙুল-দাদা বলিত—শুধু যদি না কলঙ্ক থাকিত। একবার ভাবিয়া দেখো দেখি—ওই জায়গাটা কালো হওয়াতে কতটা আলো হইতে বঞ্চিত হইতেছি।

এক দিন তাহার গ্রামের কোন যুবক সদ্য-বিবাহিত বধূকে লইয়া ফিরিয়া আসিল। সকলে বউ দেখিতে গেল। বউটি অনুপম সুন্দরী। সকলেই বউ দেখিয়া সন্তুষ্ট হইল। এক জন চোখে-আঙুল-দাদকে শুধাইল, কেমন দাদা, এবার তো সর্বাঙ্গ-সুন্দর দেখিলে?

চোখে-আঙুল-দাদা ঈষৎ হাসিয়া বলিল—মন্দ নয়।

লোকটি বলিল—মন্দ নয়? এমন আর কখনো দেখিয়াছ?

দাদা বলিল—সুন্দর বটে। তবে একটি খুঁৎ আছে।

সকলে সমস্বরে শুধাইল—কি খুঁৎ আবার দেখিলে?

চোখে-আঙুল-দাদা বলিল—বউয়ের মুখে বসন্তের দাগ নাই কেন?

তার পরে সে বলিল—ভায়া, আমার দৃষ্টিকে ফাঁকি দেওয়া সহজ নয়। জগতে কিছু নিখুঁৎ থাকিলে তবে তো নিখুঁত দেখিব!

সকলে বুঝিতে পারিত না তাহার দৃষ্টি কোন্ বিধাতা সৃষ্টি করিয়াছিলেন? সকলে সংসারকে সুন্দর দেখে, চোখে-আঙুল-দাদার দৃষ্টিতে সংসারের মুখমণ্ডলে বার্ধক্যের বলি-চিহ্ন প্রকাশিত হইয়া পড়ে ভাবিয়া লোকে তাহাকে সমীহ করিত এবং ভয়ও যে না করিত এমন নয়।

আর এক দিনের ঘটনা বলিতেছি। সহরে একটি রাজপথের পার্শ্বে একটি গভীর নর্দমা ছিল। নর্দমাটি বিষাক্ত পঙ্কে পূর্ণ। এক দিন হঠাৎ এক জন লোক সেই নর্দমায় পড়িয়া গিয়া নিমজ্জিত হইতে লাগিল—সে রক্ষা পাইবার আশায় সকলকে ডাকিতে লাগিল। অনেক লোক জুটিয়া গেল—কিন্তু কে নামিবে? পঙ্ক যে কেবল গভীর মাত্র এমন নয়, বিষাক্ত বাষ্পে পরিপূর্ণ। যে নামিবে তাকে জীবনের আশা ছাড়িয়াই নামিতে হইবে। সকলে হায় হায় করিতে লাগিল, ওদিকে লোকটির নিশ্বাস রুদ্ধপ্রায় হইয়া আসিল। তখন একজন ভদ্রলোক গায়ের চাদর খুলিয়া ফেলিয়া নর্দমায় লাফাইয়া পড়িল এবং অনেক কষ্টে লোকটিকে উপরে তুলিল। কিন্তু বিষবাষ্পের ক্রিয়ায় অল্পক্ষণের মধ্যেই দুই জনেরই প্রাণ বাহির হইয়া গেল। সহরের লোকে স্থির করিল সেই মহাপ্রাণ উদ্ধারকর্তার উদ্দেশ্যে একটি স্মৃতিস্তম্ভ স্থাপন করিবে। কথাটা চোখে-আঙুল-দাদার কানে গেল সে ঈষৎ হাসিয়া বলিল—স্তম্ভ স্থাপন করিবে করো—কিন্তু ইহার মধ্যে মহাপ্রাণতা কোথায়?

সকলে বলিল—সে কি দাদা?

চোখে-আঙুল-বলিল—তা বই কি? আসল কথা তো আমার অজ্ঞাত নয়। উদ্ধারকর্তা বিপন্ন লোকটির কাছে অনেক টাকা পাইত। পাছে লোকটি মারা গেলে তাহার টাকা মারা যায় সেই আশঙ্কায় সে নর্দমায় নামিয়াছিল। ইহা তো হিসাব-নিকাশ লাভ-লোকসানের ব্যাপার—ইহার মধ্যে মহত্ব দেখিলে কোথায়?

লোকে তাহার কথা শুনিয়া অবাক্ হইয়া গেল!

তার পরে চোখে-আঙুল-দাদা আরও বলিল—কোন্ কথাই বা আমি জানি না। এই স্তম্ভ স্থাপনের ব্যাপারে যে সব চেয়ে অগ্রণী, তাহার যে সুবৃহৎ মার্বেল পাথরের কারবার আছে—ইহা কে না জানে? স্তম্ভ স্থাপন করিলে তাহার মার্বেল পাথর বিক্রয় হইবে—এই কারণেই কি তাহার উৎসাহ নয়?

তারপর সে সমবেত জনতাকে উদ্দেশ করিয়া বলিল—তোমরা ভালো মানুষ,—যাহার অপর নাম নির্বোধ, তোমরা ঠকিতে পারো, কিন্তু আমাকে ঠকানো অত সহজ নয়। এই বলিয়া সে হাসিল।

স্তম্ভটা স্থাপিত হইল বটে কিন্তু চোখে-আঙুলের ব্যাখ্যার গুণে লোকের আর তেমন উৎসাহ থাকিল না।

এই সব কারণে অর্থাৎ তাহার দৃষ্টির গুণে সবাই চোখে-আঙুলকে বড়ই

ভয় করিত। পারতপক্ষে কেহ তাহার কাছে ঘেঁসিত না, তাহাকে এড়াইয়া চলিত, কোন কাজে অগ্রসর হইবার আগে তাহাকে যথাসম্ভব উপঢৌকন পাঠাইয়া দিত, সকালে বিকালে তাহাকে গড় হইয়া প্রণাম করিত এবং উপদেশ লইবার অছিলায় তাহাকে খোসামোদ করিয়া আসিত। চোখে-আঙুল-দাদা বড় আরামে ছিল।

একবার চোখে-আঙুল-দাদা কামরূপ রাজ্যে বেড়াইতে গেল। সে তথায় পৌঁছিয়া দেখিল রাজ্যে বড় ধূম—ভারি উৎসবের ঘটা পড়িয়া গিয়াছে। সে দেশের অধিবাসিগণ নানা বর্ণের পোষাক পরিয়া, পতাকা তুরী ভেরী শঙ্খ জয়ঢাক লইয়া শোভাযাত্রায় বহির্গত। পথে অগণ্য পথিক, রথ অশ্ব হস্তী, কোথাও নৃত্য গীত হইতেছে, কোনখানে বা আতসবাজি পোড়ান হইতেছে, কোথাও বা যাত্রার আসরে শ্রোতার ভিড়।

ব্যাপারটা চোখে-আঙুল-দাদার বড়ই দৃষ্টিকটু ঠেকিল। সে ভাবিল—ইহারা নিতান্ত নাবালক দেখিতেছি, না বুঝিয়া কী ছেলেমানুষি কাণ্ড করিতেছে। তার পরে ভাবিল—আমি যখন আসিয়াছি, একবার সব শুনিয়া বুঝাইয়া দিই। বেচারা সব বৃথায় ছুটোছুটি করিয়া ঘামিয়া মরিতেছে!

তখন সে একজন লোককে জিজ্ঞাসা করিল—হাঁ বাপু, তোমরা ছেলেমানুষি করিতেছ কেন? কিসের জন্য এমন আয়োজন আমাকে বুঝাইয়া দাও তো।

লোকটি বলিল—আজ কামরূপ রাজ্য স্বাধীন হইল। এক পাহাড়ী জাতি এ রাজ্য অধিকার করিয়াছিল। তাহারা স্বেচ্ছায় এ রাজ্য ছাড়িয়া যাইতেছে—তাই এই উৎসব!

কারণ শুনিয়া চোখে-আঙুল-দাদা গালে হাত দিয়া বলিল—হায়, হায়, এত বড় ফাঁকিটা তোমরা ধরিতে পারিলে না। যদি ঘটে সেটুকু বুদ্ধি না থাকে—তবে আমাকে জিজ্ঞেস করতে কি হইয়াছিল?

লোকটি বিস্মিত হইয়া শুধাইল—ইহাতে ফাঁকি কোথায় দেখিলেন?

চোখে-আঙুল বলিল—আগা-গোড়াই ফাঁকি। সে বলিল—এ স্বাধীনতা স্বাধীনতা নয়, পরাধীনতার নূতন প্যাঁচ। এই সোজা কথাটা তোমরা বুঝিতে পারো নাই?

লোকটি বলিল—এখনও বুঝিতে পারিলাম না।

চোখে-আঙুল বলিল—তবে বুঝাইয়া দিই। আমাদের নূতন শাসকের মাথায় টাক এবং চোখে কালো চশমা—লক্ষ্য করিয়াছ কি? এ সবের অর্থ

কি? তোমাদের প্রধান মন্ত্রী ধুতি-চাদর পরে এবং দ্বিতীয় মন্ত্রীর পায়ে জুতা জোটে না—এ সমস্তর কারণ অবগত আছ কি?

লোকটি বলিল—অবশ্যই আছি কিন্তু এ সমস্ত যে নূতন পরাধীনতার লক্ষণ তো জানি না।

চোখে-আঙুল বলিল—তবে জানিয়া লও! এই বলিয়া খেদ করিতে লাগিল—হায়, হায়, একটা জাত আজ পরাধীন হইতে চলিল! ইতিমধ্যে তাহার চারিদিকে অনেকগুলি লোক জুটিয়া গেল। তখন সে তাহাদের সম্বোধন করিয়া বক্তৃতার সুরে বলিতে আরম্ভ করিল—ভাই সব, আজ তোমরা পরাধীন হইতে চলিলে! এ পরাধীনতার শৃঙ্খল হইতে আর কখনো মুক্ত হইতে পারিবে কি? শীঘ্র গিয়া নূতন শাসককে তোমরা সাদা নিশান দেখাও। তাহার কালো চশমায় সাদা নিশান কালো বলিয়া প্রতিভাত হইবে। শীঘ্র গিয়া প্রধান মন্ত্রীকে এক জোড়া শাল ও দ্বিতীয় মন্ত্রীকে এক জোড়া জুতা উপহার দাও। জামাহীন ও জুতাহীন মন্ত্রীর অধীনে বাস করা কি পরাধীনতা নয়? আর ঐ যে অদূরে একটা শান্ত্রী দেখিতেছি লোকটাকে দেশী বলিয়া বোধ হইতেছে। অবশেষে দেশী সঙীনের খোঁচা খাইবে? হায়, হায়, এমন অধঃপতন তোমাদের ঘটিল!

সত্য কথা বলিতে কি, কামরূপের অধিবাসিগণ একেবারেই অতিথিপরায়ণ নয়। তাহারা চোখে-আঙুল-দাদার বক্তৃতায় উত্তেজিত হইয়া উঠিয়া তাহাকে মারিতে মারিতে অল্পক্ষণের মধ্যেই তাহাকে সাধনোচিত ধামে প্রেরণ করিল।

২

চোখে-আঙুল-দাদা পরলোক গিয়া সোজা বিধাতা-পুরুষের নিকটে উপস্থিত হইল। বৃদ্ধ বিধাতাপুরুষ তখন সূচ-সূতা লইয়া ইতিহাসের জীর্ণ কন্থা সীবন করিতেছিলেন।

চোখে-আঙুল-দাদা তাহাকে গিয়া বলিল—স্যর, একটা কথা জিজ্ঞাসা করিতে পারি?

বৃদ্ধ বিধাতা মুখ তুলিয়া তাহার দিকে কিছুক্ষণ নির্বাক ভাবে তাকাইয়া থাকিয়া শুধাইল কি ব্যাপার?

সে বলিল—আমার নাম চোখে-আঙুল-দাদা, আমার বাড়ী গৌড় দেশে। সকলের দোষ আমি চোখে-আঙুল দিয়া দেখাইয়া দেই। তাহার ফলে আমি সাধনোচিত ধামে আসিয়া পৌছিয়াছি। তুমিই বুঝি বিধাতা-পুরুষ?

বিধাতা বলিল—হাঁ। কি চাও?

সে বলিল—আর কিছুই নয়। বিশ্বসৃষ্টির আগে আমার সহিত consult করিলে না কেন তাই জিজ্ঞেস করিতেছি।

বিধাতা শুধাইল—কেন বাপু?

চোখে-আঙুল-দাদা বলিল—তাহা হইলে বিশ্বে এত ভুল-ত্রুটি থাকিত না। ধর না কেন—এই যে এমন সুন্দর চাঁদটি—তাহাতে কলঙ্ক থাকিয়া গেল কেন? আমাকে আগে consult করিলে বলিতাম, ও জায়গাটুকুও আলো দিয়া লেপিয়া দাও।

বিধাতার মুখ দিয়া কথা সরিল না। সে চুপ করিয়া রহিল।

চোখে-আঙুল-দাদা বলিতে লাগিল—গোলাপফুলের সহিত কাঁটা দিবার কি আবশ্যক ছিল? আর কোকিলের স্বর এত মধুর করিলে কিন্তু তাহার রঙটা কালো করিলে কেন? মানুষের সংসারে সন্দেশ মাংস প্রভৃতি সুখাদ্য দিয়াছ কিন্তু তাহার সঙ্গে এত ব্যাধি কেন? মৎস্যকুলকে অবশ্য মানুষের খাদ্য করিয়াই জন্ম দিয়াছ কিন্তু তাহাদের দেহে অনর্থক এতগুলো কাঁটা দিবার হেতু কি? সংসার যদি সত্যই সুখের স্থান করিয়া গড়িলে তবে আধি ব্যাধি জরা-মৃত্যু ও ইনকাম ট্যাক্স সৃষ্টি করিবার সার্থকতা কোথায়? আবার জিরাফের গলা অনাবশ্যক লম্বা কেন? ওই মাংসটা গণ্ডারের গলদেশে যোগ করিয়া দিলে তাহার মনঃকষ্ট কি লাঘব হইত না? কত আর বলিব? এ সমস্ত ত্রুটির কারণ বিশ্বসৃষ্টি করিবার আগে তুমি 'Expert Opinion' গ্রহণ করো নাই। লোকে যাই বলুক, তোমাকে আমি নিখুঁত কারিগর বলিতে পারি না—বড় জোর তুমি মাঝারি-গোছের কারিগর মাত্র!

বিধাতা পুরুষ বলিল—আমি স্বীকার করিতেছি যে আমার সৃষ্টি নিখুঁত নয়, অনেক ভুল-ত্রুটি করিয়া ফেলিয়াছি—আর সব চেয়ে বড় ত্রুটি এই যে আমি তোমাকে সৃষ্টি করিয়াছি। আচ্ছা বাপু, এক কাজ কর তো।

এই বলিয়া বিধাতা-পুরুষ তাহাকে এক তাল মাটি দিয়া বলিল—একটি মানুষ গড়ো তো।

চোখে-আঙুল-দাদাকে এমন পরীক্ষায় কেহ ফেলে নাই। সে চিরকাল এমন অধ্যবসায়ের সহিত পরের ত্রুটি ধরিয়া আসিয়াছে যে তাহার যে ভুল-ত্রুটি থাকিতে পারে কেহ চিন্তা করে নাই।

এবারে সে বিপদে পড়িল।

অনেকক্ষণ পরিশ্রম করিয়া মাটি দিয়া সে একটি পুতুল গড়িয়া বিধাতাকে বলিল—দেখ, কেমন হইল ?

বিধাতা ভালো করিয়া দেখিয়া বলিল—ভালো হইয়াছে, এবারে আমি এই মনুষ্য-পুত্তলিতে প্রাণদান করিতেছি—দেখ কি হয়।

এই বলিয়া বিধাতা মন্ত্র পড়িয়া দিল। মৃৎ-পুত্তলি প্রাণ পাইয়াই চোখে-আঙুল-দাদার গালে সজোরে এক চপেটাঘাত করিল, বলিল—তবে রে শালা, আমাকে এমন করিয়া গড়িলে কেন : আমার হাত দু'টা খাটো, এক চোখে দেখতে পাই না, দুইটা কানই বধির—আবার একটা লেজও দিয়াছো। তোমার আর কাজ ছিল না ?

চপেটাঘাতে ঘূর্ণিত-শির চোখে-আঙুল-দাদা আসিয়া বিধাতা পুরুষের পশ্চাতে আত্মগোপন করিল।

বিধাতা-পুরুষ বলিল—কেমন ?

চোখে-আঙুল বলিল—তোমার মাটির দোষ

বিধাতা বলিল—বেশ, একটু মাটি গড়িয়া দাও না কেন ?

চোখে-আঙুল বলিল—পাইব কোথায় ?

বিধাতা বলিল—একটু মাটি গড়িতে পারো না ? এ আর এমন কি শক্ত ?

চোখে-আঙুলকে স্বীকার করিতে হইল সে যেমন ভুল ধরিতে পারে, তেমন গঠন-দক্ষতা তাহার নাই। সে বলিল—আমি চোখে-আঙুল দিয়া দেখাইয়া দিতে পারি—কিন্তু সেই চোখ বা আঙুল তৈয়ারির ক্ষমতা আমার নাই।

তার পরে সে বিধাতাকে বলিল—তাই বলিয়া আমাকে হীন মনে করিও না। এত ভুল-ত্রুটি কার চোখে পড়ে ?

বিধাতা বলিল—নরকবাসের ওই তো অসুবিধা

চোখে-আঙুল চমকিয়া উঠিল, বলিল—নরকবাস ? আমি তো স্বর্গে আসিয়াছি।

বিধাতা বলিল—তুমি যেখানেই আস না কেন, নিশ্চয় জানিও তুমি নরকে বাস করিতেছ।

চোখে-আঙুল বলিল—কেন ?

বিধাতা বলিল—যে সর্বদা ভুল-ত্রুটির জগতে বাস করিতেছে সে নরকের অধিবাসী ছাড়া আর কি ?

বিধাতা বলিল—সৌন্দর্যই স্বর্গ, সে সৌন্দর্য যেখানেই থাক না কেন।

বিধাতা বলিল—সন্তোষই বৈকুণ্ঠ, সে সন্তোষ যত পাপী তাপী দীন অভাজনের হৃদয়েই থাকুক না কেন?

চোখে আঙুল বলিল—স্বর্গ কি একটি বিশিষ্ট স্থান নয়?

বিধাতা বলিল—স্বর্গ বিশ্বময় ছড়াইয়া আছে, বৈকুণ্ঠ বিশ্বময় ছড়াইয়া আছে। যেখানে একটু সৌন্দর্য প্রতিভাত, যেখানে একটু সন্তোষ অনুভূত, সেই স্থানই স্বর্গ, সেই স্থানই বৈকুণ্ঠ!

চোখে আঙুল বলিল—তাই যদি হইবে তবে লোকে স্বর্গে আসিবার জন্যে এত চেষ্টা করে কেন?

বিধাতা বলিল—না করিলেও ক্ষতি ছিল না। তবে সকলের বিশ্বাস, সৌন্দর্যের ধাপে-ধাপে উন্নীত হইলে মহত্তর সৌন্দর্যলোকে পৌঁছান যাইবে তাই তাহারা স্বর্গে আসিতে চেষ্টা করে। কিন্তু যখন তাহারা স্বর্গে আসিয়া পৌঁছায়, দেখিতে পায় যে মর্তলোকের স্বর্গে ও এখানকার স্বর্গে কোন ভেদ নাই।

চোখে-আঙুল বলিল—তোমার এই থিওরিটাও নিখুঁত নয়। ওর গোড়াকার সিদ্ধান্তটাই ভ্রান্ত। যাক, এ বিষয়ে তোমার সঙ্গে আমি তর্ক করিতে চাই না—কারণ এ সব সূক্ষ্ম বিষয় তুমি বুঝিতে পারিবে না।

তার পরেএকটু থামিয়া বলিল—এবারে আমি কি করিব বলিয়া দাও।

বিধাতা-পুরুষ বলিল—তুমি আবার জম্বু দেশে ফিরিয়া যাও।

চোখে-আঙুল বলিল—সেখানে সবাই আমার উপর রুষ্ট হইয়া উঠিয়াছে।

বিধাতা বলিল—স্বভাবটা ছাড়িতে পারো না?

চোখে-আঙুল বলিল—গৌড়বাসি সব পারে, কেবল স্বভাব ছাড়া।

বিধাতা বলিল—বাপু, এখানে তোমার স্থান হওয়া কঠিন। তুমি এক কাজ করো—গৌড় দেশেই যাও। এখন হইতে সে দেশের সমস্ত অধিবাসী তোমার স্বভাব পাইবে। বিশ্বের ভুল-ত্রুটি ছাড়া সে দেশের লোকের চোখে আর কিছুই পড়িবে না—কাজেই তোমার ভয়ের আর কিছুই থাকিল না।

চোখে-আঙুল খুশী হইয়া বলিল—এত দিনে মনের মতন একটা বাসস্থান পাইলাম।

এই বলিয়া সে বিধাতা-পুরুষের উদ্দেশ্যে একটা অর্ধ-সমাপ্ত নমস্কার ঠুকিয়া প্রস্থান করিল—যাইবার সময়ে আপন মনে বলিল—A funny old fellow!

বিধাতা-পুরুষ আবার ইতিহাসের জীর্ণ কন্থা সীবনে মনোনিবেশ করিল।

লবঙ্গীয় উন্মাদাগার

লবঙ্গ দেশের রাজা একদিন শুনিতে পাইলেন যে, বিদেশ হইতে একজন বড় এঞ্জিনিয়ার রাজধানীতে আসিয়াছে। তিনি এঞ্জিনিয়ারকে ডাকিয়া পাঠাইলেন। সে ব্যক্তি রাজসমীপে পৌঁছিলে রাজা বলিলেন যে, আপনি এখানে আসিয়াছেন দেখিয়া আমি খুশী হইলাম—আমার একটি কাজ করিয়া দিলে আপনাকে আমি যথাসাধ্য পারিতোষিক দিব।

এঞ্জিনিয়ারের নাম সকল শর্মা।

সকল শর্মা শুধাইল—কি কাজ রাজন্! আমার সাধ্যাতীত না হইলে নিশ্চয় আমি করিতে চেষ্টা করিব।

রাজা বলিলেন—আমার রাজধানীতে একটি পাগলা গারদ বা উন্মাদাগার তৈয়ারী করিতে চাই।

সকল শর্মা বলিল—এ আর কঠিন কি? আমি কত হাসপাতাল, বিদ্যালয় ও বিজ্ঞানাগার তৈয়ারী করিয়াছি, এবারে উন্মাদাগার তৈয়ারী করিয়া দিব—ঐসব তৈয়ারী করিয়া হাতে খড়ি তো হইয়াই আছে। কিন্তু মহারাজ, উন্মাদাগারটি কত বড় হইবে আগে তাহা জানা আবশ্যক।

রাজা বলিলেন, একটা রাজ্যের পাগল আর কয়জন হইবে? প্রকৃতিস্থ লোকের সংখ্যার চেয়ে অনেক কম হইবে সন্দেহ নাই। তবু তুমি এক কাজ করো—রাজধানীতে ঘুরিয়া দেখো, কত জনের দেখা পাও। তারপরে সেই সংখ্যা অনুসারে উন্মাদাগারটি গড়িয়া দাও।

সকল শর্মা বলিল—যে আজ্ঞা, রাজন! তবে বিপদ এই যে, পাগল সব সময়ে চোখে দেখিলেই বুঝিতে পারা যায় তাহা নয়। বিশেষ, পাগল দুই প্রকার—বদ্ধ পাগল ও মুক্ত পাগল। বদ্ধ পাগলদের সহজেই চিনিতে পারা যায়; কিন্তু মুক্ত পাগলগণই বিপদ বাধায়—তাহাদের চেনা বড়ই কঠিন, কারণ তাহাদের আচরণ প্রায় স্বাভাবিক সুস্থ লোকের মতোই। গোলাকার পৃথিবী যেমন উত্তর ও দক্ষিণে হঠাৎ চাপা তেমনি মুক্ত পাগলগণ অন্যান্য সব বিষয়ে প্রকৃতিস্থ হইলেও বিশেষ বিশেষ বিষয়ে অস্বাভাবিক।

তার পরে সকল শর্মা বলিল—যাহা হোক, মহারাজ, আমার চেষ্টার ত্রুটী হইবে না—আমি রাজধানীতে বাহির হইলাম, পাগলের সংখ্যা নির্ণয় করিয়া যথোপযুক্ত উন্মাদাগার শীঘ্রই গড়িয়া দিতেছি, আপনি চিন্তা করিবেন না।

এই বলিয়া সকল শর্মা রাজধানী পর্যটনে বাহির হইল।

২

সকল শর্মা পথে বাহির হইয়া একটি বিরাট অট্টালিকা দেখিতে পাইল, দেখিল তাহার সিংহদ্বারে লিখিত আছে 'অত্যুচ্চ বিদ্যাগার।' তাহার কৌতূহল বোধ হইল। সে ইতিপূর্বে বিদ্যা ও উচ্চ বিদ্যা দেখিয়াছে, কিন্তু অত্যুচ্চবিদ্যা কখনো দেখে নাই। বাড়ীটাতে সে ঢুকিল। অসংখ্য সিঁড়ি ভাঙিয়া চারতলায় উঠিয়া বুঝিল, অত্যুচ্চ বিদ্যার সাক্ষাৎ পাইতে হইলে ফুসফুস মজবুত হওয়া আবশ্যক। চারতলায় একটি হল ঘর। সকল শর্মা দেখিল যে, ঐ ঘরে একজন ব্যক্তি (তাহার আচরণ দেখিয়া বুঝিল যে সে অধ্যাপক না হইয়া যায় না) ব্যস্তভাবে পায়চারি করিতেছে আর বলিতেছে—আমি তান্ত্রিক প্রক্রিয়া করিয়া বৃষ্টি নামাইয়াছি—বিশ্বাস না হয় দেখুন ঐ বৃষ্টি হইতেছে, সকাল বেলায় প্রক্রিয়া করিয়াছি—এখনো দেখুন, আমার কপালে রক্তচন্দনের ফোঁটা রহিয়াছে। অধ্যাপক বলিতেছে—কাল অভিচার করিয়া মন্ত্রী বেটাকে মারিব, পরশু মারিব ধর্মাধিকরণকে।

সে বলিতেছে আর ক্রমাগত নাসারন্ধ্রে নস্য (অপরের কৌটা হইতে লইয়া) দিতেছে। অন্যান্য অধ্যাপকেরা মন্ত্রমুগ্ধ হইয়া শুনিতেছে। এমন সময় একজন অধ্যাপক বলিল—আমার সিনিয়র বেটাকে মারিতে পারেন কি ? তাহা হইলে আমার উন্নতি ঘটে।

তান্ত্রিক অধ্যাপক বলিল—কেন পারিব না ?

অপর একজন অধ্যাপক বলিল—আপনি অভিচার তো জানেন—শুনিয়াছি আপনি ব্যাভিচারেও পারদর্শী। এ বিষয়ে—

তাহার কথা শেষ হইবার পূর্বেই তান্ত্রিক লাফাইয়া তাহার ঘাড়ে পড়িয়া বলিল—ভৈরব প্রেরিতোঽসি ! আজ তোর রক্ত পান করিব।

তাহার ভাব দেখিয়া সকলে—অর্থাৎ অন্যান্য বিজ্ঞ অধ্যাপক কেহ সাহায্য করিতে অগ্রসর হইল না, বরঞ্চ বলাবলি করিতে লাগিল—সবই মহামায়ার ইচ্ছা।

একজন বলিল—মরে তো মন্দ হয় না, আমার প্রোমোশন হয়।

আর একজন বলিল—যেটা মরে সেটাতেই লাভ।

অপর আর একজন বলিল—আহা দু'জন মরে না ? দুদিন ছুটি পাওয়া যায় —অনেকদিন শ্বশুরবাড়ী যাওয়া হয় নাই।

তখন মনোভাবের অভিব্যক্তিতে ঘরের মধ্যে এক বিচিত্র দৃশ্য উপস্থিত

হইল। কেহ কাঁদিতেছে, কেহ হাসিতেছে, কেহ প্রার্থনারত, কেহ পকেট হইতে মোদকের গুলি বাহির করিয়া খাইতেছে—তান্ত্রিক তাহার শত্রুর ঘাড়ে কামড় দিয়াছে আর সেই হতভাগ্য বলিতেছে—মরিব তাহাতে দুঃখ নাই কিন্তু চাকুরিটি যাইবে যে। নবঙ্গ দেশবাসীর চাকুরি গেলে আর কি থাকে।

এমন সময়ে ঘরের বাহিরে একদল ছাত্র জুটিয়া গেল। তাহারা সেই অপূর্ব দৃশ্য দেখিয়া বলিল—এ যে সাম্রাজ্যবাদের লড়াই। চলো, সবাই একটা ধর্মঘট করি।

এই সব ব্যাপার দেখিয়া সকল শর্মা অত্যুচ্চ বিদ্যার একটা আভাস পাইল। সে মনে মনে 'নোট' করিয়া লইয়া নীচে নামিয়া আসিল।

সকল শর্মা চলিতে চলিতে দেখিতে পাইল, একটি অর্ধ সমাপ্ত অট্টালিকাকে ঘিরিয়া এমন প্রায় দশ হাজার লোক বসিয়া আছে। সেই জনতার মধ্যে সদ্যজাত শিশু হইতে মুমূর্ষু বৃদ্ধ অবধি আছে। জনতাটি দেখিয়া সকল শর্মা বুঝিতে পারিল যে, এখানে এইভাবে তাহারা দীর্ঘকাল রহিয়াছে, কারণ উনুনের ছাই জমিতে জমিতে স্তূপাকার হইয়াছে। তাহার আরও মনে হইল যে, ইহারা শীঘ্র এই স্থান ছাড়িবে না, কারণ ছায়া পাইবে আশায় অনেকেই বৃক্ষ রোপণ করিতেছে। কিন্তু কেন যে তাহারা এখানে আছে—আর ঐ অসমাপ্ত বাড়ীটাই বা কি, সে কিছুই বুঝিয়া উঠিতে পারিল না। তখন সে জনতার একজনকে শুধাইল—বাপুহে, তোমরা এখানে বসিয়া রোদে পুড়িতেছ, জলে ভিজিতেছ, ব্যাপারটা কি? আর ঐ বাড়ীটাই বা কি?

তাহার কথা শুনিয়া জনতা একবাক্যে অর্থাৎ একধ্বনিতে হাসিয়া উঠিল, বলিল, দেখ্, দেখ্ একটা পাগল দেখ্!

কেহ বলিল—লোকটা এই বাড়ীটা চেনে না?

কেহ বলিল—লোকটা জীবনের উদ্দেশ্য জানে না।

কেহ কেহ বলিল—সাবধানে কথা বলিস্। এমন লোকের পক্ষে হঠাৎ কামড়াইয়া দেওয়া কিছুমাত্র বিচিত্র নয়।

লোকটা অর্থাৎ সকল শর্মা বলিল—যা বলিলে সবই সত্য—তবু আসল ব্যাপার কি খুলিয়াই বলো না। তারপরে তাহাদের সম্মিলিত ভাষণ হইতে সে বুঝিতে পারিল যে, ঐ বাড়ীটি সম্পূর্ণ হইলে একটি 'সিনেমা হাউস' হইবে। পাছে বিলম্ব হইয়া গেলে টিকিট না মেলে তাই সকলে সময়মতো অর্থাৎ কিছু আগে আসিয়া বসিয়া আছে। সে শুনিল যে, তাহারা এখানে

এই অবস্থায় প্রায় আড়াই বৎসর রহিয়াছে। বাড়ী তৈয়ারী করিতে করিতে মালিকের টাকা ফুরাইয়া যাওয়ায় সে ব্যবস্থা করিতে গিয়াছে, টাকা লইয়া সে আবার শীঘ্রই ফিরিবে। আর যদি নাই ফেরে—তাই বলিয়া তো সাধন-মার্গ ত্যাগ করিতে পারা যায় না। তাছাড়া অন্যত্র গিয়াই বা তাহারা কি করিবে? সময় মতো সিনেমা দেখা ছাড়া ল-বঙ্গবাসী জীবদের আর কি-ই বা উদ্দেশ্য আছে?

সমস্ত ব্যাপার শুনিয়া সকল শর্মা বলিল—আচ্ছা, তোমরা ঠিক করিয়া বলিতে পারো যে, তোমরা পাগল নও?

একজন ছোকরা বলিয়া উঠিল—সাধনপন্থার নিষ্ঠা দেখিয়া যদি আমাদের পাগল মনে করো তবে আমরা পাগল। কিন্তু যীশু, বুদ্ধ, রামকৃষ্ণ, গান্ধী—তাঁহারাও কি এইরূপ পাগল নহেন?

আর একজন বলিল—বাজে কথায় সময় নষ্ট করা উচিত নয়—হঠাৎ টিকিট ঘর খুলিতে পারে—অতএব অন্যমনস্ক হইও না।

সকল শর্মা দেখিল যে, তাহার সঙ্গে আর কেহ কথা বলে না—তাই সে অন্যত্র যাইতে বাধ্য হইল।

ল-বঙ্গ দেশের রাজধানী দেখিয়া সকল শর্মার চক্ষু ধন্য হইয়া গেল। এখানে পথের কি জনতা আর কি ব্যবস্থা! যানবাহনের ছাদ হইতে চাকা অবধি সর্বত্র যাত্রী ঝুলিতেছে, প্রত্যেক খানি গাড়ী যেন এক একটি নরনারী-কুঞ্জর। সে দেখিল মোটরগুলি তীব্রবেগে ছুটিয়া আসিয়া যাত্রী পথিককে চাপা দিতে চেষ্টা করিতেছে—আর মজা এই যে, চাপা পড়িলে মোটরের চাকার হানি হইল বলিয়া সবাই আহত পথিককেই মারে। নিহত হইলে মড়ার উপর খাঁড়ার ঘা দেয়। সে দেখিল, বাজারে এক টাকার জিনিষ দশ টাকা মূল্যে বিক্রীত হইতেছে—কিন্তু তাই বলিয়া কি ক্রেতার অভাব আছে? সে দেখিল, কো-এডুকেশনের মতো ল-বঙ্গ দেশে 'কো-পারচেজিং' প্রথা চলিত। দোকানে ক্রেতা জোড়ায় জোড়ায় বর্তমান, একজন স্ত্রী, একজন পুরুষ। স্ত্রীলোকটি দর দাম, জিনিষ গ্রহণ ও পরে ব্যবহার সবই করে, পুরুষটির ভার কেবল দাম দিবার। দাম শুনিয়া পুরুষটি ইতস্ততঃ করিলে মেয়েটি বলিয়া ওঠে, তোমার কি চক্ষুলজ্জা নাই? এমন জানলে আমি.......এমন হলে আমি আজই.......হতভাগ্য পুরুষ বহু পরিশ্রমের বাহ্য প্রতীকস্বরূপ খানকতক

কড়কড়ে নোট বাহির করিয়া দেয়, মেয়েটার মুখে হাসি ফোটে, বিক্রেতার মুখে আভাসে খেলিয়া যায়—এই জন্যেই তো ওরা শক্তিময়ী।

রাজধানীর প্রান্তে ফুটবল খেলা হইতেছিল—সকল শর্মা সেখানে গেল। সে দেখিল, বাইশজন খেলোয়াড়ে মিলিয়া রেফারিকে মারিতে চেষ্টা করিতেছে, রেফারি চতুর, সে ক্রমাগত মার বাঁচাইয়া যাইতেছে, ফলে বেচারা চামড়ার গোলকটার উপরে দমাদম লাথি পড়িতেছে। খেলার সময় শেষ হয়-হয়, রেফারি অনাহত রহিয়া যায়, ঠিক এই রকম অবস্থায় দশ হাজার দর্শক খেলার মাঠে ঢুকিয়া পড়িল—তাহারা রেফারির প্রহার দেখিবার আশায় টিকিট কিনিয়াছে—খেলোয়াড়দের অপটুতায় পয়সা নষ্ট হইতে তাহারা দিবে না। দশ হাজার দর্শকের চেষ্টা নিস্ফল হইবার নয়, রেফারি মারা পড়িল—পরদিনের সংবাদ-পত্রগুলি বলিল—রেফারিকে মারিতে গিয়া আরো শতাবধি লোক মারা পড়িয়াছে। কিন্তু এমন হইয়াই থাকে—পাকা ফলটি লক্ষ্য করিয়া ঢিল ছুঁড়িলে সঙ্গে কাঁচা ফল কি পড়ে না?

সকল শর্মা বুঝিল, ল-বঙ্গ দেশের উন্মাদাগার অপ্রশস্ত হইলে চলিবে না। পরদিন মধ্যাহ্নে সে একটি প্রকাণ্ড অট্টালিকার কাছে গিয়া উপস্থিত হইল। দেখিতে পাইল বাড়ীটির চূড়ায় এক জোড়া নাতি-বৃহৎ দাঁড়ি-পাল্লা খোদিত। সে বুঝিল, ইহা একটি বাজার বা দোকান বাড়ী। সে ভিতরে ঢুকিল, কেহ বাধা দিল না। সে প্রকোষ্ঠ হইতে প্রকোষ্ঠান্তরে গেল, কেহ বাধা দিল না। প্রত্যেক প্রকোষ্ঠে ক্রেতা ও বিক্রেতা সে দেখিতে পাইল। সে দেখিল, বিক্রেতা মাথায় পরচুলা পরিয়া গম্ভীরভাবে চেয়ারে আসীন—আর ক্রেতা ও দালালগণ তাহার সম্মুখে কত কাকুতি-মিনতি, কত আবেদন-নিবেদন করিতেছে। সে ভাবে-ভাষায় বুঝিল, খুব দামী জিনিষ বিক্রয় হইতেছে। কিন্তু জিনিষটা যে কি তাহা সে বুঝিয়া উঠিতে পারিল না। তখন সে একজন পুলিশকে শুধাইল—ভাই, এখানে কি বিক্রয় হয়?

তাহার কথা শুনিয়া পুলিশ রুল উচাইয়া মারিতে আসিল—সকল শর্মা ছুটিতে ছুটিতে কলার খোসায় পা ফসকাইয়া স্কেটিং করিবার মতো এক মুহূর্তে পঞ্চাশ গজ চলিয়া গেল। কাছেই দুইজন রিপোর্টার দাঁড়াইয়া ছিল, তাহারা ছবি তুলিয়া লইয়া বলিল, "ভালই হল, অবসর সময়ে কাশ্মীরে ভারতীয় সৈন্যরা স্কেটিং করিতেছে বলিয়া ছবিটাকে চালিয়ে দেবো—দেশের লোকেও খুশি হবে—আবার 'ওরাও' একটু জব্দ হবে।"

সকল শর্মা রিপোর্টারদের বলিল,—ভাই, ছবির একখানা কপি পাই না?

একজন রিপোর্টার বলিয়া উঠিল—মশকরা করবার আর জায়গা পাননি!

অপরজন বলিল—প্রত্যেক কপি দশ টাকা!

সকল শর্মা বলিল—আমার ছবি আমাকে কিনতে হবে?

সে বলিল—কেন নয়? বাজার ঘুরে দেখো না!

সকল শর্মা প্রস্থান করিল।

সকল শর্মা মাঝে মাঝে রাজপ্রাসাদে গিয়া রাজার সঙ্গে দেখা করিত। রাজা শুধাইতেন, কি, আমার পাগলা গারদের কত দূর?

সকল শর্মা বলিত—আগে পাগলের সংখ্যা নির্ণয় করিয়া লই।

রাজা হাসিয়া বলিতেন—খুঁজিয়া পাইতেছ না বুঝি! দেখো, আমি আগেই বলিয়াছিলাম, এ রাজ্যে পাগল বেশী নাই।

সকল শর্মা উত্তর করিত না—চলিয়া আসিত।

একদিন পথ চলিতে চলিতে সকল শর্মা দেখিতে পাইল যে, একজন বৃদ্ধকে একদল বালক ঘিরিয়া ধরিয়াছে, বলিতেছে যে, এখনি মাপ চাইতে হইবে আর এক শ' টাকা জরিমানা দিতে হইবে।

সকল শর্মা শুধাইল—ব্যাপার কি?

একটি পাঁচ বৎসরের বালক বলিল—দেখুন, এই ভদ্রলোক আমাকে অপমান করিয়াছে, তাই আমার ক্লাবের সদস্যগণ দণ্ডবিধান করিতে আসিয়াছে।

সকল শর্মা শুধাইল—এই ভদ্রলোক তোমার কে?

বালকটি বলিল—বাড়ীতে 'ফাদার', পথে ভদ্রলোক।

সকল শর্মা দেখিল, ভদ্রলোকটি নিরুপায় হইয়া পুত্রের নিকটে ক্ষমা চাহিল আর তখনি ক্লাবের সেক্রেটারীর হাতে নগদ এক শ' টাকা গণিয়া দিল।

সকল শর্মা মনে মনে 'নোট' করিয়া প্রস্থান করিল। এইভাবে মাসাবধি কাল রাজধানীর পথে পথে ঘুরিয়া সকল শর্মা পাগলা গারদ তৈয়ারী করিতে লাগিয়া গেল এবং আরও এক মাস পরে রাজ-প্রাসাদে গিয়া রাজাকে সংবাদ দিল—রাজন্ পাগলা গারদ তৈয়ারী হইয়াছে।

রাজা বলিলেন—চলো, দেখিয়া আসি।

এই বলিয়া তিনি সকল শর্মার সহিত উন্মাদাগার দেখিতে বাহির হইলেন।

রাজা শুধাইলেন, কোথায় গারদ?—

সকল শর্মা বলিল—চলুন দেখাইতেছি।

রাজা সহরের মধ্যে কোথাও গারদ দেখিতে পাইলেন না, তখন সকল শর্মা তাঁহাকে রাজধানীর প্রান্তে লইয়া গিয়া দেখাইল যে, সে সমস্ত রাজধানীটা প্রাচীর দিয়া ঘিরিয়া দিয়াছে। রাজা বলিলেন—এ কি করিয়াছ?

সকল শর্মা বলিল—এই তো পাগলা গারদের বেষ্টনী।

রাজা বলিলেন—কিন্তু গারদ কোথায়?

সকল শর্মা বলিল—রাজন্ রাজধানীটাই গারদ। ইহার চেয়ে ছোট গারদ হইলে কুলাইত না।

রাজা শুধাইলেন তার মানে?

সকল শর্মা বলিল—মানে তো স্পষ্ট। রাজধানীর সকলেই পাগল।

রাজা আবার শুধাইলেন—সে কি রকম?

সকল শর্মা তাহার মাসাধিকাল নগর ভ্রমণের অভিজ্ঞতা বর্ণনা করিয়া বলিল—ইহারা যদি পাগলা না হয় তবে পাগল আর কাহাকে বলে?

রাজা বলিলেন—তবে আমিও কি পাগল?

সকল শর্মা বলিল—সত্য বলিতে কি রাজন্....আপনিও পাগল।

—কেন?

—কোন প্রকৃতিস্থ ব্যক্তি কি এতগুলি পাগলের উপরে রাজত্ব করিতে পারে?

রাজা ক্ষিপ্ত হইয়া বলিলেন—তোমার মৃত্যুদণ্ডের আদেশ দান করিব।

সকল শর্মা বলিল—তাহা হইলে আপনার পাগলামি সম্বন্ধে যেটুকু সন্দেহ ছিল তাহাও দূরীভূত হইবে। পাগলের রাজ্যে প্রকৃতিস্থ ব্যক্তির এইরূপ পরিণাম ছাড়া কি হইতে পারে?

তাহার কথা শুনিয়া রাজা ও অমাত্যগণ তাহাকে তাড়া করিল। সে ছুটিতে ছুটিতে বেগতিক দেখিয়া পথের একটি manhole খুলিয়া তন্মধ্যে প্রবেশ করিল এবং এক ডুব সাঁতারে নদীতে পড়িয়া সহরের বাহিরে আসিয়া উপস্থিত হইল।

তাহার দুর্দশা দেখিয়া রাজা ও অমাত্যগণ হাসিয়া উঠিল, বলিল—যাক, পাগলাটা পালাইয়াছে, ভালই হইয়াছে।

রাজা প্রাচীরটা ভাঙ্গিয়া দিবার আদেশ দিলেন।

সাবানের টুক্‌রো

এক টুক্‌রো সাবান মানুষের কপালে যে-কত বড় পরিবর্ত্তন ঘটাইয়া দিতে পারে, আমার জীবন তাহার সাক্ষী। অতিশয় সামান্য বস্তুর অসামান্য ফল! আশ্চর্য কিন্তু অসম্ভব নয়! কয়েকটা হাঁসের হঠাৎ-জাগা কলগুঞ্জনের ফলে রোমনগরী রক্ষা পাইয়াছিল; খান কতক তিরপল ক্লাইভের বারুদের গাড়ী ঢাকা দিয়া রাখিয়াছিল বলিয়া ভারত সাম্রাজ্য হস্তান্তরিত হইতে পারিয়াছিল, কাজেই এক টুকরা সাবান যে একজন লোকের জীবনে এমন বিস্ময়কর পরিবর্তন ঘটাইয়া দিবে, একসঙ্গে অর্ধেক রাজত্ব ও রাজকন্যা জুটাইয়া দিবে, ইহা বিস্ময়কর হইলেও, একেবারে অসম্ভব মনে করিবার কারণ নাই।

এতকাল পরে আজ সমস্ত কথা মনে পড়িয়া হাসি পাইতেছে। বোধ করি ইহাই কালের নিয়ম, বোধ করি ইহাই মানুষের স্বভাব। নিকট হইতে যাহা রুক্ষ ও স্পষ্ট, দূরে গিয়া পড়িলে তাহাকেই মধুর ও কোমল মনে হয়, তাহার ললাটে বলিচিহ্ন দূরত্বের অদৃশ্য করস্পর্শে কেমন করিয়া মুছিয়া যায়। যে পাহাড় নিকটের দৃষ্টিতে পাথরের পিণ্ড মাত্র, দূরের দৃষ্টিতে তাহা কি তেপান্তরের রাজকন্যার ইন্দ্রনীল শিলায় গড়া প্রাসাদের অলিন্দ নয়? চোখের জলের বন্যায় মানুষের ধনপ্রাণ ভাসিয়া যায়, কিন্তু একটু দূরে গিয়া দাঁড়াইলেই তাহাকে কাললক্ষীর গলায় তরল মুক্তার হার বলিয়া মনে হয়। সংসারে এই যাদুমন্ত্রটি আছে বলিয়াই মানুষ বাঁচে। সূর্যের আলোর প্রতিষেধক নিশীথের জ্যোৎস্না!

তখন, সে আজ অনেক দিনের কথা, কলিকাতায় হিন্দু-মুসলমানের মারামারি চলিতেছে। চিরকাল একসঙ্গে বসবাস করিবার পরে হঠাৎ সকলে আবিষ্কার করিয়া ফেলিয়াছে তাহারা আর একসঙ্গে থাকিতে পারে না। আর যেহেতু পৃথিবীতে বাসযোগ্য স্থান সঙ্কীর্ণ, এক সম্প্রদায় অপর সম্প্রদায়কে ভূ-পৃষ্ঠ হইতে দূর করিবার জন্য উদ্যত হইয়া উঠিয়াছে! হঠাৎ হিন্দু ও মুসলমান দুই-ই ঘোরতর নিষ্ঠাবান্ হইয়া পড়িয়াছে। হিন্দু পাড়ায় মুসলমান আসিলে ফেরে না, মুসলমান পাড়ায় হিন্দু গেলে আর আসে না। মুসলমান সমাজে একতা বরাবরই কিছু অধিক, সম্প্রতি প্রয়োজনের তাগিদে ও আক্রমণের আশঙ্কায় হিন্দু সমাজেও ঘনিষ্ঠতা দেখা দিয়াছে—অর্থাৎ ন্যায়রত্ন মহাশয় সুবর্ণবণিকের দাওয়ায় বসিয়া পানটা খান, কিন্তু জলপান করেন না, আর হুঁকা হইতে কল্কে খুলিয়া জলের স্পর্শ বাঁচাইয়া ধূম পান করেন। অগ্নি তো পাবক!

পাড়ার যে হিন্দু যুবক মুসলমান হত্যা করিয়াছে সকলের চোখে সে দুর্বলের ত্রাতা, যে ওই কাজে আহত হইয়াছে সকলে তাহাকে বীরাগ্রগণ্য মনে করে। কেহ এসব হত্যাণ্ডের প্রতিবাদ করে না, করা উচিত নয় বলিয়া কিম্বা করিবার সাহস নাই বলিয়া। সকলেরই ইহাতে উৎসাহের অন্ত নাই। যদি কেহ ইহার বিরোধী থাকে, তবে জানিবার উপায় নাই, যেহেতু মনের কথা খুলিয়া বলিলে তাহাকে একঘরে হইতে হইত, কিম্বা অপঘাতও অসম্ভব ছিল না।

এতদিন পরে বলা যাইতে পারে যে এসব ব্যাপার আমার ভালো লাগিত না। চুপ করিয়া সহ্য করিতাম, কিছু বলিবার উপায় ছিল না। আর ওই লইয়া যে একটা আন্দোলন করিব, সে রকম আমার স্বভাবও নয়। কিন্তু আমার মৌন অসম্মতি বোধ করি পাড়ার প্রবীণ ও যুবকদের অজ্ঞাত ছিল না। প্রকাশ্যে আমার বিরুদ্ধাচরণ করিবার কোন কারণ ঘটে নাই, অথচ আমার নীরব অসমর্থনকে সহ্য করাও কঠিন। অবস্থাটা এমনি দাঁড়াইয়াছিল।

এখানে বলা যাইতে পারে যে বরাবরই আমি পাড়ার লোকের ঈর্ষাভাজন ছিলাম। যে পরিমাণ বিদ্যা বুদ্ধি ও বেতনের অঙ্ক হইলে লোকে অহঙ্কারী মনে করে—আমার সে-সবের ন্যূনতা ছিল না। তাহারা আমাকে অহঙ্কারী মনে করিত, কিন্তু কেমন করিয়া তাহাদের বুঝাইব যে আমার নীরবতা অহঙ্কারের ফল নয়, মুখচোরা মানুষ ঘনিষ্ঠ-বন্ধুসমাজের বাহিরে গিয়া পড়িলে ডাঙায়-তোলা কই মাছের মত বিসদৃশ অবস্থায় পড়ে। কিন্তু তাই বলিয়া কই মাছকে তো অহঙ্কারী বলা চলে না। লোকে যাহাকে মিশুক লোক বলে, আমি একেবারেই তাহা নই। আমি সন্ধ্যাবেলা ক্লাবে যাই না, সকাল বেলায় রোয়াকে বসিয়া সংবাদপত্রের সঠিক আলোচনা করি না, স্থানীয় জন-বান্ধব সমিতির সদস্যপদের জন্য ভোট ভিক্ষা করি না, অবশ্য চাঁদা দিই! কিন্তু সেটাও গুণ না হইয়া আমার ক্ষেত্রে দোষ হইয়াছে, ওটা নাকি আমার অহঙ্কারের লক্ষণ। আমি পাড়ার লোকের সঙ্গে মিশিবার চেষ্টা করি নাই বলিলে কম বলা হয়, না-মিশিবার চেষ্টা করিয়াছি। এবং এই সব অপরাধের ফল স্বরূপ একপ্রকার একঘরে হইয়া আছি।

এমন সময় হিন্দু মুসলমান দাঙ্গা বাধিয়া উঠিল। ঘরে ঘরে যে সব কল্কি এতকাল আত্মগোপন করিয়াছিল তাহারা ম্লেচ্ছ নিবহ নিধনে লোহার ডাণ্ডা ও আগ্নেয়াস্ত্র ধারণ করিল। অপর পক্ষে মুজাহেদ বাহিনী সশস্ত্রে বাহির হইল—এবং এই দুই বাহিনীর মধ্যে পড়িয়া উভয়পক্ষের উলুখড়ের প্রাণান্ত ঘটিতে লাগিল।

পাড়ায় একটা মুসলমান বালক মারা পড়িলে নিষ্ঠাবান হিন্দু-ঘরে শঙ্খ বাজিয়া উঠিত, আর সংশ্লিষ্ট কল্কিকে গৃহলক্ষ্মীরা মালাচন্দন দিয়া বরণ করিয়া লইতেন। এসব বিষয়ে মেয়েদের উৎসাহই যেন কিছু বেশী! সে কি দুর্বল বলিয়া? দুর্বলের হিংসা বলবান্ ব্যক্তিকে আশ্রয় করিয়া প্রকাশ পায়? কিম্বা মুসলমান গুণ্ডার হাতে মেয়েদের লাঞ্ছনা অত্যন্ত অধিক হয় বলিয়াই মেয়েরা বোধ করি নিজেদের অজ্ঞাতসারেই পুরুষের চেয়েও বেশি করিয়া মুসলমান বিদ্বেষী হইয়া পড়িয়াছে। যাই হোক কারণটা ঠিক না জানিলেও মেয়েদের উৎসাহ কিছু বেশি দেখিতাম। কোন হিন্দু কল্কি মুসলমান মারিতে গিয়া আহত হইলে তাহার শরীরের ব্যাণ্ডেজ ভিক্টোরিয়া ক্রসের সম্মান লাভ করিত। ভর্তি ট্রামে বসিবার জায়গার তাহার অভাব হইত না, রেশনের দোকানে তাহাকে লাইনে পড়িতে হইত না, পান সিগারেটের দোকান তাহাকে ফ্রি রসদ জোগাইত। সে যে কল্কি।

একদিন সকালে এক মুসলমান ছাতাওয়ালা পাড়ায় আসিয়া উপস্থিত হইল। ছাতা মেরামতকারীরা প্রায় সকলেই মুসলমান! কেহ এদিকে আসে না। প্রায় একবৎসরকাল পাড়ার কল্কি ও তাহাদের আত্মীয় স্বজনদের ছাতা সারানো হয় নাই। সকলে ছাতাওয়ালাকে সাদরে ডাকিয়া বসাইয়া ছোট বড় মাঝারি ভাঙা আধ-ভাঙ্গা একুনে একত্রিশটি ছাতা সারাইয়া লইল। ছাতা প্রতি এক টাকা। একত্রিশ টাকা পাইবে ভাবিয়া লোকটা খুব খুশী হইল। কাজ সারিয়া যখন সে উঠিতে যাইবে, ঠিক এমন সময় একজন বলিল, তোমার বাড়ী নোয়াখালি নয়। লোকটা বলিল—হাঁ, কর্তা।

অমনি চারদিক হইতে থান ইট তাহার মাথায় বর্ষিত হইতে লাগিল। নোয়াখালির সহিত ইট বর্ষনের সম্বন্ধ বুঝিবার আগেই লোকটা পিষ্ট হইয়া প্রাণত্যাগ করিল। তাহার মস্তিষ্কের খানিকটা অংশ ফুটপাতের উপরে পড়িয়া বারকয়েক শিহরিয়া উঠিল। একজন প্রবীন বলিল, ও জাতই এমন যে মরেও মরে না।

এই ভাবে কাজ উদ্ধার করিয়া লইয়া লোকটাকে মারিয়া ফেলায় পাড়ার লোকে অত্যন্ত আত্মপ্রসাদলাভ করিল। একজন আমাকে আসিয়া বলিল—চলুন না, দেখবেন, আমাদের ছেলেদের কি রকম Strategy জ্ঞান!

Strategy জ্ঞান দেখিবার আমার ইচ্ছা ছিল না। 'না' বলিয়া দিলাম। তাহারা যাইতে যাইতে বলাবলি করিতে লাগিল—ও, উনি যে Intellectual!

একজন বলিল—বিশ্ব প্রেমিক! অপর একজন বলিল—ভবিষ্যতে যেন সাবধান হ'য়ে চলাফেরা করেন! অপর একজনের কণ্ঠস্বর কানে আসিল—বিশ্বাস-ঘাতক আর মুসলমানে তফাৎ কি!

আমার অপরাধটা কি বুঝিতে না পারিয়া আমি মূঢ়ের মতো বসিয়া রহিলাম! এইবারে পাঠক বুঝিতে পারিবেন আশঙ্কার কি ক্ষুরধার পন্থা বহিয়া আমি চলিতেছিলাম। এমন সময়ে সামান্য এক টুক্‌রা সাবান আমার জীবনের ধারা পরিবর্তিত করিয়া দিল।

একদিন স্নানের ঘর হইতে তাড়াতাড়ি বাহির হইবার সময়ে এক টুকরা সাবানের উপরে পা পড়িল। ভিজা মেঝের পিচ্ছিল সাবান সবেগে পদস্খলন ঘটাইয়া দিল, পড়িয়া গিয়া দেয়ালের কোণে কপাল লাগিল এবং কাটিয়া গিয়া দরদর বেগে রক্ত পড়িতে সুরু করিল। কোন রকমে উঠিয়া ক্ষতস্থান ধুইলাম, খানিকটা টিন্‌চার আইওডিন লাগাইলাম, তারপরে অনভ্যস্ত হাতে একটা ব্যাণ্ডেজ জড়াইয়া দেখিলাম। নূতন পরিস্থিতে চেহারাটা দেখিতে কেমন হইয়াছে সে লোভ সংবরণ করিতে না পারিয়া আয়নার সম্মুখে আসিয়া দাঁড়াইলাম। সাদা ব্যাণ্ডেজ-ঢাকা মাথাটা দধির প্রলেপে আচ্ছাদিত বলিয়া মনে হইল। আমি যখন অনায়াসে নিজেকে দেখিতেছিলাম, তখন পাশের বাড়ী হইতে কেহ যে আমাকে দেখিতেছিল তাহা কি জানিতাম!

দুপুর বেলা নীচের তালার বৈঠকখানা ঘরে বসিয়া বিশ্রাম করিতেছি এমন সময়ে পাড়ার একদল যুবক আসিয়া উপস্থিত হইল, তাহাদের মধ্যে অনেকে কল্কি। ভাবিলাম হয় চাঁদা চাহিতে নয় শাসাইতে আসিয়াছে। কিন্তু যাহা শুনিলাম তাহাতে বিস্ময়ের অন্ত রহিল না। তাহারা কিছু ফলমূল টেবিলের উপর রাখিয়া শুধাইল—স্যার, কি ভাবে আপনি আঘাত পেলেন তা জানতে চাইনে, কিন্তু কোন্ পাড়ার খুনে বলুন। আমরা প্রতিবিধান ক'রে আসছি।

আমি তাহাদের বক্তব্য বুঝিতে না পারিয়া বলিলাম—না, না এজন্য আপনাদের চিন্তা করতে হবে না।

একজন বলিল—হবেনা? কি বলছেন। এ যে সাম্প্রদায়িক আঘাত?

আমি বল্‌লাম—মোটেই নয়, এ আঘাতের জন্য আমি দায়ী।

অপর একজন বলিল—এক হিসাবে সে কথা সত্য। আঘাত যেই করুক না কেন, আহত হওয়ার খানিকটা দায়িত্ব নিজের বই কি!

তখন সকলে আমাকে কনগ্রাচ্যুলেট করিয়া বলিল, আজ আপনার কপালে যে রক্ত তিলক পড়লো, তার গৌরবের ভাগী আমরা সবাই। আর এতদিন আপনি ছিলেন বিশ্ব প্রেমিক, আজ আপনি যথার্থই বাঙালী হ'লেন।

শেষের কথাগুলি শুনিয়া বুঝিলাম বক্তা বৌদ্ধগান ও দোহা পড়িয়াছে, বোধ করি বাংলা সাহিত্যের এম-এ!

কয়েক ঘণ্টার মধ্যে আমি পাড়ার 'হীরো' হইয়া দাঁড়াইলাম। বিদ্যা-বুদ্ধির জন্য এতদিন ঈর্ষার পাত্র ছিলাম, এবারে তাহার উপরে রক্ত তিলকের সীল মোহর অঙ্কিত হওয়ায় আমি একজন Super কল্কি হইয়া দাঁড়াইলাম। মূর্খেরা যাহাই বলুক বিদ্বান্‌কে মনে মনে মাত্রাতিরিক্ত ভক্তি করিয়া থাকে।

বিকাল বেলা পাড়ার প্রবীণতম ও ধনীতম মুরব্বি আমার বাসায় আসিয়া পদধূলি দিলেন, বলিলেন, যাক, বাবা এতদিনে তোমাকে আমাদের মধ্যে পেলাম! তারপরে, একটু থামিয়া বলিলেন, দেখি wound-টা কি রকম?

ইনি একজন বিজ্ঞ চিকিৎসক। ক্ষতস্থান দেখিয়া ডাক্তার বাবু বলিলেন — একি হয়েচে? সর্বনাশ! চলো, চলো, আমার ডাক্তারখানায়! এ যে সেপ্‌টিক হ'য়ে যাবে।

ভালো মানুষের মতো আমি ডাক্তারবাবুর পিছনে পিছনে চলিলাম!

মুখে মুখে আমার বীরত্বের কাহিনী রটিতে লাগিল, এবং পরস্পরের কল্পনার প্রতিযোগিতার ফলে চব্বিশ ঘণ্টার মধ্যে কর্ণার্জুনের মাসতুতো ভাই হইয়া পড়িলাম।

একজন বলিলেন চার জন মুসলমান হত্যা ক'রে তবে আহত হয়েছি।

কেহ বলিল, দুজনকে নিকেশ করেছি, এমন সময়ে একটা গুলি।

তারপরে ব্যাখ্যা করিয়া বলিল, উনি একজন সাহিত্যিক কিনা, মাথার খুলিটা খুব শক্ত, তাই ভেদ করতে পারেনি। গুলিটা ওঁর কপালে লেগে রিবাউণ্ড করে একটা মুসলমানের চোখে লেগে চোখ কানা করে দিয়েছে।

এই রকম কত রটিল। ফল কথা, কেহই বিশ্বাস করিলনা যে আমার আঘাত অসাম্প্রদায়িক। রণক্ষেত্রে যে মরে সে-ই 'হীরো' তা অস্ত্রাঘাতেই মরুক আর ডায়েবিটিসেই মরুক। সূক্ষ্ম বিচারের স্থান রণক্ষেত্রে নয়। কলিকাতা যে এখন কলির কুরুক্ষেত্র!

ডাক্তারবাবু সযত্নে ব্যাণ্ডেজ বাঁধিয়া দিলেন এবং চা আনিবার জন্য ভৃত্যকে আদেশ করিলেন। চা আসিল এবং সেই সঙ্গে আসিল তাঁহার কন্যা রেবা।

ডাক্তারের ঔষধের আলমারির মধ্যে যে জাতীয় বস্তু থাকে রেবা ঠিক তাহার বিপরীত। বরঞ্চ বঙ্কিমচন্দ্রের কোন উপন্যাসের পাতা হইতে সে বাহির হইয়া আসিতে পারিত। চা পান করিলাম। একটু পরিচয় হইল। তারপর দিন আবার চা পান করিতে আসিলাম। তারপর দিন আবার এবং তার পর, তার পর……এমনি করিয়াই চলিল। পাড়ার অনেক প্রবীণ পিতা ডাক্তার বাবুকে ঈর্ষা করিতে লাগিল। এমন একজন বরণীয় বরের মাথায় কেবল একটা ব্যাণ্ডেজ বাঁধিয়া তাহাকে পকেটস্থ করিয়া ফেলিলে কোন্ কন্যার পিতা তাহা সহ্য করিতে পারে। অতঃপর ঘটনা দ্রুততর লয়ে চলিল। ডাক্তার বাবু তাঁহার কন্যার পাণিগ্রহণ করিবার জন্য আমাকে অনুরোধ করিলেন। আমি সলজ্জ সম্মতি প্রকাশ করিলাম। কিন্তু একটা কথা খচ খচ করিয়া মনের মধ্যে বিঁধিতে লাগিল। আমার কপাল ফাটার মিথ্যা বিবরণের উপর নির্ভর করিয়া রেবাকে গ্রহণ করিতে কেমন যেন বাধিতেছিল। স্থির করিলাম তাহাকে সত্য ঘটনা খুলিয়া বলিব, তারপরে কপালে যা থাকে।

একদিন নির্জনে পাইয়া রেবাকে বলিলাম—দেখো, তোমাকে আজ একটা সত্য কথা বলতে চাই। আমার কপালফাটার মূলে—

রেবা আমাকে থামাইয়া দিয়া বলিল—জানি।

—জানো? কি জানো?

রেবা বলিল—সবই! সাবানের টুক্‌রোয় পা পিছলে—

বিস্মিত হইয়া বলিলাম—কেমন ক'রে জানলে?

সে বলিল, তোমার বাড়ীর চাকর আর আমাদের চাকরের একই গ্রামে বাড়ী, বালিয়া জেলায়। তোমার চাকর আমার চাকরের কাছে গল্প করেছিল, তার কাছ থেকে আদায় ক'রে নিয়েছি।

তখন আমি বলিলাম—এখন কি করবে? আমি কিন্তু 'হীরো' নই!

রেবা বলিল—'হীরো' হ'লে রাজি হতাম কি না সন্দেহ!

স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলিলাম। এবারে কপালের ক্ষতকে সত্যই রাজ তিলক বলিয়া মনে হইল।

তারপরে দীর্ঘকাল চলিয়া গিয়াছে। সেই সাবানের শুভ্র টুক্‌রো আমার জীবনাকাশে সৌভাগ্যের শুক্লা শশীর মতো আজিও উজ্জ্বল হইয়া আছে। সে দিনের কথা আলোচনা করিয়া মাঝে মাঝে আমি ও রেবা হাসি! আর সে কখনো কখনো আমাকে হীরো বলিয়া ডাকে।

"শিখ"

১

আকন্দপুর ও মুকুন্দপুর কলিকাতার সন্নিকটে দুইখানি ছোট গ্রাম। দু'খানিকে একটি গ্রাম বলিলেও চলে—কিন্তু গাঁয়ের লোকেরা দুটি গ্রাম বলে, আমরাও বলিব। আকন্দপুর মুসলমান গ্রাম, মুকুন্দপুর হিন্দু গ্রাম। এ পাড়া ও পাড়া দুটি গ্রাম। দুই গ্রামের লোকের মধ্যে সৌহার্দ্য আছে, যাতায়াত আছে—মাঝখানে একটি মাঠ ও একটি পথের মাত্র দূরত্ব।

এই ভাবে তাহাদের চলিতেছিল, এমন কত বৎসর চলিয়াছে কেহ বলিতে পারে না, এবং সবাই ভাবিত এমনি ভাবেই চলিবে। এমন সময়ে কলিতাতায় ১৬ই আগষ্টের হিন্দু-মুসলমান দাঙ্গা বাধিয়া উঠিল; সে খবর আকন্দপুর ও মুকুন্দপুরে পৌঁছিল। প্রথমে জনশ্রুতিতে পৌঁছিল। তার পরে ডেলি-প্যাসেঞ্জারের বর্ণনায় পৌঁছিল, দুই গ্রামের অনেক লোক কলিকাতায় ডেলি-প্যাসেঞ্জারি করিয়া চাকরি করে—তার পরে সংবাদপত্রের পৃষ্ঠায় সচিত্র ও সরসভাবে পৌঁছিল। ফলে আকন্দপুর ও মুকুন্দপুরে যাতায়াত বন্ধ হইয়া গেল।

দুই গ্রামই ডেলিপ্যাসেঞ্জারদের প্রত্যাবর্তনের আশায় উদ্‌গ্রীব হইয়া থাকে—তাহাদের মুখে আধুনিকতম খবর পাওয়া যাইবে। ডেলিপ্যাসেঞ্জারের দল ফিরিলে মুকুন্দপুর ও আকন্দপুর তাহাদের ঘিরিয়া বসে।

মুকুন্দপুরের হিন্দুদের আসরে বক্তা বলিতে থাকে—ভাইসব, হিন্দু আর রইলো না; আমি স্বচক্ষে দেখেছি পাঁচ হাজার মুসলমানে মিলে অমুক পাড়াটা জ্বালিয়ে দিলো, হিন্দুরা যেমনি ঘর ছেড়ে বেরিয়েছে অমনি মুসলমানেরা তাদের উপর প'ড়ে তাদের টুক্‌রো টুক্‌রো ক'রে ফেললো। একটা প্রাণী বাঁচলো না।

শ্রোতারা প্রত্যক্ষদর্শীর বর্ণনায় শিহরিয়া ওঠে। কিন্তু কেহ শুধায় না, এত হিন্দু মরিল অথচ বক্তা বাঁচিল কি ভাবে?

আকন্দপুরের মুসলমান শ্রোতাদের মধ্যে মুসলমান ডেলিপ্যাসেঞ্জার বলিতে থাকে—ভাইসব, আল্লার নিতান্ত কৃপায় আমি বেঁচে ফিরেছি। অমুক পাড়ায় আর একটাও মুসলমান নেই—হিন্দুরা সব মেরে ফেলেছে। শুধু তাই নয়, যখন আর একটাও মুসলমান পেলো না, হিন্দুরা গোরস্থান থেকে মুসলমানের দেহ তুলে তাদের পুনরায় হত্যা করলো।

শ্রোতারা ঘৃণায় ও আতঙ্কে শিহরিয়া ওঠে। সকলেই বুঝিতে পারে তাহাদের সংবাদ দানের উদ্দেশ্যেই আল্লা বক্তাকে বাঁচাইয়া রাখিয়াছেন।

এইভাবে প্রতিদিন সন্ধ্যায় আকন্দপুর ও মুকুন্দপুরের আসর জমে, এবং নিত্য নূতন উত্তেজনার আগুনে তাহারা হাত পা তাতায়। কোন দিন খবরের ন্যূনতা জন্মিলে শ্রোতারা অসন্তোষ প্রকাশ করে—ফলে বক্তাকে প্রতিদিন আগের দিনের চেয়ে সুর ও রং চড়াইয়া বক্তৃতা করিতে হয়।

এইরূপ প্রত্যক্ষদর্শন-সঞ্জাত অভিজ্ঞতা শুনিয়া হিন্দুরা ভীত ও মুসলমানেরা উত্তেজিত হয়। যদি জিজ্ঞাসা করো, এক শ্রেণীর সংবাদে দুই দলের এমন ভিন্ন ব্যবহার কেন? তবে বলিব, যাহার যেমন স্বভাব। হিন্দুরা চিরকাল ভীত ও মুসলমানেরা সর্বত্র উত্তেজিত হইয়া আসিতেছে। আকন্দপুর ও মুকুন্দপুরেই বা তাহার ব্যতিক্রম হইতে যাইবে কেন?

ইতিমধ্যে আকন্দপুর ও মুকুন্দপুরের সৌহার্দ্য ও বিশ্বাস নষ্ট হইয়া গিয়াছে। হিন্দু মুসলমান কেহ অপরের গ্রামে প্রবেশ করে না, দূর হইতে একে অপরকে দেখিলে সন্দিগ্ধভাবে তাকায়, পরস্পরের চাদরের তলে কি আছে অনুমান করিতে চেষ্টা করে—এবং যে যাহার গ্রামের দিকে দ্রুত প্রস্থান করে।

মুকুন্দপুর ও আকন্দপুর রাত্রি জাগিয়া গ্রাম পাহারা দেয়, দিনে পালাক্রমে ঘুমায়, আর দিনে রাতে জটলা পাকাইয়া বসিয়া তামাক খায়। দুই গ্রামেরই তামাকের খরচ অত্যন্ত বাড়িয়া গিয়াছে।

একদিন মুকুন্দপুরের সংবাদদাতা হাসিমুখে ফিরিয়া আসিল। শ্রোতারা শুধাইল—ব্যাপার কি?

সংবাদদাতা বলিল—শিখ!

সবাই শুধাইল—সে আবার কি?

সাংবাদদাতা বলিল—কলিকাতায় যে-কয়টি হিন্দু আজো জীবিত আছে সে কেবল শিখদের দয়াতে।

এই বলিয়া সে ব্যাখ্যা করিয়া বলিল—পঞ্চাশ জন শিখে পঞ্চাশ হাজার মুসলমান মেরে নিকেশ ক'রে দিয়েছে।

কেহ শুধাইল—শিখ কি?

কেহ বলিল—এক রকম কামান।

কেহ বলিল—উড়ো জাহাজ।

সংবাদদাতা বলিল—পশ্চিমে হিন্দুর নাম শিখ, লম্বা চওড়া চেহারা, মস্ত চুল, ইয়া গোঁফ দাড়ি, হাতে লোহার বালা।

শ্রোতাদের একজন বলিল যে, সে একবার কলিকাতায় গিয়া মোটর গাড়ীতে একটা শিখ দেখিয়াছে—ওই রকমই চেহারা বটে।

তখন আর একজন বলিল—ভাই জন কয়েক শিখ এনে গাঁয়ে রাখা যাক না।

অপর একজন বলিল—একজনই যথেষ্ট! আকন্দপুরে আর ক'টা মুসলমান!

সংবাদদাতা বলিল—ভাই, শিখ আনা মুকুন্দপুরের কর্ম নয়। তারা প্রত্যেকে রোজ দেড় মণ গম, আধ মণ ছোলা, পনেরো সের আটা, আড়াই সের ঘি খায় —তাছাড়া নগদ পাঁচশ টাকা নেয়! পারবে? কল্‌কাতায় বড় লোকেরা আট দশ জন করিয়া শিখ পুষিতেছে। আমরা পারবো কেন?

সকলেই বুঝিল শিখ-পোষণ তাহাদের সাধ্যাতীত—তবু এ হেন শিখ যে ধরাধামে আছে ইহাতেই তাহারা কতকটা আশ্বস্ত বোধ করিল।

আকন্দপুরের আসরে সংবাদদাতা তখন মুসলমান শ্রোতাদের বলিতেছিল —ভাইসব, আল্লা বুঝি আমাদের কথা ভুলে গিয়েছেন, নইলে পাঁচটা শিখে পাঁচ হাজার মুসলমানকে কেটে টুকরো টুকরো ক'রে ফেলতে পারবে কেন?

একজন শ্রোতা বলিল—কেন মুসলমানদের কি শিখ নেই।

সংবাদদাতা বলিল—পাবে কোথায়?

পূর্বোক্ত শ্রোতা বলিল—কিনে আনলেই পারে।

সংবাদদাতা উচ্চাঙ্গের হাস্য করিয়া বলিল—শিখ অস্ত্র নয়।

একজন শুধাইল—তবে কি বোমা?

সংবাদদাতা বলিল—শিখ এক রকম হিন্দু। যেমন লম্বা চওড়া, তেমনি সাহসী, তেমনি বলবান!

সবাই শুধাইল—শিখ কেমন ক'রে চিনবো?

সংবাদদাতা বলিল—তাহাদের লম্বা চুল, প্রচুর গোঁফ দাড়ি, আর হাতে তাদের লোহার বালা। সেই বালার ঘায়েই তারা মাথা কাটিয়ে দেয়?

এই বলিয়া সে সকলকে সাবধান করিয়া দিল—ভাইসব, কোন লোকের হাতে লোহার বালা দেখ্‌লে কাছে ভিড়োনা, সে শিখ।

সকলে ভাবিল—মুকুন্দপুর ভাগ্যে এখনো শিখ আনে নাই।

একজন বলিয়া উঠিল—ভাই, ওরা যদি শিখ আনে!

সংবাদদাতা বলিল—আল্লার কাছে প্রার্থনা করো ওদের যেন তেমন মতি না হয়।

অপর একজন বলিল—তবু যদি আনে—তখন?

সংবাদদাতা বলিল—তাহলে প্রাণ ছেড়ে পালানো ছাড়া উপায় থাক্‌বে না!

তাহার উত্তর শুনিয়া সকলে মূঢ়ের মতো বসিয়া রহিল, তামাক খাইতেও উদ্যম হইল না।

মুকুন্দপুর ও আকন্দপুর আশায় ও আকাঙ্ক্ষায় মনে মনে জপিতে লাগিল—শিখ, শিখ, শিখ!

২

একদিন রাত্রে মুকুন্দপুরের হিন্দুগণ সচকিত হইয়া চীৎকার করিয়া উঠিল—মুসলমান, মুসলমান এসেছে, পালাও, পালাও!

অমনি হিন্দুরা বাড়ীঘর ফেলিয়া, স্ত্রী পুত্র কন্যা ও বিষয়-সম্পত্তি ফেলিয়া কচুবনে গিয়া লুকাইল। এই জন্যেই নিষ্ঠাবান হিন্দুর বাড়ীর পাশে একটি কচুবন সযত্নে লালন করিয়া থাকে। কচুবনে লুকাইয়া তাহারা বলাবলি করিতে লাগিল—স্না—অহিংসা প্রচার ক'রে আমাদের কী সর্বনাশই না করেছে, নইলে একবার দেখে নিতাম।

অনেকক্ষণ অপেক্ষা করিয়াও দেখিল কোন মুসলমান আসিল না—তৎপরিবর্তে তাহাদের স্ত্রী, পুত্র ও কন্যাগণ লণ্ঠন হস্তে বাহির হইয়া ডাকাডাকি করিতে লাগিল—কই গো তোমরা কোথায়? ছেলে মেয়েরা ডাকিতে লাগিল—বাবা, কাকা, দাদা—কই তোমরা?

কচুবন হইতে উত্তর হইল—মুসলমান খুঁজতে এসেছিলাম—না! বেটারা পালিয়েছে।

মুকুন্দপুর সে রাত্রে বলাবলি করিতে লাগিল—আহা যদি একটা শিখ পেতাম।

সে রাত্রে আকন্দপুরের মুসলমানগণও চঞ্চল হইয়া উঠিল—ওদের হিদুঁরা দেখিতে না পাইয়া বলিল—ভাগ্যিস ওদের গ্রামে কোন শিখ নেই। তাহলে আজ কারো রক্ষা ছিল না।

পরদিন মুকুন্দপুরে একজন শিখ আসিয়া উপস্থিত হইল। কেমন করিয়া আসিল, কি জন্য আসিল, কে তাহাকে প্রথম দেখিতে পাইল, কেহ জানে না,

আমরাও জানি না। তবে সে যে শিখ তাহাতে কাহারো সন্দেহ রহিল না। কলিকাতার পথে ঘাটে, মোটরে ট্যাক্সিতে যেমন শিখ দেখিতে পাওয়া যায়—অবিকল তেমনি। তাহার চুল লম্বা, দাড়ি গজাইয়াছে, আকৃতি দীর্ঘ, হাফ প্যাণ্ট পরিহিত, আর অনেকদিন বাংলা দেশে আছে বলিয়া বাংলা ভাষাটা শিখিয়াছে। মুকুন্দপুরের অধিবাসীরা আসিয়া তাহাকে ঘিরিয়া দাঁড়াইল—কেহ বলিল, শিখজী, কেহ বলিল, পাঁয়জী, কেহ বলিল, সর্দারজী! শিখজী প্রত্যুত্তরে কেবল হাসিল। সকলে সেই হাসির অমৃতটুকু বাটিয়া লইয়া পান করিল। একজন ডেলিপ্যাসেঞ্জার, শিখ সম্বন্ধে সে বিশেষজ্ঞ, কারণ একদিন বাস-এর ভাড়া না দিয়া নামিয়া পালাইতে চেষ্টা করিতে কন্‌ডাক্‌টার তাহাকে আচ্ছা করিয়া কয়েক ঘা মারিয়াছিল, সেই ডেলিপ্যাসেঞ্জারটি শিখের বাম হাতের দিকে সকলের দৃষ্টি আকর্ষণ করিল। সকলে দেখিল তাহার বাম হাতে একটি লোহার তাগা! শিখের অব্যর্থ লক্ষণ।

সকলে বলিল—সর্দারজী, তোমাকে আমাদের গ্রামে থাকতে হবে।

শিখ রাজি হইল।

তখন সকলে মিলিয়া তাহাকে এক ভদ্রলোকের বৈঠকখানায় লইয়া গিয়া প্রতিষ্ঠিত করিল এবং তাহার ভোগের জন্য যথাসাধ্য ছাতু, ডাল, রুটি, পেঁয়াজ ও মৎস্য মাংসাদির ভোগ জোটাইতে থাকিল! শিখ বৈঠকখানার দরজা ভেজাইয়া একখানা তক্তপোষের উপরে শুইয়া পড়িল। মুকুন্দপুরের সাহস বাড়িয়া গেল।

সংবাদটা ক্রমে আকন্দপুরে গিয়া পৌছিল—মুকুন্দপুর একটি শিখ আনিয়াছে। আকন্দপুরের মুখ শুকাইল।

একজন বলিল—একবার খোঁজ নিয়ে আসা দরকার।

কিন্তু যাইবে কে? এর চেয়ে যে সাপের গর্তে হাত দেওয়া সহজ।

তখন একজন সাহসী মুসলমান বলিল—আমি যাইব। সে জাহাজের খালাসী। জাহাজে চাপিয়া দেশ বিদেশে গিয়াছে, কত ঝড় ঝাপটা সহ্য করিয়াছে—তাহার সাহস না হইবার কথা নয়। সে গণৎকারের বেশ পরিধান করিয়া ফোঁটা তিলক কাটিয়া, ঝোলাঝুলি লইয়া মুকুন্দপুরের উদ্দেশ্যে প্রস্থান করিল। সকলে বলাবলি করিতে লাগিল—নৈমুদ্দি ফিরলে হয়।

নৈমুদ্দি মুকুন্দপুরের প্রবেশ করিবামাত্র হিন্দুরা তাহাকে ঘিরিয়া ধরিল—মুসলমান বলিয়া কেহ তাহাকে চিনিতে পারিল না—আর পারিলেই বা কি? গণৎকারের কোন জাতি নাই।

সকলে শুধাইল—বাবাজী, আমাদের গাঁয়ের কোন বিপদ আছে কিনা বলো তো!

গণৎকার গাঁয়ের একজনের হাত দেখিয়া বলিল—বিপদ ছিল বটে, তবে কেটে গিয়েছে, কারণ একজন বীর পুরুষ তোমাদের গাঁয়ে এসেছেন।

তাহার কথা শুনিয়া সকলে পরস্পরের মুখের দিকে তাকাইল, বলিল—ঠিক। তখন সকলে গণৎকারকে শিখের নিকটে লইয়া গেল, বলিল—বাবাজী একবার সর্দারজীর হাতখানা দেখ তো।

শিখ কৌতূহলে হাত বাড়াইয়া দিল। নৈমুদ্দি ভালো করিয়া তাহাকে নিরীক্ষণ করিল, তাহার চুল দাড়ি আকৃতি দেখিল, কিন্তু যখনি তাহার বাম হাতের তাগা দেখিল তাহার মুখ শুকাইল, গা কাঁপিতে লাগিল, কম্প উপস্থিত হইল, মূর্ছা হয় আর কি। গণৎকার বলিল—আমার জ্বর এসেছে, আমি চল্‌লাম। এই বলিয়া সে ঝুলি ঝোলা ফেলিয়া উর্দ্ধশ্বাসে পলায়ন করিল এবং সোজা আকন্দপুর পৌঁছিয়া বলিল—ভাইসব, আল্লার নাম করো, আর রক্ষা নেই। মুকুন্দপুরের শয়তানরা শিখ এনেছে। তার বাঁ হাতে লোহার তাগা।

এই কথা শুনিয়া আকন্দপুরের মুখ শুকাইল, অনেকে স্থান ত্যাগ করিয়া অন্য গ্রামে রওনা হইল, যাহারা থাকিল নিতান্ত বাধ্য হইয়াই থাকিল। তাহারা উচ্চস্বরে আল্লার নাম করিতে লাগিল।

এদিকে মুকুন্দপুরের সাহস ও আনন্দের অবধি রহিল না। আর কচুবনে লুকাইতে হইবে না। ভরসায় কোন কোন সাহসী পুরুষ কচুর শাক সমূলে উৎপাটন করিয়া কলিকাতায় গিয়া উচ্চমূল্যে বেচিয়া আসিল। কিন্তু যেমন তাহাদের সাহস বাড়িল, তেমনি খরচও বাড়িল। কারণ শিখের খাদ্য ভীমের খাদ্য। মুকুন্দপুর ধার করিয়া, চাঁদা তুলিয়া ছোলা, রুটি মৎস্য মাংস প্রভৃতি শিখের ভোগ জোগাইতে লাগিল। শিখ নিজে রাঁধিয়া খায়। কাজেই আহার্য দ্রব্যগুলি সকলে শিখের ঘরে রাখিয়া দিয়াই খালাস। শিখ সারাদিন একাকী ঘরে বসিয়া থাকে, বাহিরে আসে না, কেহ তাহার ঘরে সাহস করিয়া ঢোকে না। জানালার ফাঁক দিয়া মাঝে মাঝে দেখে শিখজী আছে কিনা। শিখজী অধিকাংশ সময় শুইয়া থাকে, কখনো কখনো পায়চারি করে—আর আপন মনে বিড় বিড় করিয়া বকে, কাহারো সঙ্গে কথা বলে না।

সেই ডেলিপ্যাসেঞ্জারটি সকলকে বুঝাইয়া বলে—এ কি তোমাদের বাঙালী যে গল্প গুজব ক'রে সময় কাটাবে! এ যে শিখ!

সকলে ভাবে, অনেক ভাগ্যে তাহারা একজন শিখ পাইয়াছে।

মুকুন্দপুরের একজন সাহসী লোক দূর হইতে আকন্দপুরের পরিস্থিতি লক্ষ্য করিয়া আসিয়া বলিল—ওরা সব পালিয়েছে, কেবল দু'চার জন মেয়ে ছেলে মাত্র আছে।

একজন সাহসী হিন্দু বলিল—চলো, এবারে ওদের গ্রাম লুঠ ক'রে আসি।

তাহার কথায় সকলের মুখ শুকাইল, শরীর কাঁপিতে লাগিল, কেহ কেহ মূর্ছিত হইয়া পড়িল, যাহাদের বাক্‌শক্তি তখনো ছিল তাহারা বলিল—মা—যে হিংসা করতে নিষেধ করেছে, নইলে একবার দেখিয়ে দিতাম হুঁ—হুঁ আমরা কি আজকার লোক......

ইতিমধ্যে কলিকাতার প্রত্যক্ষ সঙ্ঘর্ষের দাঙ্গা থামিয়া আসিল। একজন ডেলিপ্যাসেঞ্জার আসিয়া বলিল—আর ভয় নেই। কলিকাতায় শিখেরা সব মুসলমান মেরে ফেলে দিয়েছে—সেখানে সব শান্ত।

ইহা শুনিয়া সকলে শোভাযাত্রা করিয়া শিখের রুদ্ধ দ্বারের সম্মুখে উপস্থিত হইয়া শিখজীর জয়ধ্বনি করিয়া উঠিল। জনতার মধ্যে একজন শিক্ষক ছিল সে বন্দীবীর কবিতাটি আবৃত্তি করিল। তখন সকলে সাহসে ভয় করিয়া ঘরের দরজা ঠেলিয়া ভিতরে প্রবেশ করিল—শিখ অন্তর্ধান করিয়াছে।

সকলে শুধাইলে—শিখজী কোথায়?

তখন সবচেয়ে বিজ্ঞতম ব্যক্তি বলিল—প্রয়োজনকালে যিনি পাঠিয়ে দিয়েছিলেন, প্রয়োজন ফুরোতে তিনিই নিয়ে গিয়েছেন। এই বলিয়া সে সম্ভবামি যুগে যুগে আবৃত্তি করিল। সকলে যুক্তকরে জগদম্বার উদ্দেশ্যে প্রণাম করিল।

* * * * *

পরদিন মুকুন্দপুরে এক বৃদ্ধ ভদ্রলোক আসিয়া উপস্থিত হইলেন। তিনি বলিলেন—আমি বড় বিপদে পড়ে এসেছি। আমার ছেলেটি, একই ছেলে আমার, লায়েক ছেলে, এমন ছেলে হয় না—এই বলিয়া একবার চোখ মুদিলেন। তারপরে বলিতে লাগিলেন—হঠাৎ তার মাথা খারাপ হ'য়ে যায়, করলাম, ডাক্তারি, কবরেজি, টোট্‌কা, এমন কি কাঁচড়াপাড়ার তাগা কিছুই বাদ দিইনি। কিন্তু কিছুতেই কিছু হ'ল না। শেষে ঘরে বন্ধ করে রাখতে হ'ল। ক'দিন আগে সে ঘরের দরজা খুলে, পালিয়ে গিয়েছে। কত জায়গায় খোঁজ ক'রে বেড়াচ্ছি। একজন বল্লে—ক'দিন আগে এই গাঁয়ের দিকে এসেছিল। আপনারা কি দেখেছেন?

শ্রোতারা ভদ্রলোকের প্রতি সহানুভূতি প্রকাশ করিয়া বলিল—আহা, বড়ই দুঃখের কথা! কিন্তু এদিকে তো আসে নি।

অপর একজন শুধাইল—কি রকম চেহারা বলুন তো—

ভদ্রলোক বলিলেন—দীর্ঘ আকৃতি, চুল দাড়ি অনেক কাল না কাটবার ফলে লম্বা হ'য়েছে, কারো সঙ্গে বড় কথা বলে না, আপন মনে বিড় বিড় ক'রে একা থাক্‌তেই ভালোবাসে, আর বাঁ হাতে আছে একটা লোহার তাগা!

বর্ণনা শুনিয়া কেহ কেহ বিস্মিত হইল।

তখন ভদ্রলোকটি বলিলেন—বর্ণনায় কাজ কি—একখানা ছবিও সঙ্গে আছে।

এই বলিয়া তিনি পকেট হইতে একখানা ছবি বাহির করিলেন। ছবির দিকে তাকাইয়া শ্রোতার দল সমস্বরে বলিয়া উঠিল—শিখজী!

পিতা একটু ম্লান হাসিয়া বলিলেন—হাঁ, অনেকটা সেই রকমই দেখতে হ'য়েছিল, বাড়ন্ত বয়স কিনা!

গাধার আত্মকথা

পাঠক, তোমাকে আমার জীবন কাহিনী বলিব। কিন্তু সে কথা শুনিবার আগ্রহ তোমার হইবে কি? তুমি কত জনের জীবন কথা পড়িয়াছ—তাঁহারা সকলে মহাপুরুষ ব্যক্তি। তাঁহাদের কেহ বা নেপোলিয়ান, কেহ বা হেন্‌রি ফোর্ড, কেহ বা হিটলার মুসোলিনি বা ওই রকম কিছু। তাঁহাদের যুগান্তকারী, প্রাণান্তকারী কীর্তির ভারে ইতিহাসের লতাবিতান ভারাক্রান্ত। তাঁহাদের তুলনায় আমি তুচ্ছ, আমি নগণ্য। আমি এতই সামান্য যে ইতিহাস তো দূরের কথা কাহারো জমা খরচের খাতার প্রান্তেও আমার স্থান পাইবার আশা নাই। তবে কোন্ ভরসায় আত্মকথা বলিতে উদ্যত হইয়াছি? কোন্ ভরসায় জোনাকি আকাশে উড়িয়া বেড়ায়, কেন আকাশে কি গ্রহ নক্ষত্রের অভাব? তবে কোন্ ভরসায় প্র-না-বি-র মতো লেখক কলম ধারণ করে, কেন বঙ্গ সাহিত্যে কি বঙ্কিমচন্দ্র, রবীন্দ্রনাথ নাই? তবে কোন ভরসায় বেকারতম ব্যক্তি পূজা-সংখ্যা প্রকাশ করিতে উদ্যত হয়, কেন আনন্দবাজার পত্রিকা, বসুমতী প্রভৃতি কি ব্যবসা গুটাইয়াছে! আত্মপ্রকাশের প্রেরণায় আমি আত্মকথা বলিতে উদ্যত হইয়াছি, জগতের মহত্তম শিল্পীর সঙ্গে ওইখানে আমার ঐক্য, যদি-চ আমি নিরামিশাষী, নিরীহ, বহুভারপীড়িত সামান্য জীব! স্বভাব বিনয়ী হইলেও সত্যের খাতিরে বলিব আমি একেবারে নির্গুণ নই। অপরের dirty linen পরিষ্করণ যদি সদ্‌গুণ হয়, তবে আমি একেবারে গুণহীণ নই, কারণ ওই কাজে আমার সহযোগিতা আছে; অবশ্য তোমাদের অনেকের মতো কাজ আমি সর্বসাধারণের সমক্ষে করি না। আর আমার পদমর্যাদা তোমাদের অনেকের চেয়ে কম নয়। এহেন আমি—ও হরি আমার পরিচয় এবং নাম ধাম এখনো বলি নাই বুঝি! পাঠক আমাকে যাহা ভাবিতেছ, আমি তাহা নই। আমি একটি গাধা।

আমার নাম? গাধার আবার নাম কি? তাহাকে যে-নামেই ডাকো না কেন সে গাধাই থাকিয়া যায়। চিরকাল আমি গাধা নামে অভিহিত হইয়া আসিতেছি—বড় জোর কেহ আদর করিয়া ডাকে গাধু। আর ধাম? রজকালয়। হাঁ, মনে পড়িল, একটা নাম আমার আছে বটে, তবে সেটা ব্যক্তিগত নয়, দলগত। আমরা সবাই রামু ধোপার গাধা। রামু ধোপার গাধার সংখ্যা পঞ্চাশের উপর। রামু নৈকষ্য কুলীন এবং ধনী। পঁয়ত্রিশ বার তাহার বাড়ী পুড়িয়াছে।

পাঠক, তোমার কৌতূহল হইতে পারে যে এতগুলি গাধার মধ্যে রামু আমাকে চিনিত কি প্রকারে? এমন কৌতূহল হইলে বুঝিতে হইবে যে গর্দভতত্ত্ব সম্বন্ধে তোমার জ্ঞান আশানুরূপ বিস্তৃত নয়। আমাকে চিনিবার রামুর কি প্রয়োজন? সব গাধাই এক মাপের, এক জাতের, এমন কাজ নাই যাহা সকলকে দিয়া সমান ভাবে না হয়। চিনিবার প্রয়োজন কি? এতো আর তোমাদের কলেজের কাজ নয়, যে Specialisation অপরিহার্য! যে অঙ্ক পড়ায়, সে ইংরাজী পড়াইতে পারিবে না! বরঞ্চ স্কুলের কাজের সঙ্গে আমাদের মিল অনেকটা বেশি! স্কুলের যে মাষ্টার অঙ্ক পড়ায়, পরের ঘণ্টায় সে-ই সংস্কৃত পড়াইতেছে, তার পরের ঘণ্টায় বটবৃক্ষতলে মডেল-নেপোলিয়ানের মতো দাঁড়াইয়া বালকগণকে সে ড্রিল শিখাইতেছে, আর স্কুল ছুটি হইলে হিসাবের খাতায় ঘর-পূরণ করিয়া তবে তাহার ছুটি! কিন্তু ইহাতেই স্কুল মাষ্টারের বহুমুখিতা সীমাবদ্ধ মনে করিলে ভুল হইবে। সাড়ে দশটায় স্কুল খুলিবার আগে ঘাড়ের উপরে ঝাড়ন ফেলিয়া সে ঘরগুলি ঝাঁট দিয়াছে এবং টেবিল চেয়ার ঝাড় পোঁচ করিয়াছে! ছাত্ররা এসব দৃশ্য দেখে, তাহারা বুঝিতে পারে না মাষ্টার মহাশয়ের সঙ্গে কি রকম ব্যবহার করিবে কারণ, তিনি মাষ্টার না কেরাণী, না ভৃত্য! শেষ পর্যন্ত তাঁহাকে ছাত্ররা নিম্নতম পদবীটাই দান করে। এত শক্তি ব্যয় করিয়াও শিক্ষকদের শক্তি অবশিষ্ট থাকিয়া যায়। উপনিষদের ব্রহ্মা যেমন জগৎ আচ্ছন্ন করিয়াও দশ আঙ্গুল পরিমাণে তদতিরিক্ত, শিক্ষকেরও সেই রকম। এই সমস্ত বিচিত্র কাজ করিবার পরেও প্রাইভেট টিউটার অর্থাৎ বাজার সরকার, দর্জি ও ফেরি-ওলা প্রভৃতি মূর্তি তাহার আছে। কিন্তু কি বলিতে কি বলিতেছি—আমার ওই এক মুদ্রা দোষ, নিজের কথা বলিতে গেলেই শিক্ষকের কথা মনে পড়িয়া যায়। অনেকে সন্দেহ করে কোথায় যেন একটা প্রচ্ছন্ন যোগ আছে। কিন্তু সে সন্দেহ সম্পূর্ণ অমূলক, আমি শিক্ষক নই, আমি গাধা।

রামু ধোপার বাড়ীর নিকটে ঘাসে ঢাকা এক প্রশস্ত মাঠ আছে। কাজের অবসরে সেখানে আমরা চরিয়া বেড়াইতাম। এবং ছুটাছুটি করিয়া ক্লান্ত হইয়া পড়িলে কচি ঘাস ছিঁড়িয়া খাইতাম। আমরা ঘাস খাই শুনিয়া মানুষে বিস্মিত হয়—কিন্তু এসংসারে ঘাস না খায় কে? গাধাতে খাদ্য বলিয়া ঘাস খায়, মানুষে শাক বলিয়া ঘাস খায়, সাহেব লোকে ভাইটামিন বলিয়া ঘাস খায়, আর

শিক্ষকেরা ডুবিয়া ঘাস খায়, নতুবা তাহাদের ছাত্রগণের এমন আশ্চর্য বিদ্যা হয় কিসের প্রভাবে?

রামুর পঞ্চাশটি গাধার সকলেই একদল-ভুক্ত ছিল মনে করিও না। আমাদের মধ্যে অন্ততঃ দশটি দল ছিল। আমরা চার গাধায় একটি দল। শুনিয়াছি মানুষের দল পাকাইতে চার জনেরও প্রয়োজন হয় না, একজনেই যথেষ্ট, সে একসঙ্গে সেক্রেটারি ও প্রেসিডেণ্ট হইয়া কাজ চালাইতে থাকে। এবিষয়ে মানুষ কিছু আগাইয়া আছে তবে শীঘ্রই আমরা ধরিয়া ফেলিব।

একদিন শরৎকালের প্রাতঃকালে আমরা মাঠে চরিয়া বেড়াইতেছিলাম আর কথোপকথনের অবকাশে কচি কচি ঘাস ছিঁড়িয়া ছিঁড়িয়া খাইতেছিলাম। সেই কচি ঘাসের স্বাদ আর শরতের রোদ, দুইয়ে মিলিয়া আমাদের মনে এক অভূতপূর্ব আনন্দের সৃষ্টি করিল। আমি বলিলাম, এমন সকাল বেলা, এসো সকলে মিলিয়া খেলি।

অপর তিনজনে রাজি হইয়া শুধাইল, কি খেলা।

আমি প্রস্তাব করিলাম, চলো, এক কাজ করা যাক্। আমরা চারজনে চোখ বাঁধিয়া চার দিকে চলিতে আরম্ভ করি। দেখা যাক, কে কতদূর যাইতে পারি এবং কে কোথায় গিয়া পড়ি।

যেমনি বলা, অমনি কাজ, কচি ঘাসের কি প্রেরণা! চারজনে রুমাল দিয়া চোখ বাঁধিয়া চলিতে সুরু করিলাম। ঘণ্টাখানেক চলিবার পরে আমার মনে হইল যেন একটি ঘরে প্রবেশ করিতেছি, এমন সময় একটা বস্তুতে হুঁচোট খাইয়া পড়িবার উপক্রম হইল। তাড়াতাড়ি চোখ খুলিয়া দেখিলাম যে, আমি সুবৃহৎ অট্টালিকার একটি কক্ষে ঢুকিয়া পড়িয়াছি। ঘরটায় অনেকগুলি বেঞ্চি ও একখানি মাত্র চেয়ার আছে। বুঝিলাম চেয়ারটায় আমি হুঁচোট খাইয়াছিলাম। পথশ্রমে আমি ক্লান্ত হইয়া পড়িয়াছিলাম, চেয়ারখানায় বসিলাম। কতকক্ষণ বসিয়াছিলাম মনে নাই, কারণ মাঝখানে একটু তন্দ্রার মতো অসিয়াছিল। হঠাৎ শুনিলাম একজন ভদ্রলোক (গাধা নয় মানুষ) অপর একজনকে বলিতেছে—ও চেয়ারখানায় কে ব'সে? তখন সেই ভদ্রলোক (সে-ও মানুষ, গাধা নয়) একটু উঁকি ঝুঁকি মারিয়া আমাকে দেখিয়া বলিল—চিনতে পারলাম না। বোধহয় যাঁর আসবার কথা ছিল তিনিই।

পূর্বোক্ত ভদ্রলোক বলিল—কে নূতন শিক্ষক?

অপর ভদ্রলোক উত্তর করিল—তাই বলেই তো মনে হচ্ছে।

তাহাদের কথাবার্তায় আমার তন্দ্রা ছুটিয়া যাওয়ায় বুঝিতে পারিলাম যাহা শুনিলাম বাস্তব, স্বপ্ন নয়। আমি কিংকর্তব্য বুঝিতে না পারিয়া বসিয়াই রহিলাম। কিছুক্ষণে ঘণ্টাধ্বনি অনুসরণ করিয়া ছাত্রদল আসিয়া ঘরটা ভরিয়া ফেলিল। তাহারা সবিনয়ে আমাকে নমস্কার করিয়া বলিল—স্যর, পড়াতে আরম্ভ করুন।

এই বলিয়া আমার হাতে একখানা বই তুলিয়া দিল। নামটা দেখিলাম 'সরল নীতিশিক্ষা,' বুঝিলাম নীতি শিক্ষার পথ চিরকালই সরল।

এইবার বিষম সমস্যায় পড়িলাম। আমি গাধা। লেখাপড়া শিখি নাই, এমন কি মানুষের ভাষা অবধি আমার অজ্ঞাত, আমি পড়াইব কিভাবে? কিন্তু আত্ম পরিচয় দিতে সাহস হইল না, যদি মার-ধোর করে, আবার একটু লজ্জাও যে না হইল এমন নয়। এহেন অবস্থায় আগাইব কি পিছাইব স্থির করিতে না পারিয়া সাহসে ভর করিয়া অগ্রসর হওয়াই সিদ্ধান্ত করিলাম। বইখানা চোখের সম্মুখে খুলিয়া ধরিয়া তারস্বরে গর্জন করিয়া গেলাম। থামিবা মাত্র দরজার অন্তরাল হইতে হেড মাষ্টার মহাশয় আত্মপ্রকাশ করিয়া সোল্লাসে আমার করমর্দন করিয়া বলিলেন—আপনাকে অভিনন্দিত করচি—এমন গভীর জ্ঞান ও অধ্যাপনা শক্তি ইতিপূর্বে আমার চোখে পড়েনি! তারপরে কণ্ঠস্বর নিম্নতর ধাপে নামাইয়া বলিলেন—আপনার মতো লোক শিক্ষকবৃত্তি গ্রহণ করলে লোকে শিক্ষকদের আর গাধা বলতে সাহস করবে না।

অতঃপর তিনি ছাত্রদের সম্বোধন করিয়া বলিলেন—ছাত্রগণ, নূতন শিক্ষক মহাশয়ের প্রদর্শিত পন্থা অনুসরণ করলে তোমরা মানুষ হ'তে পারবে।

আমার সন্দেহ দূর হইল। তবে ইহারা মানুষ নয়!

আমি ইস্কুল মাষ্টারি করিয়া চলিলাম। ক্রমে পণ্ডিত বলিয়া আমার খ্যাতি রটিল। অবশেষে সেই খ্যাতি বিশ্ববিদ্যালয়ের ব্যূহ ভেদ করিয়া কর্তৃপক্ষের কানে গিয়া প্রবেশ করিল। তাঁহারা বিশ্ববিদ্যালয়ে কয়েকটি ধারাবাহিক বক্তৃতা দানের জন্য আমাকে আহ্বান করিলেন। 'মানব ও পশুর মধ্যে প্রচ্ছন্ন ঐক্য' বিষয়ে আমি বক্তৃতা দিলাম। দেশের পণ্ডিত সমাজ মুগ্ধ হইয়া গেল, তাহারা বলাবলি করিতে লাগিল যে মানব-জীবন ও পশু-জীবন উভয় সম্বন্ধে প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা না থাকিলে এমন বক্তৃতা করা যায় না। তবু তাহারা আমাকে গাধা বলিয়া চিনিতে পারিল না। বরঞ্চ বিশ্ববিদ্যালয় সম্মানজনক ডি-লিট উপাধি

যারা আমাকে সম্বর্ধিত করিলেন, আগেই বক্তৃতার পারিতোষিক বলিয়া মোটর খরচের বাবদ নগদ একহাজার টাকা দান করিয়াছিলেন।

একদিন ইস্কুলে বসিয়া ছাত্রদিগকে পাঠ দিতেছি, এমন সময়ে ভয়ে আমার বুক কাঁপিয়া উঠিল। স্বয়ং রামু ধোপা ইস্কুল ঘরে প্রবেশ করিয়াছে। শিক্ষকগণ রামুকে চিনিত কারণ তাহারা সকলেই রামুর নিকটে বাকিতে কাপড় কাচাইয়া থাকে। হেড মাষ্টার শুধাইলেন—কি রামু খবর কি?

রামু বলিল—কর্তা, আমার গাধা এদিকে এসেছিল।

সেকেণ্ড মাষ্টার হাসিয়া বলিল—ছাত্রদের মধ্যে খোঁজ করো।

একজন ছাত্র অনুচ্চস্বরে বলিল—মাষ্টারদের মধ্যে খোঁজ করলেই পাওয়ার সম্ভাবনা বেশি।

রামু আমাকে দেখিয়াও চিনিতে পারিল না। সে হতাশ হইয়া চলিয়া গেল। আমার আশঙ্কা দূরীভূত হইল। এখন আমি নির্বিবাদে মাষ্টারি করিতেছি—প্রায় পঁয়ত্রিশ বৎসর শিক্ষকতা করিবার পরে 'ভেটারেন' শিক্ষক বলিয়া আমার খ্যাতি রটিয়াছে, কত নোট বই লিখিয়াছি, দু'খানা বাড়ী করিয়াছি, আগামী বৎসর নিখিল গৌড় শিক্ষক সম্মেলনের সভাপতি হইব বলিয়া ইতিমধ্যেই কানাঘুষা শোনা যাইতেছে। লোকে আমাকে সুখী মনে করে, আমি নিজেও অসুখী মনে করি না, তবু এক একবার মনে হয় যে এই নিত্য আবর্তিত নীরস শিক্ষক জীবনের চেয়ে রজকালয়ের গর্দভ জীবন ভাল ছিল। আহা সে কচি ঘাসের স্মৃতি কি ভুলিতে পারি? এখন আর কচি ঘাস খাইবার উপায় নাই—তৎপরিবর্তে কচি ছেলেদের মাথা খাইয়া থাকি। খাদ্য হিসাবে পূর্বোক্ত বস্তুটাই অধিকতর উপাদেয়!

যে তিন সাথীর সহিত অন্ধ-যাত্রায় বহির্গত হইয়াছিলাম পরে তাহাদের সন্ধান পাইয়াছি। তাহাদের গাধা বলিয়া লোকে চিনিতে পারে নাই—মানব সমাজে এখন তাহারা বিশিষ্ট নাগরিক। একজন সংবাদপত্রের সম্পাদক, আর একজন রাজনীতিক নেতা, তৃতীয় জন যুগান্তকারী সাহিত্যিক। আমরা চারজনে এখন দেশের চার দিক্‌পাল। মাঝে মাঝে চারজনে গড়ের মাঠে গিয়া মিলিত হই। কাছাকাছি লোক না থাকিলে কচি ঘাস ছিঁড়িয়া খাই, কোরাসে গান করি এবং 'সংসারে সর্বত্র গাধার জয়'—উচ্চৈস্বরে এই ধ্বনি তুলিয়া আনন্দে নৃত্য করিতে থাকি। পাঠক, সংক্ষেপে ইহাই আমার জীবন-কথা। তুমি আমাকে চিনিতে পারিয়াছ কিনা জানি না, কিন্তু তোমাকে চিনিতে আমার বাকি নাই।

রত্নাকর

আমাদের বাড়ীতে হরি নামে একটি বুড়া চাকর ছিল। সে অনেকদিন হইতে কাজ করিতেছে, আমাকেও মানুষ করিয়াছে। এমন নিরীহ ভালো মানুষ কদাচিৎ দেখা যায়। লম্বা দোহারা চেহারা, গায়ের রঙ কালো, গলায় তুলসীর মালা, মাথার চুল শাদা। বুড়া বয়সেও তাহার গায়ে অসুরের মতো শক্তি। ঐ শক্তির সাক্ষ্যে পাড়ার লোকে বলাবলি করিত যৌবনে সে ডাকাতি করিত। লোকের অনুমানের স্বপক্ষে আরও একটা প্রমাণ ছিল, সে খুব ভালো লাঠি খেলিতে পারিত। ঐটুকু ছাড়িয়া দিলে তাহাকে ডাকাত মনে করা দূরে থাকুক, ইস্কুল মাষ্টারের চেয়ে বেশি নিরীহ মনে হইত। সারা দিনের কাজকর্ম শেষ হইলে সন্ধ্যাবেলা বসিয়া সে নামগান করিত, তার গলা ভারি মিষ্টি ছিল। আমি ছেলেবেলা হইতে তার গান শুনিতেছি। এখন বয়স হইয়াছে তবু মাঝে মাঝে তার আসরে গিয়া বসি, তার করতাল-বাজানো গান শুনি। তখন মনে হয়—এমন লোকের নামে এমন অপবাদ কি করিয়া রটে? ভাবি লোকের মুখের বাঁধন নাই, তাহারা এমনি দায়িত্বহীন।

আমাদের বাল্যকাল হইতে সে মানুষ করিয়াছিল, কাজেই আমি তাহাকে যে-সব কথা জিজ্ঞাসা করিতে পারি, সবাই পারে না। আমি কখনো কখনো তাহাকে যৌবনের ইতিহাস শুধাইয়াছি কোন উত্তর পাই নাই, সে হাসিয়া আমার কৌতূহল নিরস্ত করিয়াছে।

একবার আমার অসুখ হইয়া পড়িল, বাড়ী তখন খালি, কাজেই হরির উপরে আমার পরিচর্যার ভার পড়িল। তাহার পরিচর্যায় শীঘ্রই সুস্থ হইয়া উঠিলাম। একদিন সন্ধ্যার পরে রোগশয্যায় শুইয়া তাহাকে বলিলাম, হরি একটা গল্প বলো।

হরি নামগান সুরু করিল। সে জানিত নামগান আমার প্রিয়। গান শেষ হইলে বলিলাম—এবারে গল্প বলো।

সে শুধাইল—কি গল্প শুনবে দাদাবাবু?

আমি বলিলাম—তোমার জীবনের গল্পই করোনা কেন?

তার পরে একটু থামিয়া বলিলাম—লোকে যে বলে—

আমাকে আর শেষ করিতে হইল না, সে বলিল—লোকে বলে ডাকাতি করতাম। তাই না?

তারপরে বলিল—মিথ্যা বলে না।

হরি বলিতে লাগিল—ছোটবেলায় কুসঙ্গে পড়ে চুরি ডাকাতির অভ্যাস হয়েছিল, অনেক কুকাজ করেছি বটে।

আমি শুধাইলাম—সে অভ্যাস ছাড়লে কি ক'রে?

সে বলিল—একবার জবর ঠকে গেলাম দাদাবাবু।

সে বলিল—আমি নিজের জন্য কখনো চুরি ডাকাতি করি নি। যা পেতাম নিয়ে এসে আশে-পাশে গাঁয়ের গরীব দুঃখীদের মধ্যে বিলিয়ে দিতাম। যদি জানতাম যে আজ অমুক লোকটাকে কিছু সাহায্য করা দরকার, কিছু টাকা না পেলে তারা না খেয়ে মরবে, তবে সেদিন রাত্রে বের হ'তাম্ ভোররাতে তবে তাদের সাহায্য দিয়ে ফিরে আসতাম!

আমি শুধাইলাম—সে অভ্যাস গেল কি ক'রে?

সে বলিল—ঐ তো বললাম, একবার এমন জবর ঠকা ঠ'কে গেলাম যে চিরদিনের মতো ব্যবসা ছেড়ে দিতে হ'ল।

আমি বললাম—বেশ, সেই ঘটনাটাই আজ খুলে বলো।

তখন হরি আরম্ভ করিল।

আমাদের গাঁয়ে একঘর বাগদি ছিল। তারা হত-দরিদ্র। না ছিল তাদের জমিজমা, না ছিল টাকাকড়ি। নগেন বাগদি ধামা কুলো বুনে কোন রকমে সংসার চালাতো। অনেক সময়ে তাদের সাহায্য করতে হ'ত। একদিন সন্ধ্যারাতে নগেনের পরিবার এসে প্রণাম ক'রে বল্‌ল—জেঠা, বাড়ীর লোকটা আজ তিনদিন প'ড়ে, ঘরে একটা কড়ি নেই যে ওষুধ কিনি, একমুঠো চাল নেই যে ছেলেমেয়েদের সিদ্ধ ক'রে দিই। আজ দুদিন উপোসী তুমি না দেখলে সবাই মারা পড়ে।

আমি তাকে বল্‌লাম—বাছা তুমি এখন বাড়ী যাও, আমি শেষ রাতে তোমাদের বাড়ী যাবো এখন।

সে খুশী হ'য়ে ফিরে গেল। সে জানতো আমার কথার অন্যথা হয় না, অনেকবার তাদের শেষ রাতে সাহায্য করেছি।

তখন আমি লাঠিগাছা নিয়ে বের হ'য়ে পড়লাম। সাধারণত আমি ডাকাতিই করতাম, বিশেষ যখন বেশি টাকার দরকার হ'ত। কিন্তু সেদিনই তো দলের লোককে সংবাদ দেবার সময় ছিল না, তাছাড়া বেশি টাকার

দরকারও তো নয়—তাই একাই চললাম, ভাবলাম কাছেভিতে কোথাও গিয়ে কাজ সারতে হবে।

আমাদের গাঁ শেষ হ'তেই বড় বড় দু'খানা মাঠ, তার পরে বড় আর একখানা গ্রাম। আমি মাঠ পেরিয়ে চলেছি—চারিদিকে ঘুরঘুটি অন্ধকার। এমন সময়ে মাঠের মধ্যে একটা আলো চোখে পড়লো। আলো লক্ষ্য ক'রে কাছে গিয়ে দেখলাম দু'খানা মাঠ-কোটাওয়ালা একটা বাড়ী। আগে সে বাড়ীখানা লক্ষ্য করিনি।

তারপরে সে হেসে বল্ল—দাদাবাবু চোর ডাকাতের নজরে ছোট বাড়ী পড়ে না।

সে বল্ল—ভাবলাম, আজ এখানেই কাজ সারা যাক, দরকার তো বেশি নয়, তাছাড়া দূরে যাবার সময়ও ছিল না, ভোরবেলা ওবুধ আর চাল কিনতে না পারলে নগেন বাগদী সপরিবারে মারা পড়বে। তাই সেই বাড়ীতে ঢোকাই স্থির করলাম।

এবারে সে থামলো, তারপরে বলল—ওখানে এমন শিক্ষা পেলাম যাতে চিরকালের মতো এই বদ অভ্যাস ছেড়ে দিতে হ'ল।

আমি বললাম—তোমাকে মারলো নাকি?

হরি বল্ল—দাদাবাবু, মারে কি চোর ডাকাতের শিক্ষা হয়, আর সে শিক্ষা তো কম পাইনি! আমার শিক্ষা এলো অন্য আকারে।

সে আবার সুরু করলো।

বাড়ীটার কাছে গিয়ে দাঁড়ালাম। দেখলাম যে ছোট একটা ঘুলঘুলি দিয়ে আলো আসছে। ভাবলাম ভিতরে এখনো লোক জেগে আছে, তারপরে ভাবলাম দেখাই যাক না কি হয়—আমার হাতে তো লাঠি আছে। দরজায় একটু ধাক্কা দিতেই দরজা আপনি খুলে গেল—তখনি মনে হ'ল—এরা তো বেশ লোক, দরজা খুলেই ঘুমোয়।

ভিতরে আলো থাকায় আমি দেখতে পাচ্ছিলাম না, অথচ ভিতরের লোক আমাকে দেখলো ব'লেই মনে হল!

একটি স্ত্রীকণ্ঠ ব'লে উঠল? ভগবান রক্ষে করুন—ঐ বুঝি বদ্যি এলো!

এই কথা শুনে একটি পুরুষকণ্ঠ ব'লে উঠল—তোমাকে কতবার নিষেধ করেছি যে বদ্যি ডাকতে পাঠিও না, বদ্যি এনে তাকে ভিজিট দেবো কোথা থেকে?!

শ্রীকণ্ঠ উত্তর করলো—সে কথা পরে হবে, তোমার অসুখ হ'লে কি আমি বদ্যি না ডেকে পারি।

বুঝলাম পুরুষটি অসুস্থ—স্ত্রীলোকটি খুব সম্ভব তার পত্নী।

পুরুষ বল্‌ল—তুমি অবশ্য আমার মঙ্গলই চাও কিন্তু ফল হয় উল্টো, বদ্যি আনতে পাঠিয়েছ শুনে অবধি ব্যাধির কষ্টের সঙ্গে অর্থচিন্তা মাথায় চেপেছে! দেখো দেখো কে এলো!

ততক্ষণে আলোতে আমার চোখ অভ্যস্ত হওয়াতে দেখতে পেলাম যে ঘরের মধ্যে একখানা ছেঁড়া মাদুরের উপর একটি জীর্ণ পুরুষদেহ শায়িত, পাশে দরিদ্রের লক্ষ্মীর মতো একটি সধবা স্ত্রীলোক। ঘরে দু' একটি তৈজস ছাড়া আর কিছুই নাই—আর আছে একদিকে কতকগুলো বই, কতক কাগজে ছাপা, কতক তালপাতায় লেখা।

স্ত্রীলোকটি উঠে এসে জিজ্ঞাসা করলো—বাবা তুমি কে?

আমি বললাম—মা, আমি পথিক।

আমি বদ্যি নই জেনে স্ত্রীলোকটির মুখ ম্লান হ'ল—কিন্তু পুরুষটির মুখে স্বস্তির আভা দেখা দিল। সে বলল—আহা পথিক। বসতে দাও গো, বসতে দাও।

তারপরে বলল—আঃ বাঁচলাম! তার স্বস্তির কারণ আমি বেশ অনুমান করতে পারলাম।

হরি বলতে লাগলো—সারাজীবন গরীবের মধ্যেই আমার বাস। দারিদ্রের ভয়াবহতা আমার অজানা নয়—কিন্তু সেদিন দারিদ্র্যের যে করুণ মূর্তি দেখলাম তা আমার জানা ছিল না। নগেন বাগদির দারিদ্রও এই দৃশ্যের কাছে ম্লান হ'য়ে গেল। আমি স্ত্রীলোকটিকে শুধালাম—তোমরা এখানে মাঠের মাঝে বাস করো কেন?

সে বলল—বাবা আমরা যে গরীব।

তার কথা শুনে পুরুষটি ব'লে উঠল—ওর কথায় বিশ্বাস ক'রো না!

তারপরে স্ত্রীর উদ্দেশ্যে বলল—গরীব, গরীব! গরীব আবার কি?

এবার আমাকে উদ্দেশ্য ক'রে বলল—না বাপু আমি ইস্কুলের হেড পণ্ডিত! পণ্ডিত আবার গরীব হয় নাকি। তাছাড়া পণ্ডিতের বেশি টাকাকড়ি থাকা ভালো নয়।

আমি বললাম—তোমরা এখানে একাকী থাকো, চোর ডাকাতের ভয় তো আছে!

স্ত্রীলোকটি বললো—চোর ডাকাতে আমাদের কি নেবে?

পুরুষটি ব'লে উঠল—মাগীর কথা শোনো! কি নেবে? নাঃ নেওয়ার কিছু আছে কি? আমার ঘরে যত সংস্কৃত পুঁথি রয়েছে—এত আর কোথায় আছে শুনি? আরে ছাপা বই তো সবাই কিনতে পারে—এ যে হাতে লেখা তালপাতার পুঁথি! পয়সা হ'লেই এ সব পাওয়া যায় না। আর মাগী বলে কি না চোরে ডাকাতে কি নেবে?

এই পর্যন্ত ব'লে সে হাঁপাতে লাগলো!

আমি স্ত্রীলোকটিকে বললুম—ওঁর বুঝি অসুখ।

সে বলল—আজ একমাস থেকে শয্যাগত।

তারপরে কণ্ঠ নীচু ক'রে পুরুষটির অশ্রুত স্বরে বলল—এক ফোঁটা ওষুধ দিতে পারিনি, আর কামাই হ'য়েছে ব'লে স্কুলের মাইনেও বন্ধ!

পুরুষটি শুধালো—হ্যাঁ মশাই, বলছে কি? বলছে যে ওষুধ দিতে পারিনি, এই তো?

আমি কি আর উত্তর দেবো?

সে বলতে লাগলো—ওষুধ খেলেই যদি মানুষ বাঁচে তবে আর রাজার ছেলে মরতো না। আমার কি কোন শাস্ত্র পড়তে বাকি আছে? সব ঘেঁটে দেখেছি—যার যেমন নিয়তি তাই হবে, ওষুধ, বদ্যি বাজে খরচ।

সেই স্তিমিত আলোতেও স্ত্রীলোকের চোখের জল না দেখে উপায় ছিল না।

আমি স্ত্রীলোকটিকে বললাম—মা, তুমি চিন্তা ক'রো না। ডাক্তার বদ্যির চিন্তা আমি করছি—তোমরা একটু অপেক্ষা করো।

এই ব'লে আমি গ্রামের দিকে দ্রুত রওনা হ'লাম।

অন্ধকারে চলতে চলতে সব কথা মনে ক'রে খুব হাসি পেলো। এক আধবার বোধ হয় উচ্চস্বরে হেসেও থাকবো—সে অবস্থায় কেউ আমাকে দেখলে নিশ্চয় পাগল মনে করতো। ভাবলাম এ এক রঙ্গ—। এসেছিলাম চুরি করতে এখন চলেছি ডাক্তার ডাকতে। এক হৃত-দরিদ্রের চিকিৎসা-ব্যয় জোগাড় করবার উদ্দেশ্যে বেরিয়ে আর এক হৃত দরিদ্রের চিকিৎসার ব্যবস্থায় পড়ে গিয়েছি! তখন মনে হল—দয়াময় ইচ্ছা করেই এই অবস্থান্তরে ফেললেন আমার চোখ খুলে

দেবার জন্যে। তিনি যেন বললেন, ওরে দেখ—তুই ভাবিস তুই খুব পরোপকারী—এর ধন চুরি করে এনে ওকে বাঁচাস। কিন্তু কার কি অবস্থা তা কি সব জানিস! যাকে তুই দরিদ্র মনে করিস—তার চেয়েও দরিদ্রের ধন যে তুই চুরি করছিস্ না—তা কি নিশ্চয় ক'রে বলতে পারিস।

হরি বলতে লাগল—বুঝলে দাদাবাবু, একদিন আগে হলেও উত্তরে বলতাম, জানি, খুব জানি, কে দরিদ্র আর কে ধনী! কিন্তু ঐ ঘটনার পর থেকে নিশ্চয়তার সে সাহস লোপ পেলো। তাই তো আমি কি জানি! আমি কতটুকু জানি! তখন মনে হল এত কম জানার উপরে এত উপকার করবার দম্ভ সাজে না! তাছাড়া চুরি করে উপকার! এ যে সোনার পাথরের বাটি। কার ধন কাকে দান করছি! নিজের হলেও বা হত। নগেন বাগদি খেতে পায় না কিন্তু সে দায় কি আমার? আর যার ধন নিয়ে নগেনকে দিচ্ছি তার গ্রাস যে হরণ করছি না—তা কে বলল! ঐ তো দয়াময় দেখিয়ে দিলেন আমার দয়ার কি মূল্য! এই রকম কত কথা ভাবতে ভাবতে গাঁয়ে ফিরে এলাম, তখন ভোর হয়েছে। রতন ডাক্তারকে নিয়ে শিবু পণ্ডিতের কুঁড়েতে ফিরে গেলাম, যাবার সময়ে গোটা কতক টাকা পাঠিয়ে দিলাম নগেন বাগদির বাড়িতে।

এই পর্যন্ত বলে থামলো।

আমি শুধোলাম—তারপর?

হরি বলল—তার পরে অবশ্য অনেক কথা আছে, শিবু পণ্ডিতকে অনেক বুঝিয়ে সুঝিয়ে ডাক্তারের সেবা নিতে স্বীকার করলাম এবং ক্রমে শিবু পণ্ডিত সুস্থ হয়ে উঠে ইস্কুলে যেতে সুরু হ'ল। শিবু পণ্ডিতের ঘটনার ঐখানেই শেষ হ'লেও আমার ঘটনার কেবল সুরু হ'ল। আমি দল ছেড়ে দিলাম, কিন্তু দল যে আমাকে ছাড়তে চায় না—তাই চ'লে গেলাম নবদ্বীপে। দেশে আর ফিরিনি। অনেকদিন, এখানে ওখানে ঘুরে বেড়ালাম, তারপরে এলাম তোমাদের বাড়িতে—সে আজ অনেক দিনের কথা—তুমি তখন এতটুকু ছিলে।

হরি থামলো।

আমি চোখ বুজে ছিলাম, ঘুমিয়েছি মনে ক'রে সে পা টিপে ঘর থেকে বেরিয়ে গেল। অনেক রাত পর্যন্ত আমার সেদিন ঘুম এলো না, হরির বিচিত্র কাহিনী কেবলি মনের মধ্যে পাকিয়ে পাকিয়ে উঠতে লাগলো। ভাবলাম রত্নাকরের পুরাতন কাহিনীর এ এক নূতন সংস্করণ। সেদিনের দুঃখের অভিজ্ঞ-

তায় রত্নাকর হ'য়েছিল বাল্মীকি আর আজ এইমাত্র যে কাহিনী শুনলাম তাতেও দেখছি দুঃখের অভিজ্ঞতায় হরি ডাকাত হ'ল হরি সাধু। দুঃখ সংসারে অবিরল —কিন্তু যে দুঃখে ব্যঙ্গের মিশেল হয়—তার মতো মর্মান্তিক আর কি হ'তে পারে? বিদ্রূপের ম্লান হাসিতে দুঃখের কালো মূর্তি অপ্রত্যাশিতভাবে বেরু প্রকট হ'য়ে ওঠে।

অধ্যাপক রমাপতি বাঘ

সুন্দরবনে বিকট-জঙ্ঘা নামে এক বাঘ বাস করিত। তাহার দৌরাত্ম্যে বনের পশুরা অস্থির হইয়া ছিল। আর যে সব কাঠুরিয়া বনে কাঠ সংগ্রহ করিতে যাইত তাহাদেরও অনেকে বিকট-জঙ্ঘার গ্রাসে প্রাণ হারাইত। অনেক শিকারী তাহাকে বধ করিতে গিয়া তাহার শিকারে পরিণত হইয়াছে, কিছুতেই কেহ তাহাকে আঁটিয়া উঠিতে পারিত না—এমনই ছিল বিকট-জঙ্ঘার বুদ্ধি ও গায়ের জোর। একদিন সে শিকার-সন্ধানে বাহির হইয়া বনের প্রান্তে এক সন্ন্যাসীর কুটিরে উপস্থিত হইল। সে দেখিতে পাইল যে, সন্ন্যাসী চোখ বুজিয়া ধ্যান করিতেছে—আর নিকটেই একটি ছাগল বাঁধা রহিয়াছে। ডবল শিকার দেখিতে পাইয়া তাহার মনে বড় উল্লাস হইল। সে ভাবিল—আজ কোনটাকে আহার করিবে? দুইটাকেই, না একটাকে? সে স্থির করিল যে, আজ ছাগলের মাংস খাওয়া যাক—আগামী কল্য সন্ন্যাসীর সদ্‌গতি করিলেই চলিবে। সে দেখিল ছাগলের মাংস কোমল আর সন্ন্যাসী শুকাইয়া কাঠ হইয়া গিয়াছে, কোমল পাইলে কে কাঠ খায়? তখন সে হুঙ্কারে ছাগলের ঘাড়ে লাফাইয়া পড়িয়া তাহাকে আত্মসাৎ করিয়া ফেলিল। ইতিমধ্যে সন্ন্যাসীর ধ্যানভঙ্গ হইল। সে বিকট-জঙ্ঘার কাণ্ড দেখিয়া ক্রোধে জ্বলিয়া উঠিল এবং তাহার উদ্দেশ্যে শাপ দিল, বলিল, অরে পাষণ্ড, তুই যে কুকর্ম করিলি তাহার পূর্ণ ফল তোকে ভোগ করিতে হইবে। তোকে মানবজন্ম গ্রহণ করিয়া বেসরকারী কলেজের অধ্যাপকরূপে কাজ করিতে হইবে।

সন্ন্যাসীর শাপ শুনিয়াই বাঘ ভয়ে অস্থির হইয়া তাহার পায়ে লুটাইয়া পড়িল—বলিল—প্রভু, অধমকে সন্তানজ্ঞানে ক্ষমা করো।

সন্ন্যাসী বলিল—আমার শাপ ব্যর্থ হইবার নয়।

তখন ব্যাঘ্র শুধাইল—প্রভু, অধ্যাপক জন্ম হইতে কিরূপে নিস্তার পাইব?

সন্ন্যাসী বলিল—ঘুরিতে ঘুরিতে তুমি একদিন আমর আশ্রমে উপস্থিত হইবে, সেদিন আমিই আবার তোমাকে ব্যাঘ্ররূপ দান করিব—এখন যাও।

বাঘ কাঁদিতে কাঁদিতে প্রস্থান করিল।

(২)

রমাপতি বাঘ 'বৃহৎ গৌড়ীয় কলেজে' অধ্যাপক। কলেজটি বেসরকারী। সকলেই জানেন যে, বেসরকারী কলেজের মতো এমন বে-ওয়ারিশ বস্তু আর

নাই। খাস পতিত যেমন সকলেরই, বেসরকারী কলেজগুলিও তেমনি সরস্বতীর খাস পতিত। একটি ছোট বাড়ীর মধ্যে পাঁচ হাজার ছাত্র, একশত অধ্যাপক এবং দেড়শত কেরাণী, বেয়ারা চাপরাশি পুরিয়া দিয়া আগুন ধরাইয়া দিলে যেমন কোলাহল উঠিতে পারে, বিদ্যাভ্যাস কালে বৃহৎ গৌড়ীয় কলেজ হইতে তেমনি একটা ত্রাহি ত্রাহি শব্দ ওঠে, পাড়ার লোকে বুঝিতে পারে যে কলেজের এঞ্জিন পুরা দমে সক্রিয়।

রমাপতি বাঘ কলেজে চাকুরির জন্য দরখাস্ত করিলে 'ইণ্টারভিউয়ের' আহ্বান পাইল। ইণ্টারভিউ কমিটি রমাপতির গুণপণা পরীক্ষার উদ্দেশ্যে প্রশ্ন করিল—আপনি কতটা লাফ দিতে পারেন?

রমাপতি উত্তর করিল—কখনো পরীক্ষা করি নাই তবে পালাইবার প্রয়োজন হইলে খুব সম্ভব এক লাফেই পগার পার হইতে পারি।

কমিটি তাহার সরল উত্তরে খুশী হইল।

প্রিন্সিপ্যাল রমাপতির গায়ের চামড়া পরীক্ষা করিয়া সকলকে বলিল—বেশ শক্ত বলেই মনে হচ্ছে।

সকলেই খুশী হইল বলিয়া তাহার মনে হইল। তখন প্রিন্সিপ্যাল বলিল—আপনাকে নিযুক্ত করা হ'ল—বেতন একশ' টাকা। আর আপনি নামের গোড়ায় 'প্রোফেসার' শব্দটি ব্যবহার করতে পারবেন, তার মূল্য কম নয় ধরুন পঞ্চাশ টাকা—তাহলেই দাঁড়ালো দেড়শ' টাকা।

রমাপতি নগদে ও শব্দে দেড়শ' টাকার নিয়োগপত্র পাইয়া খুশী মনে বাসায় ফিরিল। কমিটি তাহার বিদ্যাবত্তার পরীক্ষা করিল না। অন্যান্য গুণের বলেই কলেজে অধ্যাপক নিয়োগ হইয়া থাকে—তবে সত্যের খাতিরে স্বীকার করিতে হয় যে, কাহারো বিদ্যা থাকিলে তাহা বাধাস্বরূপ গণ্য হয় না।

রমাপতি বাঘ কলেজে আসিয়া প্রথম দিনেই বুঝিতে পারিল কেন তাহার লম্ফশক্তি ও চর্মপরীক্ষা করা হইয়াছিল। কলেজে যদুবাবু নামে একজন সংস্কৃত ভাষার অধ্যাপক ছিল। সে একদিন ক্লাসে একটি ছাত্রকে প্রশ্ন করিয়া বসিয়াছিল। ছাত্রদের অধিকার অনুসারে ইহা ঘোরতর অন্যায়। ছাত্রদের দাবী এই যে, অধ্যাপক নিজেই প্রশ্ন করিবে, নিজেই উত্তর দিবে, তাহারা বসিয়া বসিয়া অধ্যাপকের বিদ্যার গভীরতা পরীক্ষা করিবে। যদুবাবুর প্রশ্নে উত্তেজিত হইয়া ক্লাসসুদ্ধ ছাত্র তাহাকে তাড়া করিল। যদুবাবু অনন্যোপায় হইয়া দোতলা হইতে নীচে লাফাইয়া পড়িল। ছেলেরা শিক্ষকের গুণে মুগ্ধ

হইয়া বলাবলি করিতে লাগিল—না স্যারের Qualification আছে—ওঁকে আর কিছু বলা হবে না। তারপর হইতে যদুবাবু ছাত্রদের সুদৃষ্টির ছাড়পত্র পাইল। তখন হইতে যদুবাবু ক্লাসে প্রশ্ন করিলেও কেহ আপত্তি করিত না, যদিচ কেহ উত্তর দিবারও প্রয়াস করিত না। রমাপতি বুঝিল 'ইণ্টারভিউ' কমিটি দয়ালু বলিয়াই তাহার প্রলম্ফন শক্তি সম্বন্ধে অনুসন্ধান করিয়া লইয়াছিল।

রমাপতি বাঘের শরীরটি ক্ষীণ বটে কিন্তু মুখটি গোলগাল মস্ত। তাহার মুখে এক জোড়া গোঁফ ও বসন্তের দাগ আছে। তার উপরে আবার গলার স্বরটি গম্ভীর। সে গিয়া বসিলে হঠাৎ তাহাকে একটি ধুতি চাদর পরিহিত শিকারসন্ধানী বাঘ বলিয়া মনে হওয়া বিচিত্র ছিল না। তার উপরে আবার তাহার উপাধি 'বাঘ'। ছাত্ররা আড়ালে তাহাকে ব্যাঘ্র, শার্দূল ও Mr. Tiger বলিয়া ডাকিত। কখনো কখনো ছাত্ররা ব্ল্যাক বোর্ডে লিখিয়া রাখিত 'দি রয়াল বেঙ্গল টাইগার'। রমাপতি সব শুনিয়াও শুনিত না, দেখিয়াও দেখিত না। সে বুঝিয়া লইয়াছিল যে বেসরকারী কলেজের অধ্যাপকদের চক্ষু কর্ণ প্রভৃতি অতিরিক্ত সজাগ হওয়া কিছু নয়, কেবল প্রয়োজনকালের জন্য পা-দুখানিকে মজবুত রাখিলেই চলিবে। যদুবাবুর পরীক্ষা দেখিবার সৌভাগ্য তাহার হইয়াছে। সেই অনিশ্চিত দুর্দিনের আশঙ্কায় সে পা দুটিতে ভালো করিয়া তেল মাখাইত, মাথার জন্য এক ফোঁটাও অবশিষ্ট থাকিত না। সে ইতিমধ্যে বুঝিতে পারিয়াছে অধ্যাপকদের মাথাটা অবান্তর, নিতান্ত না থাকিলে লোকে কন্ধকাটা বলিবে এই লজ্জাতেই ওই অনাবশ্যক ভারটাকে বহন করিয়া চলিতে হয়, তাহাদের আসল অঙ্গ পা দুটি। এতদিন পরে সে বুঝিতে পারিল অধ্যাপকগণের পদগৌরবের কথা কেন সকলে ঘন ঘন বলিয়া থাকে।

(৩)

পনেরো বৎসর অধ্যাপনা করিবার পরে রমাপতিবাবুর বেতন আজ লোভনীয় দেড়শতে উঠিয়াছে। সে এখন একজন সিনিয়র অধ্যাপক। কলেজ কমিটির চেয়ারম্যান তাহাকে বলে—হেঁ হেঁ, আপনি তো এখন একজন 'সিনিয়র মেম্বার অব্ দি ষ্টাফ।'—এই উক্তির সরল অর্থ এই যে এখন বেতন বৃদ্ধির দাবী না করিবার মতো বয়স তোমার হইয়াছে।

এই পনেরো বৎসরে রমাপতিবাবুর পাঁচটি দাঁত পড়িয়াছে। অধ্যাপকদের দাঁত অল্প বয়সে পড়ে, কারণ গঙ্গার তোড়ে ঐরাবত ভাসিয়া গিয়াছিল আর

জ্ঞানগঙ্গার উচ্চারণের দুরন্ত স্রোতে সামান্য দাঁত কতদিন টিকিতে পারে। রমাপতি বাবুর চুল পড়িয়া পড়িয়া পাতলা হইয়া গিয়াছে। এখন তাহার শরীর কৃশতর, চক্ষু দুটি মস্তিষ্ক কোটরস্থায়ী জ্ঞানের অন্বেষণে কোটরগত। এই তাহার ক্ষতির দিক। লাভের দিকও অল্প নয়। মাথায় একটি টাক অর্জিত হইয়াছে, আর ডায়াবিটিস ও ক্রনিক ব্রঙ্কাইটিস স্থায়ী বাসা বাঁধিয়াছে তাহার শরীরে। ডায়াবিটিস ধরা পড়িবার পরে রমাপতিবাবুর দশ টাকা বেতন বৃদ্ধি হইয়াছিল। ডায়াবিটিসে নাকি অধ্যাপকের গরিমা বাড়ে—ও একটা মস্ত কোয়ালিফিকেশন। পাছে ডায়াবিটিস সারিয়া গেলে ঐ দশ টাকা কমিয়া যায় তাই রমাপতিবাবু সেটাকে সযত্নে লালন করে—অর্থাৎ প্রাণও থাকে, ডায়াবিটিসও থাকে, এমনভাবে চিকিৎসা করায়।

সংসারে রমাপতিবাবুর গৃহিণী বাদে চার-পাঁচটা সন্তান। কলেজের বেতনে কলিকাতায় সংসার চলে না। তাই তাঁহাকে উপরি রোজগারের চেষ্টা করিতে হয়। সকালে একটি টিউশানি অর্থাৎ ছাত্রের বাড়ীর বাজার—এবং সন্ধ্যায় দুইটি টিউশানি অর্থাৎ ছাত্রের পিতার মোসাহেবি তাহাকে করিতে হয়। ধনীরা অধ্যাপক মোসাহেব পছন্দ করে—কারণ সে সর্বদা জল কাৎ বলিতে প্রস্তুত। রবিবার ও অন্যান্য ছুটির দিনে (সঞ্চিত বিদ্যা পরিপাক করিবার জন্য কলেজে ছুটি অনেক) রমাপতি বাঘ বাদা অঞ্চলে গিয়া ঘাস কাটিয়া আনিয়া কলিকাতার বাজারে বিক্রয় করে। বন্ধুরা শুধাইলে বলে—এটাও আমার অধ্যাপনাব্রতের সুদূরপ্রসারী কাজ। সে বুঝাইয়া দেয়—এই তাজা ঘাস খেয়ে কলকাতার গোরুর স্বাস্থ্য ভালো হবে, স্বাস্থ্যবান গোরুর দুধ খেয়ে শিশুরা সুস্থ সবল হবে—আর তারাই তো আমার ভবিষ্যতের ছাত্র। বন্ধুরা তাহার যুক্তি স্বীকার করিতে বাধ্য হয়। এই কাজ ছাড়াও তাহাকে কাটা কাপড়ের দোকানে ফরমাইস খাটিতে হয়, দাদের মলম ফিরি করিতে হয়, বড় বড় উপাধিধারীর নামে যুগান্তকারী পুস্তক লিখিয়া দিতে হয়। এসব কথা কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয়ের কর্তৃপক্ষ জানে। কিন্তু তাহাদের বিশ্বাস কিছুতেই অধ্যাপকের মর্যাদার হানি হয় না—অধ্যাপকের মর্যাদার এমনি পাকা গাঁথুনি।

এতৎ-সত্ত্বেও কলেজে কেহ রমাপতিবাবুর উপরে খুশী নয়। ছাত্ররা তাহাকে শত্রু মনে করে, কারণ সে ছাত্রদের সত্যই কিছু শিখাইতে চায়। ছাত্র যদি একবার বুঝিয়া ফেলে যে শিক্ষক তাহাকে শিখাইতে চায়—তবে সে শিক্ষকের সর্বনাশ। সহকর্মীরা তাহাকে প্রীতির চক্ষে দেখে না, কারণ সে কর্তব্যনিষ্ঠ।

অন্যান্য অধ্যাপক যখন টেবিল ঘিরিয়া নবরত্নের সভা করিয়া রেশন প্রথার সমালোচনা করিতে থাকে, দর্শনের বৃদ্ধ অধ্যাপক যখন জন্মান্তরের সংস্কারের অনুসন্ধানের ন্যায় দাঁতের ফাঁকে জিহ্বা চালাইয়া মধ্যাহ্ন ভোজনাস্তিক ইলিশ মাছের কাঁটা দিয়া রাঁধা কচু শাকের স্বাদ গ্রহণ করিতে চেষ্টা করে, সংস্কৃতের অধ্যাপক যখন নিরিবিলি বসিয়া সূচসূতা সহকারে ছিন্নবস্ত্রখানা সেলাই করিয়া যায়, ঘড়ির কাঁটা নির্দিষ্ট পর্বের মধ্যে অনেকখানি হেলিয়া পড়িলেও যখন সকলে না দেখিবার ভাণ করে, তখন অর্থাৎ নির্দিষ্ট সময়ে অধ্যাপক বাঘ চাদর ও রেজিষ্ট্রি বহি লইয়া উঠিয়া পড়ে, একগ্লাস জল পান করিয়া লয়—তার পরে দ্রুত ক্লাসের দিকে প্রস্থান করে। আগে আর সকলকে সজাগ করিয়া দিত—এখন আর সে চেষ্টা করে না। এমন কর্তব্যনিষ্ঠ সহকর্মীর উপরে রাগ না করাই অস্বাভাবিক। কলেজের কর্তৃপক্ষও তাহার উপরে খুশী নয়। অধ্যাপকেরা ফাঁকি দিলেও কর্তৃপক্ষ জোর করিতে পারে না—কারণ তাহারা জানে যে, পেট ভরিয়া খাইতে না দিলে কাজের তাড়া দিবার অধিকার থাকে না। বরঞ্চ তাহারা চায় যে, অধ্যাপকরা একটু আধটু ফাঁকি দিক কারণ ঐ দুর্বলতাটুকু না থাকিলে অধ্যাপকরা ঘন ঘন বেতন বৃদ্ধির দাবী করিয়া বসিবে। ফাঁকির ফাঁক দিয়া অধ্যাপকদের নৈতিক অধিকার গলিয়া যাক্ ইহাই কর্তৃপক্ষের বাসনা। রমাপতি বাঘ কর্তব্যনিষ্ঠ—অর্থাৎ যে কোন সময়ে আসিয়া সে বেতন বৃদ্ধির দাবী জানাইতে পারে। এমন লোকের উপরে কোন্ কর্তৃপক্ষ খুশী হয়।

ঘটিলও তাই। কলেজের 'মরাল কোডের' সবচেয়ে বড় অপরাধ রমাপতি বাঘ করিয়া বসিল। সে দশ টাকা বেতন বৃদ্ধির দাবী করিল। তাহার এই দুঃসাহসিক কার্যে কলেজের জমাদার হইতে কলেজ কমিটির চেয়ারম্যান অবধি সকলের নিঃশ্বাস বন্ধ হইবার উপক্রম দেখা দিল। প্রথম কয়েক ঘণ্টা কেহ কথা বলিতে পারিল না। নীরব সমালোচনার পালা শেষ হইলে সরব আলোচনা সুরু হইল।

ঝাড়ুদার বিড়ি ধরাইতে ধরাইতে বলিল—বাবুর ভবিষ্যৎ খারাপ হ'য়েছে।

জমাদার বলিল—ভবিষ্যৎ নয় মাথা। হেড ক্লার্ক বলিল—এ রকম 'কেস' আমি ত্রিশ বছরের চাকুরি জীবনে শুনিনি। সুপারিন্টেনডেণ্ট বলিল—ওর কুষ্ঠিখানা একবার দেখা দরকার।

ভাইস প্রিন্সিপ্যাল বলিল—হাম্বাগ।

প্রিন্সিপ্যাল ভাবের অনুরূপ ভাষা না পাইয়া শুধু বলিল—রমাপতি বাঘ।

সহকর্মীরা বলিল—আমাদের মাথা হেঁট হয়ে গেল।

চেয়ারম্যান বলিল—একটা ব্যবস্থা করতে হয়—এরকম দৃষ্টান্ত ষ্টাফের সম্মুখে থাকা উচিত নয়। ছাত্ররা বলিল—এটা কাপিট্যালিষ্টদের ষড়যন্ত্রের ফল।

তাহারা বলিতে পারে বটে—কারণ সারা বছর কলেজ-বেতনের টাকায় সিনেমা দেখিয়া পরীক্ষার পূর্বে দেড়শ টাকা দেনার স্থলে হাতে পায়ে ধরিয়া পঞ্চাশ টাকায় যাহারা দেনা শোধ করে, পাঁচ টাকা মাহিনা বৃদ্ধির দাবীকে তাহাদের চোখে ধনিকসমাজের ষড়যন্ত্র ছাড়া আর কি মনে হইবে?

পনেরো বছর পরে সকলে একযোগে আবিষ্কার করিয়া ফেলিল—রমাপতি বাবু পড়াইতে পারে না, তাহার দাঁত নাই, তাহার চাদর ছেঁড়া, সে সেকেণ্ড ক্লাস এম-এ, তাহাও আবার খয়রাতি নম্বরের জোরে। কোন কোন অনুসন্ধিৎসু সহকর্মী বলিল—আমরা আরও অনেক কিছু জানি—ওঁর স্ত্রী বাপের বাড়ী যায় না কেন—

অপর একজন বলিল—থাক, থাক, অর্থাৎ খুলিয়া বলিলে যেমন অনুমান করিয়াছি সে আশা ভঙ্গ হইতে পারে।

রমাপতি বাঘের চাকুরিটি গেল। শুধু তাহাই নয়। সে কলেজ হইতে বাহির হইবামাত্র দেড়শত ছাত্র তাহাকে তাড়া করিল। রমাপতিবাবুর পদমর্যাদা এইবারে কাজ দিল। সে ছুটিল—ছাত্ররা ছুটিল—কিন্তু অধ্যাপক বাঘের নাগাল পাইল না। অধ্যাপক বাঘের স্বপদসেবা ব্যর্থ হয় নাই—তাহার দুর্মূল্য তৈল খরচ সার্থক হইয়াছে। বাঘ ছুটিতে ছুটিতে ছাত্রদের অনেক পিছনে ফেলিয়া সুন্দরবনে গিয়া পৌঁছিল। অধ্যাপক বাঘ দেখিতে পাইল বনের প্রান্তে এক কুটীরের আঙ্গিনায় এক সন্ন্যাসী ধ্যানে মগ্ন রহিয়াছে। বাঘ একেবারে তাহার পায়ে গিয়া আছাড় খাইয়া পড়িল—বলিল—বাবা, রক্ষা করো।

সন্ন্যাসী চোখ খুলিবামাত্র বাঘকে চিনিতে পারিল, বলিল—বৎস, তোমাকে আমি চিনি, এবার তোমার দুঃখ ঘুচিবে।

বাঘ বলিল—তার মানে আমার অধ্যাপক জন্ম ঘুচিবে? কিন্তু, তাহা কি সম্ভব?

—কেন নয়? বলিয়া সন্ন্যাসী তাহার গায়ে একটু জল ছিটাইয়া দিল—

অমনি অধ্যাপক রমাপতি বাঘ প্রকাণ্ড এক সুন্দরবনী বাঘে পরিণত হইয়া গর্জন করিয়া উঠিল—হালুম। অর্থাৎ মালুম হইল যে আমার দুঃখের কারণ তুমিই।

অমনি সে সন্ন্যাসীর ঘাড়ে লাফাইয়া পড়িল। সন্ন্যাসী তাহাকে পত্রিকার পূজা সংখ্যার সম্পাদক হইবার অভিশাপ দিতে উদ্যত হইয়াছিল—কিন্তু সময় পাইল না। ভূতপূর্ব অধ্যাপক বাঘ সন্ন্যাসীর ঘাড় ভাঙ্গিয়া পরমানন্দে বসিয়া রক্তপান করিতে লাগিল। এতদিনে সত্য সত্যই তাহার দুঃখের অবসান ঘটিল।

শিবুর শিক্ষানবিশি

দ্বিতীয়পক্ষের গৃহিণীর মুখভার এক বিপর্যয় ব্যাপার।

তাঁহার মুখ একটুখানি ভার হইলে মনে হয়, ছাদের একখানি কড়িকাঠ বুঝি খসিল। তাঁহার চোখ একটু ছল-ছল করিলে অমনি মনে হয়, পাকা ধান-ক্ষেতের উপরে বুঝি জলভরা একখানা মেঘ উঠিল।

ব্যাপারটা এমন বিশদভাবে হয়তো সকলের বুঝিবার সুযোগ ঘটে না, সেই জন্যেই খুলিয়া বলিতে হইল। সকলে বুঝুক আর নাই বুঝুক, নীরদবিহারী বাবু বুঝিয়াছিলেন।

নীরদবিহারী এই গল্পের নায়ক কিংবা তাঁহার পুত্র শিবু লায়েক না হইয়া ওঠা অবধি তিনিই নায়ক ছিলেন। বিষয়টা আরও একটু খুলিয়া বলি।

একদিন নীরদবিহারী অফিস হইতে ফিরিয়া শয়ন-ঘরে ঢুকিয়া দেখিলেন, পত্নী অম্বুজা (দ্বিতীয়পক্ষ) মুখভার করিয়া বসিয়া আছেন।

নীরদ একটুখানি হাসিবার চেষ্টা করিয়া বলিলেন : অম্বুজা ম্লান কেন ?

অম্বুজা ঝঙ্কার দিয়া বলিয়া উঠিলেন : তা তুমি বুঝবে কি ? অফিসে ব'সে আরামে ঘুমোলে বাড়ীর লোকের দুরবস্থা বোঝা যায় না।

অফিসটা যে আরামে ঘুমাইবার একটা প্রশস্ত স্থান, নীরদবিহারীর তাহা অজ্ঞাত ছিল। তিনি সভয়ে একখানি চেয়ারে বসিলেন।

অম্বুজা বলিতে লাগিলেন : তোমার ছেলের জন্য দুপুরে যদি চোখের দু'পাতা এক করতে পারি ! মাগো মা তার চেয়ে আমাকে কালিকাপুরে পাঠিয়ে দাও।

কালিকাপুর অম্বুজার পিত্রালয়। আর শিবু নীরদবিহারীর প্রথমপক্ষের পুত্র,—বয়স পাঁচ কি ছয়।

নীরদবিহারী স্থির করিলেন যে, পুত্রকে স্কুলে পাঠাইতে হইবে, তাহা হইলে আর কালিকাপুরের সমস্যা শুনিতে হইবে না। নীরদবাবু পর দিনই শিবুকে পাড়ার হাই স্কুলে ভর্তি করিয়া দিলেন।

যাঁহারা এখনো মনে করেন যে, ছেলেকে বিদ্যা লাভের উদ্দেশ্যে স্কুলে পাঠানো হয়, কিংবা নিজেকে অর্থলাভের উদ্দেশ্যে অফিসে পাঠানো হয়, তাঁহাদের আর কি বলিব ! গৃহিণীকে দুপুরবেলায় নিরঙ্কুশ ঘুমাইবার অবকাশ-দানের আশাতেই ছেলেদের স্কুলে পাঠাইবার নিয়ম প্রবর্তিত হইয়াছে। আবার

হতভাগ্য স্বামী বাড়ীতে থাকিলে ফেরিওয়ালার নিকট হইতে সওদা করিবার বিঘ্ন হইতে পারে, আশঙ্কায় গৃহিণী তাহাকে দশটার মধ্যে বিদায় করিয়া দেয়। ঐ সময়টুকুতেই গৃহিণীদের 'পূর্ণ স্বরাজ।'

এই ঘটনার পরে পুরা দুই বৎসর অতিক্রান্ত। নীরদবিহারীর পুত্র শিবু এখন উদ্ধবচন্দ্র হাই স্কুলের একজন সুপ্রতিষ্ঠিত ছাত্র। আট বৎসর বয়সে তাহার প্রতিষ্ঠার কথায় কেহ বিস্মিত হইলে তাহাকে বলিব যে সে শিবুকে চেনে না। যদিচ তাহার প্রতিষ্ঠা এখন কেবল শুক্লা দ্বিতীয়ার চন্দ্রকলায়, তবু চক্ষুষ্মানেরা তাহাতেই কি পূর্ণিমার আভাস দেখিতে পায় না।

স্কুলের বার্ষিক পরীক্ষার পরে অম্বুজা একদিন স্বামীকে বলিলেন: দেখো, শিবু নাকি গণিতে কিছু কম নম্বর পেয়েছে বলে প্রোমোশন পায়নি, তুমি একবার হেড মাষ্টারের কাছে যাও না। কোন অনবহিত পাঠক হয়তো ভাবিবেন, শিবুর প্রতি বিমাতার মনোভাব ইতিমধ্যে পরিবর্তিত হইয়াছে। কিন্তু সত্য অন্যরূপ। পাছে ফেল করার অজুহাতে পুত্রকে স্কুল হইতে ছাড়াইয়া লওয়া হয়, আর পুত্রের দ্বিপ্রহারিক দৌরাত্ম্যে নিজের নিদ্রার বিঘ্ন ঘটে, সেই ভয়েই অম্বুজার এই নির্বন্ধ।

নীরদ বলিলেন: হাঁ যাবো বইকি।

এরূপ অবস্থায় অনেক স্বামী স্বর্ণপদ্মের সন্ধানে গিয়াছে, আর নিরদবিহারী উদ্ধবচন্দ্র হাই স্কুলে যাইবেন, তাহাতে আর বিস্ময়ের কি!

পরদিন রূপা-বাঁধানো ছড়ি হাতে নীরদবাবু স্কুলে গিয়া দর্শন দিলেন। অফিস ঘরে হেডমাষ্টার ও তাঁহার অঙ্গ-প্রতঙ্গগণ অর্থাৎ অন্যান্য শিক্ষক ও কেরাণীরা বসিয়াছিলেন। নীরদবাবুকে দেখিয়াই সকলে হাঁ হাঁ করিয়া উঠিয়া দাঁড়াইলেন। হেডমাষ্টার নিজের চেয়ারখানি নীরদবাবুকে ছাড়িয়া দিয়া বসিতে বলিলেন। নীরদবাবু বসিলেন, কিন্তু হেড ও অন্যান্য অঙ্গের দল আর বসিলেন না, নীরদবাবুর সম্মুখে তাঁহারা কি বসিতে পারেন? সংসারে রূপা-বাঁধানো ছড়ির বড় খাতির!

কোন শিক্ষক হয়তো ভাবিতে পারেন, আমি শিক্ষক-সমাজের নিন্দা করিতেছি। কিন্তু যাহারা মরিয়া আছে, তাহাদের নিন্দায় কি ফল? যাহারা মারিয়াছে, পারিলে তাহাদের নিন্দা করিতাম বই কি!

উভয়পক্ষে শিষ্ট সম্ভাষণের পরে নীরদবাবু আসল কথায় আসিলেন, বলিলেন: শিবু বুঝি অঙ্কে ফেল করেছে?

হেডমাষ্টার খাতা বাহির করিয়া দেখিলেন, শিবু তের নম্বর পাইয়াছে। কিন্তু হইলে কি হয়, যাহার পিতার হাতে রূপা-বাঁধানো ছড়ি, তাহার তেরোই যে তিপান্ন!

হেডমাষ্টার বলিলেন: হয়তো আমাদেরই ভুল হ'য়ে থাকবে, আচ্ছা দেখ্‌বো আপনি ভাববেন না।

নীরদবাবু উঠিবার সময়ে বলিলেন: শিবুর জন্য একজন গণিতের টিউটার রাখলে কেমন হয়?

এতক্ষণ শিবুর গনিত শিক্ষক লজ্জায় অধোবদনে ছিলেন, এবার আগাইয়া আসিয়া বলিলেন: আজ্ঞে, খুব ভালো হয়, ছেলেত্তো বুদ্ধিমান।

নীরদবাবু তাঁহাকে ত্রিশ টাকা বেতনে টিউটার নিযুক্ত করিলেন। হেডমাষ্টারের ইচ্ছা ছিল তিনিই শিবুকে গ্রাস করিবেন।

নীরদবাবু সামান্য কারণে ত্রিশ টাকা খরচ করিবার লোক নহেন। তিনি জানেন যে, মাসে ত্রিশ টাকা খরচ করিয়া একাধারে মোসাহেব, ও বছর বছরে শিবুকে পাশ করাইবার উদ্দেশ্যে একজন পাকা পঞ্চম বাহিনী নিযুক্ত করিয়া গেলেন।

সবাই এমন পারে না। কিন্তু রূপা-বাঁধানো ছড়ির অসাধ্য কি? রূপা বাঁধানো ছড়ির দণ্ডে একখণ্ড কোম্পানীর কাগজ আটিয়া দিলে যে বস্তু হয়, তাহাইতো মনুষ্যত্বের পতাকা।

পর বৎসর বার্ষিক পরীক্ষার পরে উদ্ধবচন্দ্র হাই স্কুলের শিক্ষকগণের মধ্যে তালিকা বিনিময় হইয়া গেল। প্রত্যেক তালিকায় কুড়ি, পঁচিশটি করিয়া ছাত্রের নাম, তাহারা প্রত্যেক শিক্ষকের ব্যক্তিগত বা প্রাইভেট ছাত্র। শিক্ষকগণ তালিকা সম্মুখে রাখিয়া পরীক্ষার খাতা দেখিতে লাগিলেন, তালিকাভুক্ত ছাত্রেরা যাহাই লিখুক না কেন, উচ্চ নম্বর পাইল, ফলে তাহারা কেহই ফেল করিল না। একেবারে কিছু ফেল না করাইলে বিদ্যার মর্যাদা রক্ষিত হয় না, তাই যাহারা প্রাইভেট টিউটার রাখিতে পারে নাই—মরিতে তাহাদেরই কতক মরিল। কিন্তু একেবারে মরিল না' তাহাদের অনেকেই আগামী বৎসরের জন্য কোন না কোন শিক্ষককে প্রাইভেট টিউটাররূপে বরণ করিয়া লইল।

আমরা বিশ্বস্তসূত্রে জানিয়াছি, শিবু পাঁচ বিষয়ে ফেল করিয়া প্রাইভেট টিউটারের গৌরবে পাশ করিয়া গেল। এমন শিবু একটি নয় প্রত্যেক স্কুলে

অনেক, সারা বাংলা দেশে অসংখ্য। ইহার ফলে বাংলা দেশের শিবুদের ধারণা হইয়াছে যে, শিখিবার সঙ্গে পাশ করিবার সম্বন্ধটা নিতান্ত আকস্মিক। শিবুদের অভিভাবকগণও ঐ প্রথায় 'শিখিয়াছে'। তাই তাহারা ছাত্রদের 'কি শিখলে?' —জিজ্ঞাসা করে না, জিজ্ঞাসা করে 'পাশ করলে কিনা?'

না শিখিয়া যে বিদ্যা লাভ হয়, সেই বিদ্যায় বাংলাদেশ আজ অন্যান্য প্রদেশের উত্তমর্ণ। সরস্বতীর বাজারে এমন পারমিট-বিতরণের প্রথা আর কোথায়? বিদ্যার বাজারে বাঙালী আজ শ্রেষ্ঠ চোরাকারবারী। স্কুলে না ঢুকিয়া যদি কেহ শিখিয়া থাকেন, তবে তিনি রহস্য হয়তো ভালো বুঝিতে পারিবেন না আশঙ্কা করিতেছি, তাই ব্যাপারটা পরিষ্কার করিয়া বলিতে হইল।

(২)

বাংলাদেশের স্কুলগুলি এক বিচিত্র বস্তু, বিচিত্রতর তাহার ইতিহাস।

এখনো কেহ কেহ মনে করেন যে, শিক্ষাদানই তাঁহাদের উদ্দেশ্য। সেই ভুল ভাঙ্গিবার উদ্দেশ্যেই এই রচনা।

দুপুরবেলায় জননী নির্বিঘ্নে ঘুমাইবেন, ছেলেগুলাকে কোথাও আটকাইয়া রাখা প্রয়োজন। পিতা অফিসে যাইবেন, সেই সময়ে ছেলেগুলা পথে বাহির হইয়া গাড়ী-ঘোড়া-চাপা পড়িতে পারে, তাহাদের কাহারো হেপাজতে রাখিতে হইবে। কোন ছেলের বাপ-মা মরিয়াছে, কোন ব্যক্তি বা দ্বিতীয়বার বিবাহ করিয়াছে, ছেলেগুলিকে যতক্ষণ সম্ভব, বাড়ী হইতে কোথাও নিরাপদে রাখিতে হইবে। এই সব অত্যাবশ্যক প্রয়োজনের তাগিদেই বাংলাদেশের স্কুলগুলি গড়িয়া উঠিয়াছে। ছেলেগুলাকে আটকাইয়া রাখিবার উদ্দেশ্যে স্কুলসমূহের সৃষ্টি। তবে ঐ কাজটি করিতে গিয়া শিক্ষকেরা দেখিতে পাইয়াছেন নিছক কয়েদ করিয়া না রাখিও সময়টাতে কিছু কিছু পড়াইলে অবসর-যাপনের কাজটা সহজ হইয়া আসে। তাই কিছু কিছু পড়াইবার প্রথা প্রচলিত হইয়াছে। আর ঐরূপভাবে পড়াইতে গিয়া দেখা গিয়াছে যে, ছাত্ররা 'পাশ' করিয়া বাহির হইলে আদর্শ কেরাণী হয়, চাকুরিও পাইয়া থাকে। এখন অবশ্য আর চাকুরি পায় না, তবু অভ্যাসটা রহিয়া গিয়াছে। পুরাতন অভ্যাস সহজে যায় না।

গবর্ণমেণ্ট যে সাহায্য দান করেন, তাহাতে স্কুল চলা সম্ভব নয়, কিন্তু বেশী দিবার তাহাদের গরজ কি? শিক্ষকদের তো অতিরিক্ত ভোট নাই, কিম্বা অপ্রাপ্তবয়স্ক ছাত্ররা তো ভোট দিতে পারিবে না। ছাত্র অপ্রাপ্তবয়স্ক হইলেও

অপ্রাপ্তবুদ্ধি নয়, তাহারা বুঝিয়া লইয়াছে যে, তাহাদের প্রদত্ত বেতনেই স্কুল চলে, কাজেই তাহারাই প্রকৃত মালিক। তাহারা জানে যে, হেডমাষ্টারের ঘাড়ে একাধিক হেড নাই যে, তাহাদের তিরস্কার করিতে সাহস পাইবে। আর তিরস্কার করিলে এক স্কুল ছাড়িয়া অন্য স্কুলে গিয়া ভর্তি হইতে কতক্ষণ? কাজেই স্কুলে ছাত্র নিরঙ্কুশ।

অপরদিকে শিক্ষকেরা দেখিয়াছেন যে, বেতন যা তাঁহারা পান তাহাতে চলে না, তাই তাঁহারা ছাত্রদের মধ্য হইতে প্রাইভেট ছাত্র সংগ্রহ করিয়া সংসার চালাইবার উপায় করিয়া লন। একজন শিক্ষক সকাল হইতে মধ্য রাত্রি পর্যন্ত ১০।১২টি করিয়া ছাত্র পড়ান, স্কুলে আসিয়া তাঁহারা সত্যই বিশ্রাম পান। "ওরে পড়্ পড়' বলিয়া শিক্ষক মহাশয় ক্লাসে বসিয়াই ঘুমান। কে কাহাকে বলিবে, সকলেই যে ঘুমাইতেছে। হেডমাষ্টারের হেডও ঘুমের ভারে কাতর। ইহাতেও এক রকম চলিতে পারিত, সুখেই চলিতে পারিত, কিন্তু মাঝখানে স্কুলকমিটি নামে একটি রাহু আছে। শিক্ষকদের নির্জিত করিয়া রিজার্ভ ফাণ্ডটি পুষ্ট হইয়া উঠিবামাত্র স্কুল কমিটিরূপে রাহু তাহাকে গ্রাস করিয়া পালায়।

আর দেশের রাজনীতিকগণ দেখিয়াছে যে, তাহাদের হইয়া ভোট সংগ্রহ করিবার, তাহাদের বিপক্ষ দলের সভা ভাঙিবার, প্রয়োজন হইলে তাহাদের হইয়া শহীদ হইবার বিচিত্র উপাদান ছাত্র সমাজ। তাহারা ছাত্রদের আহ্বান জানায়। তাই যখন ব্যাকরণ শিখিবার সময়, ইতিহাস পড়িবার সময় ছাত্ররা দলে দলে পতাকা লইয়া বাহির হইয়া পড়ে, মিটিং ভাঙে, মাথা ভাঙে, আর শূন্যকক্ষে বসিয়া শিক্ষকেরা হাঁফ ছাড়েন নিরিবিলি ঘুমাইবার সুযোগ পান। যদিচ এই রাজনীতিক দলই স্কুলের সাহায্য হইতে বঞ্চিত রহিয়াছে, তৎসত্ত্বেও শিক্ষকেরা তাহাদের বড় অনুগত, কারণ রাজনীতিকরা টাকা না দিলেও শিক্ষকদের ঘুমাইবার অবসর দেয়। আবার দেশের যে রাজনীতিক দলটি ভোটে হারিয়া যায়, তাহাদের হঠাৎ মনে পড়ে, দেশের শিক্ষায় কোথাও ত্রুটি রহিয়াছে, নহিলে তাহারা হারিবে কেন? আর যে দলটি জিতিল, প্রয়োজন মিটিয়া যাইতেই ছাত্রদের আদেশ করে: তোমরা এবার স্কুলে ফিরিয়া যাও।

কিন্তু ফিরিয়া যাওয়া তো সহজ নয়, পরাজিত পক্ষ আসিয়া উস্কানি দিয়া তাহাদের বাহির করিয়া লয়। ফলে দেশের কাজ করিতে গিয়া ছাত্ররা আর

শিখিবার সময় পায় না কিন্তু না শিখিলেও তাহারা বছরে বছরে নিয়মিত পাশ করিয়া যায়—এমন আজ পঁচিশ, ত্রিশ বৎসর ধরিয়া চলিতেছে।

কাজেই সহজেই বুঝিতে পারা যাইবে, বর্তমান বাংলাদেশের কর্ণধারগণ আজ সেই সব অশিক্ষিত 'পাশ করা' বিদ্বদ্ সমাজ! আমাদের শিবুও সেই দল বৃদ্ধি করিবার জন্য উদ্ধবচন্দ্র হাই স্কুলে চন্দ্রকলার মতো দিনে দিনে বর্ধমান।

(৩)

স্কুলের সময়ে শিবু ও তাহার সঙ্গিগণ, বাংলাদেশের নাকি যাহারা ভবিষ্যৎ, পথে খেলা করে, বিনাভাড়ায় ট্রামে উঠিয়া যাতায়াত করে, কণ্ডাক্টার কিছু বলিতে পারে না, কারণ আগামী ধর্মঘটের সময়ে 'জনগণের সহানুভূতির' উপরে তাহাদের নির্ভর করিতে হইবে। শিবু ও তদীয় সতীর্থগণ পতাকা লইয়া পথে পথে হাঁক দিয়া ফেরে, সভ্য করে এবং সভা ভাঙে। সবই করে কেবল পড়াশুনা ছাড়া, যেহেতু কেহ পড়িতে বলে না, কিংবা না পড়িলেও যেখানে পাশ হওয়া যায়, সেখানে পড়িবে কোন্ নির্বোধ ?

বৎসরান্তে পরীক্ষা হইল, শিবুর দল পরীক্ষা দিল; শিক্ষকেরা পরস্পরের মধ্যে তালিকা বিনিময় করিয়া বলিলেন: একটু দেখবেন।

সকলেই সমব্যথী, ফলে ভালো করিয়াই দেখিল এবং শ্রীমান্ শিবু প্রত্যেকটি বিষয়ে ফেল করিয়াও পাশ করিয়া গেল।

এই ভাবে শিবু না শিখিয়াও পাশ করিতে করিতে প্রবেশিকা ক্লাসে গিয়া উঠিল। প্রবেশিকার টেষ্ট পরীক্ষাতে সে পাশ করিল। টেষ্ট পরীক্ষাতে কোন ছাত্রকে আটকাইয়া রাখে, এমন সাহস কোন স্কুলের নাই। সাধারণ নিয়ম এই যে, বকেয়া বেতন চুকাইয়া দিলেই ছাত্রদের পরীক্ষায় বসিতে অনুমতি দেওয়া হয়। কিন্তু কোন কারণে কোন ছাত্রকে আটকাইলে অমনি তাহার অভিভাবক আসিয়া হাজির হয়, বলে: ছেলেটা বুদ্ধিমান আছে, ঠিক করে নেবে। আপনারা পাঠিয়ে দিন না।

যে ছেলে সারা বছর পড়িয়া ফেল করিল, দুই মাসের মধ্যে সে যে কি ঠিক করিয়া লইবে, ভগবানই জানেন। তবে কিনা হাঁ, বুদ্ধি আছে। অর্থাৎ কিনা পাঠ প্রস্তুত করিতে না পারিলেও পরীক্ষায় নকল করিবার উপায় করিয়া লইতে পারিবে। ইহা ছাড়া অভিভাবকের ভরসার তো আর কোন কারণ দেখি না। অভিভাবকটি এক রকম জানিয়া শুনিয়াই পুত্রের অসাধুতাকে সমর্থন করে—কিংবা, অসাধুতার উপরে ভরসা করিয়াই পুত্রের জন্য অনুরোধ করিতে আসে।

হেডমাষ্টার ভাবেন, দূর ছাই, আটকাইয়া কি লাভ। ছাত্র কমিয়া গেলে স্কুল কমিটির রোষে পড়িতে হইবে।

শিক্ষক ভাবেন, না আটকানোই ভালো, প্রবেশিকা পরীক্ষায় ছাত্র যত বেশী হয়, পরীক্ষক হিসাবে খাতা তত বেশী পাইবার সম্ভাবনা।

বিশ্ববিদ্যালয় দেখে প্রত্যেক পরীক্ষার্থীর মূল্য পনেরো টাকা, যত বেশী ছাত্র হয় ততই লাভ। তাহা ছাড়া 'advancement of learning' তো উপরি পাওনা। এই ভাবে বিদ্যার প্রসার ঘটিতে ঘটিতে বাংলা দেশ বিদ্যায় প্রায় সাহারা মরুভূমি হইয়া উঠিয়াছে।

সকলেই জানে যে, লেখাপড়া কিছু হইতেছে না, এমন করিয়া কিছু হওয়া সম্ভব নয়; তবু কেহ মুখ খুলিয়া বলিতে সাহস করে না, কারণ, কেহ শিক্ষক, কেহ পরীক্ষক, কেহ পরীক্ষার গার্ড, কেহ পুস্তকের দপ্তরী, আর কেহবা পুস্তকের লেখক। বর্তমান প্রথা অন্তর্হিত হইলে সকলেরই আয়ের তোরণ হইতে মোটা রকমের খান কয়েক ইট খসিয়া যাইবে। অতএব—অতএব বিদ্যার প্রসার চলিতে থাকুক। একটা সমস্ত দেশ যখন মনের সঙ্গে চোখ ঠারিতে শুরু করে, তখন....তখন কি হয়, পাঠক তুমিই বলো, আমি তো অনেকটা বলিলাম।

(৪)

এখন পাশ করিবার আশায় শিবু আর প্রাইভেট টিউটারের কৃপার উপরে নির্ভর করে না, সে এখন নিজের পথ নিজে করিতে শিখিয়াছে। আসন্ন ম্যাট্রিকুলেশন পরীক্ষার ব্যবস্থায় সে ও তাহার বন্ধুগণ উদ্যত হইল! বই লইয়া পরীক্ষা গৃহে প্রবেশ সে তো পুরাতন প্রথা। এখন বিজ্ঞানের কৃপায় নূতন ব্যবস্থা উদ্ভাবিত হইয়াছে। তাহাতে ধরা পড়িবার উপায় নাই। তবু পরীক্ষার গার্ডদের একটু সাবধান করিয়া দেওয়া ভালো মনে করিয়া শিবু গণিতের শিক্ষককে বলিল: স্যার খবর শুনেছেন, রংপুরের এক গার্ডকে কে যেন মেরে ফেলেছে।

গণিতের শিক্ষক গণিতের অনেক দুরূহ সমস্যা বোঝে, শিবুর ইঙ্গিতটাও বুঝিলেন, বলিলেন: বাবা, আজকাল তো ছাত্রদেরই যুগ।

শিবু বলিল: আপনারা তো বুঝবেনই।

পরীক্ষা-গৃহে যেসব নির্বোধ গার্ড ছাত্রদের অসাধুতা ধরিয়া ফেলে, তাহাদের কেহ আহত হয়, কেহ নিহত হয়, কাহারো ঘর পোড়ে। যাহারা দৈনিক

পাঁচসিকা পয়সার জন্যে ছাত্রদের অসাধুতা ধরে—তাহাদের এমনি হওয়া উচিত বলিয়া সকলের বিশ্বাস। ছাত্র ও অভিভাবক কাহারো সহানুভূতি তাহারা পায় না, তাহারাই তো জ্ঞানের প্রসারের পথে বাধা। দৈনিক পাঁচসিকা যাহাদের মজুরী, তাহাদের রক্ষা করিবার ভার কাহার উপরে! যদি তাহারা মজদুর হইত, তবে না হয় একটা ধর্ম্মঘট করা চলিত। ঠেকিয়া ঠেকিয়া গার্ডরূপী শিক্ষকগণ এখন চতুর হইয়া গিয়াছেন।

উদ্ধবচন্দ্র হাইস্কুলে পরীক্ষা আরম্ভ হইয়াছে। পাশেই একটা সরকারী পার্ক। ছাত্র বন্ধুগণ সেখানে দাঁড়াইয়া নির্ভয়ে মেগাফোনযোগে পরীক্ষার প্রশ্নের উত্তর হাঁকিতেছে।

'Akbar, the Great Mughal Emperor was born in—'

আর শিবু ও তাহার উৎকর্ণ বন্ধুগণ সেই দৈববাণী শুনিয়া দিব্য লিখিয়া যাইতেছে, কাহারো আপত্তি করিবার কিছুই নাই; কেননা, যাহারা বলিতেছে, তাহারা স্কুলের এলাকার বাহিরে অবস্থিত।

এইভাবে সব প্রশ্নপত্রের উত্তর লেখা হইল। গণিতের পরীক্ষার দিন শিবু বিপদে পড়িল। কানে দৈববাণী সে শুনিতে পাইল না। আগের দিন বিকালে ফুটবল খেলিবার সময়ে একটা বল তাহার কানে লাগিয়াছিল—এখন সে বুঝিতে পারিল, সাময়িকভাবে তাহার শ্রবণেন্দ্রিয় বিকল। সে যাহা পারিল লিখিয়া উঠিয়া আসিল।

পরীক্ষার পরে তদ্বির বলিয়া একটা প্রথা আছে। তখন কলিকাতার অর্ধেক লোক চঞ্চল হইয়া ওঠে। অভিভাবকগণ কোন রকমে একটা পরিচয়ের সূত্র আবিষ্কার করিয়া পরীক্ষকের গৃহে গিয়া দেখা দেয়। শিষ্ট সম্ভাষণ ও মিষ্ট আলাপের পরে বিদায়ের সময়ে পুত্রের রোল নম্বরটি দিয়া বলে: একটু দেখবেন।

তারপর স্মরণ করাইয়া দেয়: আর সব বিষয়েই পাশ করবে, কেবল আপনার পেপারেই একটু সন্দেহ আছে।

ভাবটা, এমন ছাত্রকে ফেল করানো জাতীয় উন্নতির পথে বাধা স্থাপন।

পরীক্ষকেরা ভারি বুদ্ধিমান; সব ইঙ্গিত বুঝিতে সক্ষম। তাঁহারা রোল নম্বর টুকিয়া লন।

ইহার উপরে আছে পরীক্ষকদের মধ্যে তালিকা বিনিময়—গণিতের পরীক্ষক ইংরাজির পরীক্ষককে, ইংরাজির পরীক্ষক ইতিহাসের পরীক্ষককে—এমনিভাবে

চলে। কেবল বাংলার পরীক্ষককে কেহ বিশেষ খাতির করে না, বাংলা পরীক্ষায় লিখিলেই পাশ, না লিখিলেও ফেল নয় বলিয়া বাঙালীর ধারণা। এমন ব্যাপক তদ্বির-প্রথা থাকিতে আদৌ যে কেহ ফেল করে, ইহাই বিস্ময়ের। যাহারা ফেল করে বুঝিতে হইবে সংসারে তিন কূলে তাহাদের কেহ নাই—তাহারা পাশ করিলেই বা কাহার কাজে লাগিবে?

আমাদের সংবাদ এই যে, শিবু দৈববাণীর কৃপায় একটিমাত্র বিষয়ে কম নম্বর পাইয়াছে, গণিতে ১৮ নম্বরের বেশী পায় নাই। কিন্তু তৎসত্ত্বেও সে ম্যাট্রিকুলেশন পাশ করিয়া গেল। মাত্র এক বিষয়ে ফেল করিলে খাতাটি পুনরায় পরীক্ষা করা হয়। পুনরায় পরীক্ষার ইঙ্গিতের মানেই কিছু নম্বর বাড়াইয়া দেওয়া,—ইহাই নিয়মের মর্ম। নিয়ম ও তদ্বিরের যুগ্ম আশীর্বাদে শিবুর আঠারো তেত্রিশ হইল—অতএব ধরিয়া লইতে হইবে, শিবু গণিত শিখিয়াছে।

শিবুর পাশ করার সংবাদে নীরদবাবু বন্ধুদের ডাকিয়া ভোজ দিলেন। অম্বুজা অপ্রসন্ন মুখে বলিলেন,—যত আদিখ্যেতা।

যথাকালে শিবু কলেজে ভর্তি হইল।

(৫)

শিবু কলেজে প্রবেশ করিয়া দেখিল, কলেজ-জীবনের মতো এমন নিরঙ্কুশ সুখের সময় আর নাই। কলেজে আসিলেও চলে, না আসিলেও চলে, তাহাতে বিদ্যার বা উপস্থিতির তারতম্য ঘটে না। সে আরও বুঝিতে পারিল, বিদ্যালয়ের শিক্ষকদের চেয়ে কলেজের অধ্যাপক আরও বেশী অসহায়, দরকার হইলে 'সরল জীবনযাত্রার অজুহাতে' শিক্ষক গরু চরাইতে পারে, ঘাস কাটিতে পারে, কিন্তু অধ্যাপককে একটা মর্যাদার ভাণ রাখিয়া চলিতে হয়, নতুবা সরকারী কলেজের ভদ্রবেতনের অধ্যাপকদের কাছে মান থাকে না। আর ছাত্র স্বাধীনতা! বিদ্যালয়ের স্বাধীনতার জানালাগুলি মাত্র খোলা, কলেজে জানালা-দরজা সবই খোলা। এমন কি ছাদের অনেকটা অংশও খোলা। স্বাধীনতার বন্যায় ঘর ভাসিয়া কাপড়-জামা ভিজিয়া যায়, শিবু দেখিল, কলেজে অধ্যাপকরা ছাড়া আর সবাই জেণ্টেলমেন।

ইতিমধ্যে শিবু কয়েকজন সহপাঠিকে লইয়া দল গড়িয়া সভা-সমিতি করিতে লাগিল। সে-সব সভায় সে বক্তৃতা করিত, সহপাঠিরা ধন্য ধন্য করিত—কারণ, শিবু তাহাদের প্রায়ই ডিমের মামলেট খাওয়াইত এবং চা পান করাইত।

মানুষের মস্তিষ্কের একটা ক্ষুধা আছে। আগে যখন বিদ্যালয়ে মুখস্থ করিবার প্রথা ছিল, তখন সংস্কৃত, বাংলা ও ইংরাজি কবিতায় স্মরণশক্তির সেই গহ্বর পূর্ণ হইত। এখন সে কু-প্রথা অন্তর্হিত হইয়াছে, কিন্তু মগজের স্বাভাবিক ক্ষুধা তো লোপ পাইবার নয়, অথচ মুখস্থ প্রথা রহিত। তাই যত সব উড়ো কথা, শোনা কথা, কাগজের বুকনিতে ছাত্রদের সেই গহ্বর ভরিয়া ওঠে, আর সভা-সমিতির উপলক্ষ্য পাইলে সেই কীটগুলা বর্ষাকালের উইয়ের মতো পাখা মেলিয়া আকাশ ভরিয়া দেয়। সকলে বলে শিবু একজন 'প্রোগ্রেসিভ থিংকার'।

এই ভাবে বক্তৃতা করিতে করিতে এবং ডিমের অমলেট খাইতে খাইতে একদিন শিবু দেখিল যে, সে বি-এ পাশ করিয়া ফেলিয়াছে। বাঙালী ছাত্র না শিখিয়া পাশ করে, না পড়িয়া শেখে, কুমীর শাবক যেমন জন্মিয়াই সন্তরণপটু, বাঙালী-সন্তান তেমনি সহজাত-শক্তির বলে বিদ্যাবারিধির পারঙ্গম। বাঙালীর এত গুণ অন্য প্রদেশের লোকে বুঝিতে পারে না, বাঙালী তাই তাহাদের নির্বোধ বলে।

শিবুর পাশের সংবাদে নীরদবাবু আনন্দিত হইয়া বলিলেন : এমন যে হবে, তা আগেই জানতাম। ওর জন্মকালে আমার অনেক কালের পোষা ছাগলটি মরিয়াছিল—

অম্বুজা বলিলেন : নইলে আর এমন সুসন্তান জন্মায়। নাও, অনেক হয়েছে। এবারে একটা চাকুরী জুটিয়ে নিতে বলো।

শিবুর বিদ্যার যোগ্য চাকুরী বাঙলা দেশে মিলিতে পারে না, তাই সে সর্বভারতীয় পরীক্ষায় যোগ দিবার উদ্দেশ্যে দিল্লী রওনা হইল। অন্য প্রদেশের ছাত্ররা খাটিয়া পড়ে, শিখিয়া পাশ করে, তাহারা বাঙালী ছাত্রদের মতো প্রোগ্রেসিভ নয়। প্রতিযোগিতামূলক পরীক্ষায় তাহারা পাশ করিল। শিবু সমস্ত বিষয়ে কাজেই একুনে একটি সুবৃহৎ শূন্য পাইয়া ফিরিয়া আসিল।

সে ফিরিয়া আসিয়া বলিল : নাঃ, 'ওরা' বাঙালীকে কখনো চাকুরি দেবে না, বাঙালী ছাত্রদের প্রতি 'ওদের' অত্যন্ত বিদ্বেষ। 'ওরা' থাকা অবধি বাঙালীর কোন আশা-ভরসা নেই।

নীরদবাবু এখন পেন্সনপ্রাপ্ত। অনেকাল আগেই সাধনোচিত ধামে তাঁহার প্রস্থান করা উচিত ছিল। কিন্তু নিয়মিতভাবে চ্যবনপ্রাশের গুলি মারিয়া যমরাজের বাহনগুলিকে তিনি ঠেকাইয়া রাখিয়াছেন। তিনি পার্কে,

ক্লাবে, কবিরাজি দোকানে পেন্সনপ্রাপ্তদের মধ্যে 'ওদের' বাঙালী-বিদ্বেষের নূতন উদাহরণ ছড়াইয়া বেড়াইতে লাগিলেন। পেন্সনপ্রাপ্তরা একবাক্যে, তাঁহার উক্তি স্বীকার করিয়া লইল, 'ওদের' উপরে তাহাদের বড়ই রাগ, কেননা, সরকারী চাকুরে সকলেরই ভাগ্যে D. A. জুটিয়াছে, কেবল পেন্সনধারীদের সে সুযোগ দেওয়া হয় নাই। এমন গভর্ণমেণ্ট বাঙালী-বিদ্বেষী না হইয়া যায় না।

সন্ধ্যা বেলায় কবিরাজি দোকানে মোদক গিলিতে গিলিতে বৃদ্ধের দল বলিল : না 'ওরা' আর বাঙালীদের ক'রে খেতে দিল না, নইলে শিবুর মতো সোনার টুকরো ছেলে—

বাক্য শেষ হইতে পারিল না, মোদকের আঁঠায় তখন গলা আটকাইয়া ধরিয়াছে।

শিবু এখন যত্রতত্র বাঙালীর প্রতি 'ওদের' বিদ্বেষের কথা প্রচার করিয়া বেড়ায়, আর অবসর সময়ে জীবিকার্জনের পন্থা ভাবে। সে একবার ভাবে সাহিত্য করিবে, আর একবার ভাবে সিনেমার জন্য সিনারিও লিখিবে, কখনো ভাবে সব ব্যবসার সেরা ব্যবসা পলিটিক্‌সে নামিবে। ঐ তিনটির একটিতে সে যাইবেই, কারণ না শিখিয়া যে বিদ্যা অর্জিত হয়, তাহাতে ঐ তিনটি ছাড়া আর গত্যন্তর কোথায় ?

শিবুর শিক্ষানবিশির এই ইতিহাস বাঙালী সমাজের সবচেয়ে বড় 'সিক্রেট' ; ইহা ফাঁস করিয়া দিবার অপরাধে শিবুর দল এখন লেখকের উপরে অসন্তুষ্ট না হইলেই রক্ষা।

অদৃষ্ট-সুখী

কোন দেশে 'অদৃষ্ট-সুখী' নামে এক অন্ধ ব্যক্তি বাস করিত। সংসারে তাহার কোন অভাব ছিল না, তাহার প্রয়োজনাতিরিক্ত অর্থ ছিল, স্নেহময়ী পত্নী ছিল, সহানুভূতিসম্পন্ন আত্মীয় স্বজন ছিল, দাস দাসী প্রচুর ছিল। তবু তাহার মনে সুখ ছিল না। অন্ধব্যক্তি কবে সুখী? সংসারে অন্ধব্যক্তির যেসব অসুবিধা হইয়া থাকে অদৃষ্ট-সুখীর তাহার কোনটিই ছিল না। সে দেখিতে পায় না বটে, কিন্তু যাহার দাস দাসী প্রচুর, না দেখিবার অসুবিধা তাহার ভোগ করিতে হয় না। হাতে ধরিয়া চলাফেরা করাইবার লোকেরও তাহার অভাব ছিল না। সকালে বিকালে সে অশ্বযানে বেড়াইতে বাহির হইত, যখন যাহা প্রয়োজন চাহিবার আগেই তাহার জুটিত। সকলে বলিত লোকটা সুখী বটে। তাহার দৃষ্টির অভাব আর দশ রকম প্রাচুর্যের তলে চাপা পড়িয়া গিয়াছিল—লোকের চোখে পড়িত না। কিন্তু অদৃষ্ট-সুখীর মনে শান্তি ছিল না, সে ভাবিত কেবল যদি দৃষ্টি পাইতাম, আর কিছু চাহিতাম না। সে গম্ভীর মুখে বসিয়া থাকিলে তাহার স্নেহময়ী পত্নী আসিয়া মধুর কণ্ঠে শুধাইত, তুমি গম্ভীর হয়ে আছ কেন? কিসের তোমার অভাব? তাহার পিতা বলিত, বৎস, তোমার নামে আজ একটি নূতন সম্পত্তি কিনলাম। মাতা পুত্রবধূকে বলিত, বৌমা, তুমি একটু বাছার কাছে গিয়ে ব'সো না—তোমার সংসারের কাজের মধ্যে থাকবার প্রয়োজন কি? বন্ধুরা বলিত, ভায়া, এই নাও গোলাপ ফুলের তোড়া, তোমার নূতন বাগানের ফুল—এমন ফুল আমরা চোখে দেখি নাই।

অদৃষ্ট-সুখী বলিত—ভাই আমিও চোখে দেখি নাই—

বন্ধুরা বলিত, তা হলে আর তোমাতে আমাদের প্রভেদ কি?

তারপরে সান্ত্বনা দিয়া বলিত, চোখে দেখতে পেলেই কি লোকে সুখী হয়? এই তো ও পাড়ার গোবিন্দ—চোখ তার দুটো বটে, কিন্তু চোখ দিয়ে দেখবার মতো একটা বস্তুও কি তার ঘরে আছে? সে না পায় খেতে, না পায় পরতে! ভগবান তোমার উপর খুশী নিশ্চয়!

অদৃষ্ট-সুখী ভাবিত, হায়, ভগবান খুশী হইলে আমার এমন দশা হইবে কেন? সে ভাবিত লোকে বলে আকাশ নীল, পৃথিবী সবুজ, দিবস উজ্জ্বল, রাত্রি নক্ষত্রময়, লোকে বলে আমার পত্নী সুন্দরী; আমার পিতা সুপুরুষ—

কিন্তু আমার কাছে সবই অন্ধকার। ইহা কি ভগবানের খুশীর লক্ষণ? সে ভাবিত আমার মতো আর হতভাগ্য কে?

ক্রমে তাহার জীবন দুর্বহ হইয়া উঠিল। আত্মহত্যা করিবে বলিয়া সে স্থির করিল—কিন্তু অন্ধের পক্ষে আত্মহত্যা করাও সহজ নয়, কারণ সে পরাধীন। তখন সে সঙ্কল্প করিল যে ভগবানের সাধনা করিয়া দেখিবে, সে শুনিয়াছে যে সাধনায় ভগবান খুশী হন, আর খুশী হইলে তিনি মানুষকে অভীষ্ট বরদান করিয়া থাকেন। তখন সে বাড়ীর বাগানের একটি আতাগাছের তলায় বসিয়া তপস্যায় মন দিল। তিন দিন তিন রাত্রির কঠোর তপস্যায় ভগবান সন্তুষ্ট হইয়া তাহার কাছে আসিয়া বলিলেন—বৎস, আমি খুশী হইয়াছি—তুমি বর প্রার্থনা করো।

অদৃষ্ট-সুখী তাহাকে প্রণাম করিয়া বলিল—ভগবান্, যদি সত্যই খুশী হইয়া থাকো, তবে আমাকে দৃষ্টি দাও।

ভগবান বলিল—বৎস, অন্য বর প্রার্থনা করো।

সে বলিল—আমার অন্য কিছুর অভাব নাই—

ভগবান বলিল—লোকের কত অভাব থাকে। তোমার একটিমাত্র অভাব—তবু তুমি সন্তুষ্ট নও কেন?

সে বলিল—আমার শত অভাব ঘটুক, কেবল দৃষ্টির অভাব পূরণ করিয়া দাও।

ভগবান বলিল—চোখে দেখিতে পাইলেই কি মানুষ সুখী হয়? বৎস, আমার কথা শোনো, সুখ দৃষ্টির উপরে নির্ভর করে না, কাজেই দৃষ্টি তুমি চাহিও না।

কিন্তু অদৃষ্ট-সুখী কিছুতেই ছাড়িবে না। মানুষের স্বভাব এই যে, তাদের একটি মাত্র অভাব থাকিলেও সে অসুখী বোধ করে, সে ভাবে তাদের শত দুঃখ ওই রন্ধ্রপথে আসিতেছে। করায়ত্ত শত সুখ অনায়ত্ত একটি অভাবের চেয়ে ছোট মনে হয়।

ভগবান তাহাকে নাছোড়বান্দা দেখিয়া বলিলেন—বৎস, তুমি দৃষ্টিলাভ করিবে বটে কিন্তু সুখী হইবে কিনা বলিতে পারি না। কাল সকালে তুমি দৃষ্টি পাইবে। এই বলিয়া ভগবান অন্তর্হিত হইলেন। অদৃষ্ট-সুখী সন্তুষ্ট হইয়া বাড়ীর ভিতরে ফিরিয়া আসিল।

(২)

পরদিন প্রাতঃকালে অদৃষ্ট-সুখী চোখ মেলিবামাত্র সমস্তই দেখিতে পাইল। জগতের সহিত এই তাহার প্রথম শুভদৃষ্টি। শুভদৃষ্টি মাত্রই যে সুখদৃষ্টি নহে বিবাহিত ব্যক্তি মাত্রেই তাহা অবগত। অদৃষ্ট-সুখী চোখ মেলিয়া প্রথম কি দেখিতে পাইল? দেখিল তার পত্নী তখনও নিদ্রিত। সে দেখিতে পাইল, তাহার সুন্দরী পত্নীর নাকের নীচে অতি সূক্ষ্ম, অতি কোমল একটি গোঁফের রেখা। সে শুনিয়াছিল স্ত্রীলোকের গোঁফ, দাড়ি ওঠে না। তবে তাহার পত্নীর বেলায় এমন ব্যতিক্রম কেন? না সকলেরই এমন আছে? তাহার মনে হইল নিয়মই হোক আর ব্যতিক্রমই হোক ওই অতি সূক্ষ্ম, অতি কোমল লোমটি না থাকিলেই ছিল ভালো। ইহাই তাহার চোখের দৃষ্টির প্রথম অভিজ্ঞতা।

দ্বিতীয় অভিজ্ঞতা এই যে সে অন্যের সাহায্য ব্যতীত হাঁটিতে চেষ্টা করা মাত্র পাঁচ সাত জন চাকর আসিয়া ধরিয়া ফেলিল—বলিল, এ কি দাদাবাবু প'ড়ে যাবেন যে।

দুই দিন পরে আর প্রয়োজন নাই বলিয়া যখন তাহাদের কর্ম্মচ্যুতি ঘটিল তাহারা প্রকাশ্যে অদৃষ্ট-সুখীকে নিমকহারাম বলিয়া গালি দিয়া চলিয়া গেল, সংসারে কৃতজ্ঞতা নাই, নইলে কাজ ফুরোলে আমাদের তাড়িয়ে দেওয়া হবে কেন? দৃষ্টিলাভ করিয়া অদৃষ্ট-সুখী যে অন্যায় করিয়াছে ইহাই তাহাদের অভিমত। ইহা তো দুই দিন পরের অভিজ্ঞতা প্রথম দিনের অভিজ্ঞতা এখনো বর্ণনা করা হয় নাই।

অদৃষ্ট-সুখীর দৃষ্টিলাভে তাহার স্নেহময়ী জননী বলিল—ছি বাছা এতদিন চোখ বুজে থেকে কি বাপ মায়ের মনে কষ্ট দিতে হয়? তুমি তো আমার ভাল ছেলে!

পিতা আসিয়া বলিল—যাক্ ভালোই হ'ল। এখন তো ওর কোন কষ্ট নেই। নূতন সম্পত্তিটা ওর একার নামে না রেখে ওদের কয়েক ভাইয়ের নামে ক'রে দেবো।

সাধ্বী স্ত্রী সম্মুখে আসিল। হাসিয়া হাত নাড়িয়া বলিল—যা হোক্ এতদিন খুব ঢঙ করলে—এমন নাকি মানুষেও পারে?

অদৃষ্ট-সুখী স্ত্রীর কথা কানে না তুলিয়া তাহার পত্নীর গুম্ফরেখার দিকে তাকাইয়া রহিল। পত্নী চারুবালার চোখ দুটি সুন্দর বলিয়া তাহার মনে

একটু অভিমান ছিল ! তাহার আশা ছিল সদ্যলব্ধ-দৃষ্টি স্বামী পত্নীর চোখ দুইটি দেখিবে, প্রশংসা করিবে। কিন্তু স্বামীকে চোখের দিকে না তাকাইয়া নাকের নীচে তাকাইতে দেখিয়া ঝঙ্কার দিয়া উঠিল—বলিল—কি দেখা হচ্ছে ?

চারুবালা বোধকরি দর্পণ যোগে নিজের দুর্বলতার ক্ষীণ চিহ্নটুকু দেখিয়াছে। স্বামী কোন কথা না বলিয়া একটি দীর্ঘনিশ্বাস চাপিয়া ফেলিল। সাধ্বী স্ত্রীর কাছে স্বামীর মনের কথা গোপন থাকে না, দীর্ঘনিশ্বাস তো সামান্য। স্ত্রীর কণ্ঠস্বর ঝঙ্কার ছাড়িয়া ক্রেঙ্কার দিয়া উঠিল—বলিল—মেয়ে মানুষ কি এর আগে দেখনি।

স্বামী ইচ্ছা করিলে বলিতে পারিত সত্যই দেখি নাই। কিন্তু তৎপূর্বেই চারুবালা গৃহান্তরিত হইল।

তার পরে বন্ধুরা আসিয়া বলিল—ভায়া খুব চালানটাই চলালে। অন্ধ নাম নিয়ে থেকে পাড়ার মেয়েগুলোকে নির্বিবাদে দেখেছ। আমাদের সামনে মেয়েগুলো আসতে চায় না—অথচ অন্ধ বলে তোমাকে লজ্জা করতো না, খুব মতলব যা হোক করেছিলে, ব্রেভো—এই বলিয়া তাহার পিঠ চাপড়াইয়া দিল।

সে শুনিতে পাইল চাকর-দাসীগণ আড়ালে ঠেলাঠেলি করিতেছে—আসল কথা কি জানো। এতদিন বৌমার উপরে অভিমান ক'রে চোখ বুজে ছিল—মানভঙ্গের পরে এবার কলির কেষ্ট চোখ মেলেছে !

রাত্রে পত্নী পাশ ফিরিয়া শুইল—স্বামীকে নাকের নীচের অংশ দেখিবার সুযোগ দিল না। আর বিনিদ্র অদৃষ্ট-সুখী সারাদিনের অভিজ্ঞতা স্মরণ করিয়া ভাবিল শেষ পর্যন্ত বিধাতার কথাই কি সত্য হইবে নাকি ? অন্ধত্বরূপ একটি দুঃখের পরিবর্তে একাধিক দুঃখের অগ্নিকুণ্ডে পড়িলাম নাকি ? সে ভাবিল—দেখাই যাক্—সংসারের রহস্য একদিনে বুঝিয়া ওঠা যায় না।—অদৃষ্ট-সুখী সুখী হইবে আশা লইয়া ঘুমাইয়া পড়িল।

(৩)

পরদিন অদৃষ্ট-সুখীর পুত্র স্কুল হইতে ফিরিয়া আসিয়া পিতাকে শুধাইল—বাবা, প্রতারক শব্দের অর্থ কি ?

পিতা বলিল—যে বলে এক, করে আর, যে লোককে ঠকায়।

তারপরে শুধাইল—কেন রে ?

পুত্র বলিল—পণ্ডিত মশায় আজ তোমাকে প্রতারক বলেছে।

পিতা শুধাইল—কেন?

পুত্র বলিল—প্রতারক শব্দের অর্থ বল্‌তে গিয়ে পণ্ডিত মশাই বল্‌লেন যেমন আর কি নন্তুর বাপ সে অন্ধ নয়, কিন্তু অন্ধ বলে লোককে বলে।

পিতা পণ্ডিতের উপর রাগিয়া পুত্রকে এক চড় মারিল—সে পাড়া-জাগানো স্বরে কাঁদিতে কাঁদিতে প্রস্থান করিল। তাহার কাছে সব কথা শুনিয়া মাতা আসিয়া অদৃষ্ট-সুখীর ঘাড়ে পড়িল, বলিল—সকাল বেলাতে নন্তুকে মারলে কেন? বলি তোমার হয়েছে কি? তুমি কি হাতীর পাঁচ পা দেখেছ নাকি?

অদৃষ্ট-সুখী বলিল—তাই বলে কি আমি প্রতারক!

পত্নী বলিতে পারিত সে কি নন্তুর দোষ; কিন্তু সে তর্কে প্রবেশ না করিয়া বলিল—প্রতারক বই কি। একেবারে প্রতারক! ঢং ক'রে চোখ বুজে থেকে খাটিয়ে খাটিয়ে আমার হাড়ে দুর্বো গজিয়ে দিয়েছ, তুমি যদি প্রতারক না হও তো তবে কি ও পাড়ার রাম শর্মা প্রতারক?

অদৃষ্ট-সুখী বলিল—আমার দৃষ্টিলাভ করায় তোমরা খুশী হওনি দেখছি।

পত্নী ঝঙ্কার দিয়া বলিল—হইনি তো! অন্ধ অন্ধের মতো থাকো—তার আবার এত আহ্লাদ কেন?

এই বলিয়া সে দ্রুত প্রস্থান করিল।

অদৃষ্ট-সুখী দেখিল বিধাতার সতর্ক বাণী অমূলক নয় তাহার দৃষ্টিলাভে কেহ সুখী হইয়াছে মনে হইল না। তাহার পিতা বলে—চুপ ক'রে বসে থাকলে চলবে কেন। এবারে বিষয় সম্পত্তি একবার দেখা শোনা করো।

মাতা বলে—বাছা এতকাল কেন মিছে কষ্ট দিলে।

পত্নী যাহা বলে—আগেই শুনিয়াছি।

ভাইরা বলে—বাবু এতদিন খুব মজা করেছে, এবারে খাটুক। এমন আরাম পেলে সংসারসুদ্ধ লোক অন্ধ হ'য়ে থাক্‌তে রাজি আছে।

পাড়ার মেয়েরা বলে—ভারি সেয়ানা, অন্ধ সেজে থেকে সব দেখে নিতো।

অদৃষ্ট-সুখী দেখিল যে বন্ধুরা পরিহাস ছলে গঞ্জনা দেয়, ভৃত্যরা গঞ্জনাছলে পরিহাস করে, প্রতিবেশীগণের অনুযোগ প্রতিযোগের আর অন্ত নাই। তখন তাহার মনে হইল অন্ধ থাকিতেই সে সুখী ছিল, অন্ধত্ব ফিরিয়া পাওয়াই তখন তাহার কামনা হইল।

আবার সে বাগানের আতাগাছটির তলায় গিয়া বসিয়া তপস্যা সুরু করিল। অল্প সাধনাতেই ভগবান দেখা দিলেন, শুধাইলেন—বৎস, ব্যাপার কি?

অদৃষ্ট-সুখী বলিল,—স্যর, আপনার কথাই ঠিক, দৃষ্টিলাভ করিয়া কাহাকেও সুখী দেখিলাম না, দৃষ্টি ফিরাইয়া নিন।

ভগবান এবার সুযোগ পাইয়া বলিলেন, দেখিলে তো মানুষের চেয়ে ভগবানের বুদ্ধি বেশি। তোমরা আজকাল প্রায়ই ইহা অস্বীকার করিয়া থাকো।

অদৃষ্ট-সুখী বলিল—ঘাট হইয়া গিয়াছে, এবার দৃষ্টি লইয়া পুনরায় অন্ধ করিয়া দিতে আজ্ঞা হোক।

ভগবান বলিলেন—তুমি সুখ চাহিয়াছিলে কিন্তু সুখ চোখ কান নাক মুখ প্রভৃতি ইন্দ্রিয় বা অঙ্গ প্রত্যঙ্গাদির উপরে নির্ভর করে না! মরুভূমির বালু হইতেও খেজুর গাছ বা কাঁটা মনসা যেমন রস শুষিয়া লইতে পারে তেমনি সংসারে নীরসতম অবস্থাও মানুষকে রস জোগাইতে পারে—যদি মানুষের মন থাকে! দৃষ্টি থাকিলেই যদি সুখী হয়, তবে সংসারে এত দুঃখ কেন? অন্ধ আর কয়জনে? অর্থ থাকিলেই যদি সুখী হয়, তবে ধনীর সন্তান সংসার ত্যাগ করে কিসের দুঃখে? আত্মীয় স্বজন যদি সুখের কারণ হয় তবে কুরু-বংশ ও যদুবংশ কাটাকাটি করিয়া মরিল কেন? নিঃসঙ্গতাই যদি দুঃখের হেতু, তবে সন্ন্যাসীগণ অরণ্যে বাস করে কেন? বৎস, সৃষ্টির গুপ্ত রহস্য এই যে সুখ বলিয়া কিছু নাই। বিশ্ব সৃষ্টি করিবার সময়ে আমার মনে হইল জোড়ে জোড় গণিয়া হিসাব মিলাইয়া যদি তৈয়ারি করি তবে কিছুদিনের মধ্যেই বিশ্ব ব্যাপার পরিতৃপ্ত হইয়া ঘুমাইয়া পড়িবে। তাই গোদুগ্ধের মধ্যে অম্লবিন্দুর মতো বিশ্বের মধ্যে একবিন্দু অতৃপ্তির রস ফেলিয়া দিলাম—তাহার, ফলে দেখো না কেমন আসর জমিয়া উঠিয়াছে। ওই অতৃপ্তির আবেগে লোকে ছুটাছুটি করিয়া মরে—শুধাইলে বলে সুখ খুঁজিতেছি। খুঁজিতে আপত্তি কি—কিন্তু যাহা নাই, তাহা কে পায়।

অদৃষ্ট-সুখী শুধাইল—এমন করিতে গেলে কেন?

ভগবান বলিল—একাকী অবস্থায় বড়ই বিরক্তি জন্মিতেছিল—তাই যা হোক্ একটা কিছু তৈয়ারি করিলাম। এই বিশ্ব আমার সুবৃহৎ পরিহাস। সবাই সুখ সুখ, করিয়া হাঁফাইয়া মরিতেছে দেখিয়া আমি আনন্দ পাই।

অদৃষ্ট-সুখী বলিল—তুমি কি নিষ্ঠুর।

ভগবান বলিল—আমি নির্মম, কিছুতেই আমার মমত্বজ্ঞান নাই। শিল্পবস্তুর প্রতি শিল্পীর মতো আমার মনোভাব। দ্রৌপদীর দুঃখে কি বেদব্যাস বিচলিত

হইয়াছিলেন ? সীতার ক্রন্দনে কি বাল্মীকি বিচলিত হইয়াছিলেন ? তবে আমিই বা কেন রামশর্মার পুত্রবিয়োগে, বা যদুবাবুর সম্পত্তিবিনাশে বা অদৃষ্ট-সুখীর অন্ধত্বে দুঃখিত হইতে যাইব ?

অদৃষ্ট-সুখী বলিল—প্রভু অনেকটা বুঝিয়াছি, বাকিটুকু ধীরে সুস্থে বুঝিতে চেষ্টা করিব, আপাতত দৃষ্টি ফিরাইয়া লও।

ভগবান বলিলেন—তথাস্তু! তারপরে অন্তর্হিত হইলেন। অদৃষ্ট-সুখী পুনরায় অন্ধ হইয়া অতিশয় আনন্দে ফিরিয়া আসিল।

পরদিন তাহাকে অন্ধ দেখিয়া পিতা, পুত্র, পত্নী, মাতা, আত্মীয়স্বজন, ভৃত্যবর্গ এবং পাড়ার রমণীগণ সকলেই বহুকালের অভ্যস্ত আনন্দের স্বাদ পাইল।

পত্নী বলিল—যা রয় সয় তাই কর, তোমার কেন বাপু চোখওয়ালার মতো চলা ফেরা।

মাতা বলিল—বাছার আমার কত কষ্ট।

পিতা বলিল—ভাগ্যে দলিলটা পরিবর্তন করি নি।

ভাইরা বলিল—দাদা, আমরা আছি—তোমার ভয় কি ?

ভৃত্যরা বলিল—এই তো বড়লোকের মত কাজ।

প্রতিবেশীগণ বলিল—সকাল বিকাল ওঁর বাড়ী গিয়ে চা না খেলে মনে বড় কষ্ট পাবেন!

পাড়ার মেয়েরা বলিল—পাড়ায় দু'একটা অন্ধ থাকা ভাল, মনের সুখে মুখ ভ্যাঙানো যায়।

পুত্র বলিল—পণ্ডিতমশাই বলেছেন আমার বাবা মুখে আর কাজে এক।

অদৃষ্ট-সুখী শয্যায় শুইয়া পড়িয়া বলিল—আঃ বাঁচলাম! সার্থক আমার অদৃষ্ট-সুখী নাম।

গুহামুখ

এক সন্ন্যাসী পশুপতিনাথ দর্শন সারিয়া দেশে ফিরিতেছিল। সন্ধ্যা হইবার আগেই কোন জনপদে আসিয়া আশ্রয় লইবে তাহার ইচ্ছা, কাজেই সে দ্রুত হাঁটিতেছিল। নেপালের তরাই অঞ্চলের গভীর অরণ্যের মধ্যে দিয়া সঙ্কীর্ণ পথ। বিশাল বনস্পতির ছায়া পথটির উপরে ডোরা কাটিয়া দিয়া তাহাকে আদিমযুগের অতিকায় একটা অজাগরের সাদৃশ্য দিয়াছে। নিকটে নিকটে লোকালয় নাই। যে সব কাঠুরিয়া সেখানে কাঠ কাটিতে আসে, তাহারা ফিরিয়া গিয়াছে। সন্ধ্যা সমাগত। সন্ন্যাসী বুঝিল আজ আর জনপদে পৌঁছিবার আশা নাই! কিন্তু এই অরণ্যে রাত্রিযাপন আর মৃত্যু একই কথা। রাত্রিকালের অরণ্য শ্বাপদের যথেচ্ছ বিহারের ক্ষেত্র। এসব বিষয় সন্ন্যাসীর না জানিবার কথা নয়। দেশ বিদেশে ভ্রমণ করিয়াই তাহার সন্ন্যাসজীবনের চল্লিশ বৎসর অতিবাহিত হইয়াছে। আজ সে বৃদ্ধ। চিন্তাকুলভাবে কিয়দ্দূর অগ্রসর হইয়া সন্ন্যাসী ছোট একটি পাহাড় দেখিতে পাইল। পাহাড়টির নিকটে গিয়া একটি গুহামুখ দেখিল। সন্ন্যাসী ভাবিল— ভগবান দয়া করিয়াছেন—আজ এই গুহার ভিতরেই রাতটা কাটাইয়া দিব। কিন্তু তখনি তাহার মনে হইল—এইসব গুহাতেই বাঘ ভালুক দিনমান কাটাইয়া থাকে। কোন জন্তু জানোয়ার গুহার মধ্যে আছে কিনা দেখিবার উদ্দেশ্যে সে সন্তর্পণে প্রবেশ করিল। ঢুকিয়া দেখিল যে, গুহাটি প্রশস্ত, পরিচ্ছন্ন। সে বুঝিল জন্তু জানোয়ার কখনো এখানে আসে নাই—নতুবা এমন পরিচ্ছন্ন থাকিত না! সে গুহার শিলাময় মেঝেতে বসিল। দেখিল অদূরে খানিকটা ভস্ম পড়িয়া আছে—বুঝিল অল্পকাল আগে তাহারই মত কোন পথিক এখানে আশ্রয় লইয়াছিল। নিরাপদ আশ্রয় লাভ করিয়া তাহার মনে অপ্রত্যাশিত আনন্দ হইল। রাত্রে আহার জুটিবার সম্ভাবনা তাহার ছিল না। সন্ন্যাসীর জীবনে এমন অঘটন নয়। সে নিকটবর্তী এক ঝরণা হইতে জলপান করিয়া ফিরিয়া আসিল এবং মেঝেতে মৃগচর্মখানা বিছাইয়া শুইয়া পড়িল। সারাদিনের পথশ্রমে সে অতিশয় ক্লান্ত হইয়া পড়িয়াছিল— নিদ্রা আসিতে তাহার বিলম্ব হইল না।

সন্ন্যাসীর ঘুম ব্রাহ্মমুহূর্তে ভাঙে। সন্ন্যাসী জাগিয়া দেখিল যে, তখনো রাত্রি শেষ হয় নাই—গুহামুখ অন্ধকার। সে আবার পাশ ফিরিয়া শুইল।

কিন্তু ঘুম আসিল না। কিছুক্ষণ পরে আবার সে গুহামুখে তাকাইল—গুহামুখ তখনো অন্ধকার। সে ভাবিল—এ কেমন হইল? এতক্ষণে তো রাত্রি শেষ হইবার কথা। সে উঠিয়া গুহামুখের কাছে গিয়া বিস্ময়ে চীৎকার করিয়া উঠিল। সে বলিল—কি সর্বনাশ! গুহামুখ বন্ধ হইল কিরূপে? তাই আমি আলো দেখিতে পাই নাই। সন্ন্যাসী হাত দিয়া অনুভব করিল গুহামুখ পাথরের প্রাচীর তুলিয়া কে যেন বন্ধ করিয়া দিয়াছে। রন্ধ্রমাত্র নাই। সে ভাবিল—কে এমন কাজ করিল? কেন এমন হইল? এখন আমি বাহির হইব কিরূপে?

সন্ন্যাসী হতাশ হইয়া বসিয়া পড়িল। রাত্রে তাহার সুনিদ্রা হইয়াছিল বটে কিন্তু ক্ষুধা-তৃষ্ণায় কাতর হইয়া পড়িয়াছিল! সন্ন্যাসী ভাবিতে লাগিল—এখন আমি বাহির হইব কিরূপে? ক্ষুধাতৃষ্ণায় প্রাণ যে যায়! এ কোন মায়াবীর গহ্বরে আসিয়া পড়িলাম।

তাহার অন্তর ও বাহির ঘোরান্ধকার। সন্ন্যাসীর মনে পড়িল যে, তাহার কাছে চকমকি ও সোলা আছে! সে দ্রুতহস্তে আগুন জ্বালাইল। আগুনের আভায় দেখিল গুহামুখ কঠিন পাথরের দেওয়াল তুলিয়া গাঁথা—যেন কোন নিপুণ শিল্পীর কাজ! সে ভাবিল—তাহা হইলে এই গর্তেই তাহাকে শুকাইয়া মরিতে হইবে! না জানি কি পাপ করিয়াছিলাম।

এমন সময়ে মশালের আলোকে সে দেখিতে পাইল—গুহামুখের নিকটে লিখিত আছে—"এই গহ্বরে পাপী প্রবেশ করিলে বাহির হইতে পারিবে না।"

এবারে সে দ্বিগুণ নৈরাশ্যে বসিয়া পড়িল—ভাবিতে লাগিল—তবে আমি পাপী! আমার চল্লিশ বৎসরের সন্ন্যাস নিস্ফল। কিন্তু তাহার কিছুতেই মনে পড়িল না সন্ন্যাস জীবনে কি পাপ সে করিয়াছে? গৃহাশ্রমে থাকিতে কোন পাপ তাহাকে স্পর্শ করে নাই এমন হইতেই পারে না—কিন্তু চল্লিশ বৎসরের কঠোর সাধনা কি তাহা ক্ষালিত করিতে সক্ষম হয় নাই? সে চল্লিশ বৎসর ধরিয়া দেশে বিদেশে সাধু সন্ন্যাসীর আশ্রমে ভ্রমণ করিয়াছে, কত না কৃচ্ছসাধনা করিয়াছে, ভিক্ষা দ্বারা দিনাতিবাহন করিয়াছে, কোন তীর্থক্ষেত্র বাদ দেয় নাই—তবু সে পাপী? এমন কোন গুরুতর পাপ আছে যাহা এই সাধনায় অপগত না হয়? কোন গুরুতর পাপের কথা তাহার মনে পড়িল না। সে মশাল নিবাইয়া বসিয়া পড়িল। এতো মায়াবীর মায়া নয়, মানুষের চাতুরী নয়, কাজেই তাহার বাহির হইবার আশা বৃথা। সে

ভাবিল—দৈব তাহাকে বন্ধ করিয়াছে, একমাত্র দৈব তাহাকে বাহিরে আনিতে পারে। দৈব ইচ্ছাধীন নয়। এইরূপ কত কথা ভাবিতে ভাবিতে সে অবসন্ন হইয়া ঘুমাইয়া পড়িল।

ঘুমাইয়া সে স্বপ্ন দেখিল। একটি দিব্যমূর্তি তাহার সম্মুখে উপস্থিত। সন্ন্যাসী শুধাইল—প্রভু, আমার কি পাপ?

জ্যোতির্ময় মূর্তি বলিল—পাপ না করিয়া থাকিলে অবশ্যই শান্তি পাইবে। শান্তি পাইয়াছ কি?

সন্ন্যাসী বলিল—না, প্রভু, শান্তি পাই নাই। শান্তি লাভের উদ্দেশ্যেই আমার সন্ন্যাস—কিন্তু শান্তি তো এখনও লাভ করিতে পারি নাই।

মূর্তি বলিল—তবে নিশ্চয় পাপ তোমাকে স্পর্শ করিয়াছে—নতুবা শান্তি না পাইবে কেন?

সন্ন্যাসী ভাবিল—তা-ও বটে!

কিন্তু তবু সে পাপের স্বরূপ বুঝিতে পারিল না।

দিব্যপুরুষ তাহার মূঢ়ভাব দেখিয়া বলিল—তুমি কখনো নিজের জীবিকার্জনের চেষ্টা করো নাই—ইহাই তোমার পাপ এবং গুরুতর পাপ।

সন্ন্যাসী বলিল—প্রভু, সংসারে সবাই নিজের জীবিকার্জন করিতেছে, সকলেই কি তবে ধার্মিক?

মূর্তি বলিল—অধিকাংশ লোকেই নিজের জীবিকার্জনের নামে অপরের জীবিকা হরণ করিতেছে—কাজেই অবশিষ্টগণ নিজের জীবিকার্জন করিতে পারিতেছে না। তাহারা সকলেই পাপাচারী।

সন্ন্যাসী শুধাইল—সে কিরূপ?

মূর্তি বলিল—যাহার দশমুদ্রা প্রয়োজন তাহার বিশ মুদ্রা সংগ্রহের অর্থ অপরের ভাগ হইতে দশ মুদ্রা অপহরণ—সে পাপী। আবার যে লোকের দশ মুদ্রার প্রয়োজন সে যখন পাঁচ মুদ্রা মাত্র পাইতেছে—তাহার অর্থ সে অপরকে তাহার প্রাপ্য পাঁচ মুদ্রা অপহরণ করিতে নিষ্ক্রিয় সাহায্য করিতেছে—সে-ও পাপী। তুমি সন্ন্যাসী হইয়া একটি মুদ্রাও অর্জন করো নাই—অন্যের অর্জিত অন্নে ভাগ বসাইয়াছ।

সন্ন্যাসী শুধাইল—সন্ন্যাসীর পক্ষে ভিক্ষা করা কি পাপ?

মূর্তি বলিল—পাপ বই কি! দ্বিগুণিত পাপ। তোমার অনর্জন একটি

পাপ, ভিক্ষা দিলে গৃহীর পুণ্য হয় এই ভ্রমের তুমি সহায়ক, কাজেই সেটাও পাপ। সে পাপের অর্ধেক তোমার।

সন্ন্যাসী শুধাইল—এবারে আমি কি করিব?

মূর্তি বলিল—জীবিকার্জনের সঙ্কল্প করো। গুহামুখ খুলিয়া যাইবে।

সন্ন্যাসী বলিল—গুহামুখ খুলিবে? কিন্তু আমার পাপ তো দূর হয় নাই।

মূর্তি বলিল—পাপ দূর করিবার সঙ্কল্পই পুণ্য।

এই বলিয়া মূর্তি মিলাইয়া গেল। সন্ন্যাসী ধড়ফড় করিয়া জাগিয়া উঠিল। দেখিল গুহামুখপথে অপরাহ্নের আলো অনাবিল ধারায় প্রবেশ করিতেছে। স্বপ্নের বিস্ময়ে সে মূঢ়ের মতো বসিয়া রহিল।

(২)

সন্ন্যাসী আবার পথে চলিতেছে। সে সঙ্কল্প করিল এখন হইতে নিজের জীবিকা নিজে উপার্জন করিবে এবং জীবিকার জন্য যে-টুকু মাত্র আবশ্যক তাহার অধিক উপার্জন করিবে না। সে হিসাব করিয়া দেখিল যে, দুই আনা পয়সা হইলেই তাহার চলে—সন্ন্যাসীর তাহার বেশী কি প্রয়োজন। কিন্তু উপার্জনের উপায় কি? চণ্ডীপাঠ হইতে জুতা সেলাই অবধি সমস্ত পন্থার মানসিক আলোচনা সে শেষ করিয়াছে—এবং বুঝিয়াছে তাহার কোনটাই তাহার সাধ্য নয়। পথে যাইতে যাইতে সে দেখিতে পাইল একস্থানে একদল মজুর পুকুর খুঁড়িতেছে। সেখানে গিয়া সে মজুরের কাজ করিবার জন্য উমেদার হইল। মজুরেরা বলিল—তুমি সন্ন্যাসী, তোমার আবার কাজ করিতে হইবে কেন? তাহার চেয়ে কিছু ভিক্ষা লইয়া প্রস্থান করো। কিন্তু সন্ন্যাসী স্থির করিয়াছিল সে ভিক্ষা গ্রহণ করিবে না, কাজেই সে ভিক্ষা না লইয়াই প্রস্থান করিল। মজুরেরা বলিল—বাবাজীর ঢং দেখো না।

সন্ন্যাসী একটি গ্রামে উপস্থিত হইয়া দেখিল সেখানে একটি বড় মেলা বসিয়াছে। সে ভাবিল—এখানে কোন কাজ করিয়া দুই আনা পয়সা রোজগার করিতে হইবে। মেলায় ঘুরিতে ঘুরিতে দেখিল এক জায়গায় কয়েকজন মুচি বসিয়া জুতা সেলাই করিতেছে। সে তাহাদের পাশে গিয়া বসিল। সন্ন্যাসী বুঝিয়াছিল যে, তাহার গেরুয়া দেখিলে কেহ তাহাকে কাজ করিতে দিবে না। তাই গেরুয়া চাদরখানা লুকাইয়া রাখিল। এমন সময়ে একজন লোক আসিয়া তাহাকে বলিল—আমার জুতা জোড়া সারিয়া দাও, আমি এখনি আসিতেছি। এই বলিয়া সে জুতা জোড়া রাখিয়া প্রস্থান করিল।

সন্ন্যাসী জুতা জোড়া লইয়া পার্শ্ববর্তী এক মুচির নিকট হইতে সুতা ও মোটা সুচ চাহিয়া লইল—এবং অন্য মুচিদের কৌশল লক্ষ্য করিয়া জুতা সেলাই করিতে লাগিল। কিছুক্ষণ পরে লোকটি ফিরিয়া আসিয়া জুতা জোড়া দাবী করিল। সন্ন্যাসী জুতাজোড়া দিয়া দুই আনা পয়সা চাহিল। লোকটি বলিল—একি সেলাই হইয়াছে নাকি—বুড়া হইলে তবু কাজ শিখিলে না? এর জন্য আবার দুই আনা? এই বলিয়া সে আটটি পয়সা ছুঁড়িয়া দিয়া প্রস্থান করিল। এমন সময়ে অন্যান্য মুচিরা তাহাকে বলিল—তুমি আমাদের ব্যবসা মাটি করিবে। আমরা যেখানে ছ'আনা, আট আনা লইয়া থাকি সেখানে আট পয়সায় কাজ করিলে কে আমাদের কাছে আসিবে? তুমি এখান হইতে পালাও। সন্ন্যাসী তাহাদের যুক্তির সত্যতা বুঝিতে পারিয়া পয়সা কয়টি লইয়া প্রস্থান করিল।

তখন সন্ধ্যা হইয়া আসিয়াছিল। সন্ন্যাসী নিকটবর্তী এক দোকান হইতে চিড়া দই কিনিয়া এক বৃক্ষতলে বসিয়া আহার সারিয়া লইল। সে স্থির করিল সেখানেই রাত্রিযাপন করিবে। হঠাৎ মনে সে এমন শান্তি অনুভব করিল—যাহা তাহার কাম্য হইলেও কখনো পাইবে ভাবে নাই। তাহার মনে হইল সমস্ত সংসার আচ্ছন্ন করিয়া একটি সুমধুর গীতধ্বনি উত্থিত হইতেছে আর তাহার সমগ্র সত্তা—দেহ, মন ও ইন্দ্রিয়সকল, সেই গীতের তালে তালে আনন্দে ছুটিতেছে। সন্ন্যাসী বুঝিল আনন্দ ও শান্তি অভিন্ন। বিশ্বের দিক হইতে দেখিলে যাহা শান্তি, নিজের দিক্ হইতে দেখিলে তাহাই তাহার আনন্দ। বিশ্বপ্রবাহের অনুকূলতাই শান্তি। সন্ন্যাসজীবনে যে বস্তু সে বৃথায় খুঁজিয়া মরিতেছিল, নিজের জীবিকা অর্জনে তাহা লাভ করিল। সে ঘুমাইয়া পড়িল। ঘুমাইয়া স্বপ্নে দেখিল সেই পূর্বদৃষ্ট জ্যোতির্ময় পুরুষ আবির্ভূত হইয়াছে। দিব্য পুরুষ বলিল—শান্তি পাইয়াছ কি?

সন্ন্যাসী বলিল—সন্ন্যাসে যাহা পাই নাই, জীবিকার্জনে তাহা পাইয়াছি; কিন্তু এমন হইল কেন? সন্ন্যাস কি তবে বৃথা?

দিব্য পুরুষ বলিল—ন্যূনতম জীবিকার্জনই সন্ন্যাস, অন্য সন্ন্যাস নাই। যে তাহার বেশি করে সে তস্কর, যে তাহার কম করে সে ভিক্ষুক। এই তিন শ্রেণী লইয়াই মানব সমাজ। গৃহাশ্রমে তুমি তস্কর ছিলে—সন্ন্যাসশ্রমে ভিক্ষুক ছিলে—এবারে তুমি প্রকৃত সন্ন্যাসী হইয়াছ। এই বলিয়া দিব্যমূর্তি অন্তর্হিত হইল। সন্ন্যাসীর সুষুপ্তি ব্রাহ্মমুহূর্তের পূর্বে ভাঙিল না।

ডাকিনী

(১)

চতুর্বর্গের মধ্যে জ্ঞানের উল্লেখ না থাকায় হল্‌দেকলসির চৌধুরীগণ কখনো তাহার চর্চা করে নাই এমন কি চতুর্বর্গের সারাংশ মাত্র রাখিয়া বাকিটুকু তাহারা বরাবর বর্জন করিয়া আসিতেছিল। এহেন কালে এবং এহেন ক্ষেত্রে কিভাবে চতুর্বর্গাতীত সরস্বতীর উদয় হইল তাহা বিস্ময়কর হইলেও একেবারে অপ্রত্যাশিত নহে। সংসারে অপ্রত্যাশিতের অবকাশ সর্বদাই রহিয়াছে।

হল্‌দেকলসির বর্তমান জমিদার শশাঙ্ক চৌধুরী পিতৃহীন। বয়স হওয়া সত্ত্বেও এখন পর্যন্ত মাতাই তাহার অভিভাবক। এখনো সে বিবাহ করে নাই। তবে ভাবে গতিকে বুঝিতে বিলম্ব হয় না যে, এই অসহায় যুবকটি বিবাহ করিবামাত্র মায়ের অঞ্চল পরিত্যাগ করিয়া পত্নীর অঞ্চল অবলম্বন করিবে। কোন কোন পুরুষ চিরকাল স্ত্রীলোকের অঞ্চল ছায়ায় করদরাজ্যরূপে জীবন কাটাইতে অভ্যস্ত। শশাঙ্ক চৌধুরী সেই দলের।

পূজার ছুটিতে শশাঙ্ক ও তাহার মাতা অম্বাময়ী দেওঘরে আসিয়াছেন। দেওঘরে শশাঙ্কের পিতা একটি বাড়ী তৈয়ারী করিয়াছিলেন। সেই একতলা বাড়ীর উপরে আরও তিনটে তালা চড়াইয়া দিয়া অম্বাময়ী বাড়ীটাকে পাড়ার মধ্যে উদ্ধত করিয়া তুলিয়াছেন। এই বাড়ীটি তাঁহার পরম গৌরবের বস্তু। তাঁহাদের বহু পুরুষের পাণ্ডাঠাকুর হঠাৎ একদিন কোন কারণে বাড়ীটির একটি খুঁত প্রদর্শন করাতে অম্বাময়ীর মুখ অকস্মাৎ গম্ভীর হইয়া গেল। তারপরে অনেক দিন তিনি দেবদর্শন করিতে যাওয়া বন্ধ রাখিয়াছিলেন। অম্বাময়ী জানিতেন দেবদর্শন পাণ্ডার যেমন লাভ দেবতার নহে। এত বড় দেওঘর সহরে একটি মাত্র পথ তাঁহার পরিচিত—মন্দির হইতে তাঁহার বাড়ীর পথ। এই দুটি স্থান ছাড়া কদাচিৎ অন্যত্র তিনি যাইতেন। একদিন মন্দির হইতে ফিরিবার পথে বাড়ীর কাছে আসিয়া শশাঙ্ক বলিয়া উঠিল—মা, তোমার বাড়ীটা যেন মন্দিরের চেয়েও উঁচু। দেবমন্দিরের উচ্চতা কল্পনাতে লঙ্ঘন করাও পাপ—কাজেই মাতা পুত্রকে তিরস্কার করিলেন বটে—কিন্তু মনে মনে তেমন দুঃখিত হইলেন না। সেদিন চাহিবামাত্র শশাঙ্ক মাতার নিকট হইতে অপ্রত্যাশিত অর্থলাভ করিল। বলা বাহুল্য শশাঙ্কর পড়াশুনা বেশিদূর অগ্রসর হয় নাই, সে ম্যাট্রিকুলেশান পরীক্ষায় ফেল করিয়াছে। তাহার মা সগর্বে সকলের কাছে

বলিয়া বেড়ান—আমার ছেলে ম্যাট্রিকুলেশান ফেল—যেন ধনীর ছেলের পক্ষে পাশ হওয়ার চেয়ে ফেল হওয়ার গৌরব বেশি।

যদুনাথবাবু সদাগরী অফিসের পেন্সনপ্রাপ্ত কেরাণী। তিনি পূজার ছুটিতে দেওঘরে হাওয়া বদল করিতে আসিয়াছেন। সঙ্গে তাঁহার মেয়ে মল্লিকা। মল্লিকাই তাঁহার একমাত্র সন্তান। যদুনাথবাবু বিপত্নীক। মেয়েকে দিবার মতো অন্য কিছু তাঁহার নাই বলিয়া তাহাকে শিক্ষা দিয়াছিলেন। মল্লিকা এম-এ পাশ করিয়াছে। সেদিন পিতা-পুত্রী বাহির হইয়া অনেকটা ঘুরিবার পরে ক্লান্ত হইয়া হল্‌দেকলসি কুটীরের গেটের পাশে বসিয়া বিশ্রাম করিতেছিলেন। এমন সময়ে অম্বাময়ী মন্দিরে যাইবার উদ্দেশ্যে বাহিরে আসিতেছিলেন। একটি অপরিচিত মেয়েকে বাড়ীর দিকে মুগ্ধ দৃষ্টিতে তাকাইয়া থাকিতে দেখিয়া তিনি শুধাইলেন—কি দেখ্‌ছ মা? মল্লিকা ঠিক যে কি দেখিতেছিল তাহা নিশ্চয় করিয়া বলা সহজ নহে। এরকম ক্ষেত্রে সহজতম উত্তরটাই সে দিল—বাড়ীটা বেশ বাড়ী। আপনার বুঝি?

অম্বাময়ীর মুখ উজ্জ্বল হইয়া উঠিল। হাঁ, মেয়েটি সমজদার বটে। কই এমন করিয়া কোন অপরিচিত ব্যক্তি অযাচিতভাবে তো তাঁহার 'হল্‌দেকলসি কুটীরের' প্রশংসা করে নাই।

তিনি বলিলেন হাঁ মা আমাদেরই বাড়ী। তা এখানে বসে কেন? এসো না ভিতরে। তারপরে গলা একটু খাটো করিয়া বলিলেন—উনি বুঝি তোমার বাবা?

মল্লিকা বলিল—হাঁ, বাবা।

যদুনাথবাবু বিশ্রাম করিতে লাগিলেন। অম্বাময়ী মল্লিকাকে লইয়া বাড়ীর ভিতর বিশ্রামের উদ্দেশ্যে প্রবেশ করিলেন।

কিন্তু পথের লোক টানিয়া আনিয়া বিশ্রামের সুযোগ দান তো অম্বাময়ীর অভিপ্রায় নয়—তিনি ঘণ্টাখানেক ধরিয়া মল্লিকাকে বাড়ীর অন্ধি সন্ধি সব দেখাইলেন। মল্লিকা কতকটা বা ভদ্রতার খাতিরে কতকটা বা সত্যের খাতিরে বাড়ীটার অনর্গল প্রশংসা করিয়া গেল। অম্বাময়ীর মন গলিয়া গেল।

বিদায় লইবার সময়ে তিনি মল্লিকার নাম, ধাম পুছিয়া লইলেন এবং পরদিন মধ্যাহ্নে আহার করিবার জন্যে পিতা-পুত্রীকে নিমন্ত্রণ করিলেন।

মল্লিকা অম্বাময়ীর অনুরোধ এড়াইতে না পারিয়া প্রত্যহ বিকালে পিতাকে সঙ্গে করিয়া বেড়াইতে আসে। কয়েকদিন পরে একদিন অম্বাময়ী মল্লিকাকে

বাগান দেখিবার জন্য পাঠাইয়া দিয়া নিজে চিকের আড়ালে থাকিয়া যদুবাবুর কাছে কর্মচারীর মারফৎ মল্লিকার সঙ্গে শশাঙ্কের বিবাহ প্রস্তাব করিলেন।

যদুবাবু ঠিক এ জন্য প্রস্তুত ছিলেন না। তাই কি বলিবেন ভাবিয়া না পাইয়া বলিলেন—আমরা গরীব।

অন্নাময়ীর ইঙ্গিতে কর্মচারী বলিলেন—আমরা তো টাকাকড়ি চাই না—ভালো মেয়ে চাই। ঘর বর যদি আপনার অপছন্দ না হয়।

যদুবাবু বলিলেন—বিলক্ষণ!

তারপরে শশাঙ্কের সঙ্গে মল্লিকার বিবাহ স্থির হইয়া গেল। এম-এ পাশরূপ কেবল যে একটি খুঁৎ মেয়ের ছিল তাহা প্রকাশ পাইল না—প্রকাশ পাইলে কি হইত নিশ্চয় করিয়া বলা সহজ নহে।

অগ্রাণ মাসেই শশাঙ্কের সঙ্গে মল্লিকার বিবাহ দেওঘরে সম্পন্ন হইয়া গেল। বিবাহের কিছুদিন পরেই আরও দূরবর্তী স্থানের হাওয়া বদল করিয়া দেখিবার জন্য যদুনাথবাবু পরলোকে প্রস্থান করিলেন। মল্লিকা কিছুদিন খুব কান্নাকাটি করিল। কিন্তু যে কাল দুঃখের কালো স্রোত ডাকিয়া আনে সেই কালই হাসির শুভ্র পুঞ্জ পুঞ্জ ফেনারও বাহন। কালক্রমে তাহার চোখের জল শুকাইল এবং মুখে হাসি দেখা দিল। দেওঘরে কয়েক মাস কাটাইয়া ফাল্গুনের প্রথমে অন্নাময়ী পুত্র ও পুত্রবধূ লইয়া হল্‌দেকলসি প্রত্যাবর্তন করিলেন।

(২)

গুড়নদীর তীরে আম কাঁটাল জাম নারিকেলের গাছের মধ্যে হল্‌দেকলসি গ্রাম। বাংলাদেশের হাজার হাজার গ্রামের সঙ্গে এই গ্রামখানির প্রভেদ নাই। এপারে মানুষের বাস, ওপারে বিস্তীর্ণ চাষের ক্ষেত। তারমধ্যে আখের ক্ষেতটাই বেশি নজরে পড়ে। শরৎকালে বিস্তৃত ক্ষেত্রে প্রৌঢ় আখের সারি সঙীণ-তোলা ব্যূহবদ্ধ সৈন্যবাহিনীর মতো নিশ্চল হইয়া দাঁড়াইয়া থাকে। শরৎকালের মধ্যেই এই উদ্ভিজ্জ বাহিনী আততায়ীর কাটারির আঘাতে ভূমিশায়ী হইয়া গাড়ী বোঝাই হইয়া দূরবর্তী চিনির কলের দিকে প্রস্থান করে। শীতের শেষে এখন আখের ক্ষেত শূন্য। রবিশস্য পক্ক প্রায়। ধান-কাটা মাঠে আগুন ধরাইয়া দিয়া ধানের গোড়া পোড়ানো চলিতেছে। ওপারের নিস্তব্ধতার মধ্যে নানা রকম শস্যের পরিণতি লাভের প্রয়াস; এপারে শত রকমের শব্দে তরুরাজি আচ্ছাদিত মানুষের বসতির লক্ষণ। মাঝখানে গুড়নদী দুই দিকের

শৈবালের পাড় দেওয়া গঙ্গাজলী শাড়িখানি পরিয়া শীর্ণ স্রোতে চলমানা। সে না মানুষের, না প্রকৃতির।

মল্লিকা সহরের মেয়ে, গ্রামে আসিয়া নিজেকে বড়ই অসহায় অনুভব করিল। এখানকার নিস্তব্ধতা কেমন যেন বুক চাপিয়া ধরে—এখানকার নির্জনতা কেমন যেন অস্বস্তিকর। সহরের মেয়ে গ্রামের মধ্যে কোথাও অবলম্বন পায় না। নূতন আত্মীয়স্বজন এখনও তাহাকে প্রসারিত মনে গ্রহণ করে নাই—নূতন বধূর প্রতি সব শ্বশুরকুলেই প্রথমে একটা প্রতিকূলতার ভাব থাকে। মল্লিকার প্রতি প্রতিকূলতা কিছু বেশি ছিল। অম্বাময়ী কাহারও সঙ্গে পরামর্শ না করিয়া, কাহাকেও ভাল করিয়া না জানাইয়া তাহাকে ঘরে আনিয়াছেন। সে দোষ যেন মল্লিকারই—মল্লিকার উপরে সকলের রাগটা কিছু বেশি। কারণ, অম্বাময়ীর উপরে রাগ করা চলে; কিন্তু রাগ প্রকাশ করা চলে না। মল্লিকা একা বসিয়া থাকিলেও দোষ—দেখো সহরের মেয়ের অহঙ্কার। আবার সকলের সঙ্গে মিশিতে গেলেও দোষ—দেখো সহরের মেয়ের নির্লজ্জতা। মল্লিকার সঙ্গে সকলের সম্বন্ধ ক্রমেই যখন সঙ্কটের মুখে—তখন তাহার এক জ্ঞাতি ননদ হঠাৎ আবিষ্কার করিয়া ফেলিল—মল্লিকা ইংরাজি পড়িয়াছে। সে তখনি দৌড়াইয়া গিয়া প্রচার করিয়া দিল—বৌদি ইংরাজি পড়ে। দেখিতে দেখিতে কথাটা গ্রামময় রাষ্ট্র হইয়া গেল—চৌধুরীদের নূতন বউ ইংরাজি পড়ে! সংবাদটা নানা মুখ ঘুরিয়া অবশেষে শশাঙ্কর কানে আসিয়া পৌঁছিল। সে রাত্রিবেলা মল্লিকাকে পুছিল—মল্লি, তুমি নাকি ইংরাজি পড়ো?

মল্লিকা বলিল—হাঁ।

কিন্তু মল্লিকা যেমন আশঙ্কা করিয়াছিল শশাঙ্ক রাগ করিল না—বরঞ্চ যেন খুশি হইল।

শশাঙ্ক বলিল—কি বই? ফার্ষ্ট বুক? আমিও ওই বই দিয়ে পড়া সুরু করেছিলাম। তুমি কি বই পড়ছিলে?

মল্লিকার বইয়ের নাম প্রকাশ করিবার ইচ্ছা ছিল না—কিন্তু স্বামীর পীড়াপীড়িতে বইখানা বাহির করিতে হইল। শশাঙ্ক দেখিল—ফার্ষ্ট বুক নয় ছোট ছোট অক্ষরে ঠাসা পাতা—বেশ মোটা বই—ডিকেন্সের ডেভিড কপারফিল্ড। শশাঙ্ক গিন্নীর ইংরাজি জ্ঞানে চমৎকৃত হইয়া গেল—এবং পরদিনই বন্ধুবান্ধব ও আত্মীয়স্বজনের কাছে গিয়া নিজে পত্নীর লেখাপড়া প্রচার করিবার ভার লইল। ইহার ফলে মল্লিকার অবস্থা আরও শোচনীয় হইয়া উঠিল। একে তো চৌধুরী

বাড়ীর বউয়ের পক্ষে ইংরাজি পড়া প্রথাবিরুদ্ধ—তার উপরে তাহার স্বামী এই কাজের সহায়। শশাঙ্ক যদি মল্লিকাকে তিরস্কার করিত—তবে সকলে খুসি হইত—কিন্তু ইহাতে হিতে বিপরীত ঘটিল।

শশাঙ্ক সন্ধ্যাবেলা হঠাৎ ঘরে প্রবেশ করিয়া দেখিল, মল্লিকা একা বসিয়া কাঁদিতেছে। শশাঙ্ক তাহাকে কত সাধ্য সাধনা করিল—কান্নার কারণ মল্লিকা বলিল না। কি বলিবে, কেন এই কান্না নিজেই ভাল করিয়া জানে না। কোন উত্তর না পাইয়া শশাঙ্ক বলিল—মল্লি তোমার কি এখানে মন টিঁকছে না?

মল্লিকা ঘাড় নাড়িয়া সম্মতি জানাইল। শশাঙ্ক বলিল—চলো আমরা কোথাও বেড়াতে যাই। মল্লিকা খুশি হইয়া উঠিল। শশাঙ্ক বলিল—এখন বেশ গরম পড়েছে, চলো দার্জ্জিলিং যাওয়া যাক্। এবারে মল্লিকার মুখে হাসি ফুটিল।

পরদিন শশাঙ্ক মাতার কাছে প্রস্তাব করিল যে, সে দার্জ্জিলিং যাইতে চায়। অম্বামরী পরম্পরায় শুনিয়াছিলেন ধনীর ছেলেরা দার্জ্জিলিং-এ যায়; কাজেই তিনি বলিলেন, বেশ তো ষ্টেশন থেকে ঘোড়ার গাড়ী আনিয়ে নিয়ে যাওনা বাবা।

শশাঙ্ক বলিল—পাল্কীও লাগবে যে।

বিস্মিত অম্বামরী বলিল—পাল্কী লাগবে কেন?

শশাঙ্ক বলিল—মল্লিকাও যাবে।

অম্বামরীর মাথায় বিস্ময়ের আকাশ ভাঙিয়া পড়িল। মল্লিকার ইংরাজি পড়ার কথায় তিনি রাগ করেন নাই—কারণ যে বধূকে তিনি একার দায়িত্বে নির্বাচন করিয়াছেন, সে যে আর পাঁচজনের চেয়ে শ্রেষ্ঠ—ইহাতে তাঁহারি গৌরব। কিন্তু চৌধুরী বাড়ীর বধূ স্বামীর সঙ্গে দার্জিলিং যাইবে! অম্বামরী নির্বোধ নন। তিনি বুঝিলেন হাসিমুখে অনুমতি না দিলে শুষ্কমুখে পুত্র ও পুত্রবধূর দার্জিলিং যাত্রার অসম্মত সাক্ষ্য বহন করিয়া তাঁহাকে অপমান সহ্য করিতে হইবে। কাজেই তিনি বলিলেন—বেশ তো বউমাও ঘুরে আসুক না কেন। অম্বামরী দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিয়া বুঝিতে পারিলেন—এতদিনে মাতার অঞ্চল হইতে বধূর অঞ্চলে শশাঙ্কর সংক্রান্তি ঘটিয়াছে। তিনি দাঁতে দাঁতে চাপিয়া মুখ বুজিয়া রহিলেন। পুত্রস্নেহচোর বধূর প্রতি তিনি হাড়ে চটিয়া গেলেন।

দার্জিলিং-এর স্নিগ্ধ শুশ্রূষার মধ্যে আসিয়া মল্লিকার সমস্ত গ্লানি মুছিয়া গেল। সংসারের সব গ্লানির উপরে সুধার প্রলেপ দিবার জন্যেই তো দিকে দিকে উত্তুঙ্গ শৃঙ্গের সুধার তুলি উদ্যত করিয়া গিরিরাজ এত আড়ম্বর করিয়াছেন। কুয়াশায়

সিক্ত অঞ্চলখানা সেই জন্যেই মানুষের মনের উপর দিয়া তিনি এতবার করিয়া বুলাইয়া দেন—মুছিয়া যাক সব তাপ, ঘুচিয়া যাক্ সব দাহ। এখানেও যে সান্ত্বনা না পায়—সে সত্যই দুর্ভাগা। মল্লিকা আর শশাঙ্ক সারাদিন ঘুরিয়া বেড়ায়। ধাপে ধাপে পাহাড় নামিয়া গিয়াছে, যাহার নিম্নতম প্রান্তে প্রবল স্রোতস্বিনী—গর্জনের দ্বারা মাত্র অনুমানগম্য। উঁচু উঁচু থাকে বলিষ্ঠ বৃক্ষরাজি উঠিতে উঠিতে আকাশকে প্রায় ছুঁইয়া দিয়াছে আর কি—যেখানে পরীদের খেলার ঘড়ির মতো পাণ্ডু চাঁদখানা ঝুলিয়া আছে! সর্পিল পথ, গভীর উপত্যকা, উচ্চ শৃঙ্গ—এসব কি কল্পনায় পাইবার? এমন ঘন শ্যামলতা আর এমন ফুলের বৈচিত্র্য! আর এই স্বর্গীয় রঙ্গমঞ্চে আলো-ছায়ার অর্ধ-নারীশ্বরের যে অন্তহীন অভিনয় চলিতেছে, কুয়াশার মলমল তাহার উপরে অঙ্কে অঙ্কে যবনিকা টানিয়া দেয়! মল্লিকা ভাবে এই রহস্য, এই সৌন্দর্য, এ কি এই জগতেরই অন্তর্গত, না তাহারা এমন এক স্থানে আসিয়া পড়িয়াছে—যেখান হইতে আভাসে অন্য এক জগতের এই সব ছবি দৃশ্যমান? মল্লিকা মুগ্ধ হইয়া গেল। শশাঙ্ক খুশি হইল। দুইমাস কাটাইয়া তাহারা আবার দেশে ফিরিয়া আসিল।

(৩)

শশাঙ্ক ও মল্লিকা ফিরিয়া আসিলে প্রথমেই সকলের চোখে যে পরিবর্তনটা ধরা পড়িল—শশাঙ্কর শরীর খারাপ। সে কৃশ ও কেমন যেন রক্তশূন্য! তবে নাকি দার্জিলিঙে গেলে শরীর ভালো হয়! যাহারা কখনো দার্জিলিঙে যায় নাই—আর যাইবারও যাহাদের বিন্দুমাত্র সম্ভাবনা নাই—তাহারা শশাঙ্কর দৃষ্টান্তে দার্জিলিং না যাইবার স্থির সিদ্ধান্ত করিয়া ফেলিল। অথচ ইহার ঠিক বিপরীত প্রমাণ মল্লিকা গালে ও দেহে সংগ্রহ করিয়া আনিয়াছিল তাহা কেহ দেখিয়াও দেখিল না।

অম্বাময়ী কাতর হইয়া বলিলেন—এ কি বাবা, তোর শরীর এত খারাপ হ'ল কেন?

শশাঙ্ক বলিল—ওখানে পাহাড়ে ওঠানামা করতে গেলে শরীর একটু খারাপ হয়। ও কিছু নয়।

অম্বাময়ী বলিলেন—সে আবার কি কথা! দেওঘরের বাড়িতে চারতলা থেকে একতলায় দিনের মধ্যে কতবার ওঠানামা করেছিস, কই তোর শরীর তো খারাপ হয়নি!

যাই হোক অম্বাময়ী চিন্তিত হইয়া পুত্রের চিকিৎসার ব্যবস্থা করিলেন কিন্তু তাহার শরীরের বিশেষ উন্নতির লক্ষণ দেখা গেল না। ওই সঙ্গে মল্লিকার শরীরটাও যদি সমান খারাপ হইত তবে হয়তো এ পরিবর্তন তেমন করিয়া কাহারো চোখে পড়িত না—কিম্বা পড়িলেও কেহ কিছু মনে করিত না। এখন শশাঙ্কর পরিজন বিশেষ করিয়া তাহার মাতা বধূর উপরে ক্রুদ্ধ হইলেন। পৃথিবীর মধ্যে এক বাংলাদেশেই বোধ করি শরীর ভালো হওয়াটা অমার্জনীয় অপরাধ।

পূজার পরে অম্বাময়ী স্থির করিলেন এবারে দেওঘরে না গিয়া কাশী যাইবেন। তিনি শশাঙ্ককে বলিলেন—বাবা আমাকে কাশী নিয়ে চল্।

শশাঙ্ক কি যেন বলিতে যাইতেছিল, অম্বাময়ী বলিলেন—না, না, বিদেশে বৌটাকে নিয়ে গিয়ে কষ্ট দিতে চাইনে। সে থাকুক। আর আমরা তো বেশি দিন ওখানে থাক্‌বো না।

আসলে বৌমার কষ্টটা নিতান্তই অবান্তর। বধূ যে পুত্রকে টানিয়া লইয়া দার্জিলিং গিয়াছিল—ইহা তাহারই উত্তর। অম্বাময়ী দেখাইয়া দিতে চান—পুত্রের উপরে এখনো তাঁহার পূর্ববৎ অধিকার আছে। বধূ যদি তাহাকে মার কাছ হইতে টানিয়া লইয়া দার্জিলিং যাইতে পারে—তবে মাতাও তাহাকে বধূর কাছে হইতে টানিয়া কাশী লইয়া যাইতে সক্ষম। শশাঙ্ক তাঁহার সঙ্গে যাইবে, মল্লিকা যাইবে না, এই চিন্তাতেই তিনি উৎফুল্ল বোধ করিলেন—এমন কি পুত্রবধূর সঙ্গে অনেক দিন পরে এক আধটা কথাও বলিয়া ফেলিলেন।

অম্বাময়ী ও শশাঙ্ক কাশী পৌঁছিলে পরিচিত আত্মীয়স্বজন দেখা করিতে আসিল। তাহারা আসিয়া সকলেই একবাক্যে জানাইল অম্বাময়ীর শরীর বিশেষ খারাপ হইয়া গিয়াছে। প্রথমতঃ, কথাটা সত্য নয়, দ্বিতীয়তঃ ওটা একটা অভ্যর্থনার অর্থহীন প্রথামাত্র। উভয় পক্ষেই জানে কথা অমূলক তবু বলিতে হয়—ওটা ভদ্রতা। কিন্তু সত্যটাও তাহাদের চোখ এড়াইল না। শশাঙ্কর শরীর যে অতিশয় কৃশ হইয়া পড়িয়াছে তাহা লক্ষ্য করিয়া সকলেই উদ্বেগ অনুভব করিল।

এই সব আত্মীয়স্বজনের মধ্যে একজন নিস্তারিণী দেবী। ইনি শশাঙ্কর দূরসম্পর্কিত পিসি। এক সময়ে নিস্তারিণী দেবী শশাঙ্কদের সংসারেই থাকিতেন—এখন তাহাদেরই প্রদত্ত মাসোহারায় কাশী বাস করেন। তিনি শশাঙ্কর কৃশতা দেখিয়া একপ্রকার ডুকরিয়া উঠিলেন—ও বৌদি এ কি সর্বনাশ তুমি করেছ! সোনার চাঁদ যে শেষ হয়ে গিয়েছে।

নিস্তারিণীর প্রতিকূল সমালোচকগণ বলিতে পারেন যে, তাঁহার স্বরের উচ্চতার উপরে মাসোহারার স্থায়িত্ব নির্ভর করিতেছে—কিন্তু তাহা ছাড়া কিছু আন্তরিকতা থাকাও অসম্ভব নয়।

নিস্তারিণী পুছিলেন—কবে থেকে এমন হ'ল? অম্বাময়ী বলিলেন, বিয়ের পর থেকেই তো চোখে পড়ছে।

বলা বাহুল্য কথাটা মিথ্যা। কিন্তু যে পুত্রবধূর উপরে তিনি রুষ্ট তাহার উপরে স্বভাবতঃই দোষটা চাপাইয়া দিলেন। নিস্তারিণীরও কথাটা মনে লাগিল। কারণ শশাঙ্কর বিবাহে তিনি নিমন্ত্রিত হইয়াও যাইবার রাহা খরচ পান নাই—সেজন্য গোড়া হইতেই তিনি বধূকে দোষী করিয়া রাখিয়াছিলেন। কাজেই এখন অম্বাময়ীর কথা শুনিবামাত্র তাঁহার মনে হইল শশাঙ্কর যে শরীর খারাপ তাহার জন্য মল্লিকাই দায়ী।

অম্বাময়ী বলিলেন, সেই জন্যেই তো শশাঙ্ককে নিয়ে পশ্চিমে এসেছি, দেখি যদি তাহার শরীরটা সারে। নিস্তারিণী সেদিন আর কোন কথা বলিলেন না—সেদিনের মতো উঠিয়া পড়িলেন।

দু'চার দিন পরে আবার নিস্তারিণী আসিলেন। বিশ্বনাথের মহিমা, ব্যাসকাশীর ইতিহাস, বাজার দর প্রভৃতি যে কয়েকটি অত্যাবশ্যক আলোচ্য বিষয় আছে তাহার সমালোচনা অন্তে নিস্তারিণী দেবী বলিলেন, হাঁ বৌদি, এ কয়দিন আমি শশাঙ্কর কথা ছাড়া আর কিছু ভাবতে পারিনি। সোনার চাঁদের শরীর যে এমন কাহিল হ'য়ে গেল এর তো একটা বিহিত করতে হবে।

অম্বাময়ী বলিলেন—সেইজন্যেই তো, বোন পশ্চিমে আসা!

নিস্তারিণী বলিলেন—পশ্চিমে এসেছ ভালই করেছ। কিন্তু এত জায়গা থাকতে বাবা বিশ্বনাথ নিজ ক্ষেত্রে টেনে আনলেন কেন? এ বাবার দয়া ছাড়া আর কিছু নয়।

বাবার দয়াতে অম্বাময়ীর কিছুমাত্র সংশয় ছিল না, কিন্তু ঠিক কি আকারে সে দয়া প্রকাশিত হইবে না বুঝিতে পারিয়া জিজ্ঞাসুভাবে তিনি নীরব হইয়া রহিলেন।

তখন নিস্তারিণী গলা খাটো করিয়া সুরু করিলেন, চৌষট্টিঘাটের কাছে এক ব্রহ্মচারী মাতা থাকেন—একেবারে ভূতভবিষ্যৎ-বর্ত্তমান ত্রিকালদর্শী। কত লোক যে তাঁহার প্রসাদে বিপদোত্তীর্ণ হইয়াছে তার সীমা সংখ্যা নাই—এই বলিয়া কয়েকটি দৃষ্টান্তের উল্লেখ করিলেন। এবং অবশেষে মন্তব্য প্রকাশ

করিলেন—একবার তাঁহার কাছে গেলে হয় না—কারণ চিকিৎসাশাস্ত্র ও পশ্চিমের জল হাওয়া স্বাস্থ্যদায়ক বটে, কিন্তু বাবার দয়া ও ব্রহ্মচারী মাতার শক্তির কাছে কিছুই কিছু নয়।

অম্বাময়ীর এরূপ আধিদৈবিক চিকিৎসায় আপত্তি হইবার কথা নয়, বিশেষ পুত্রের মঙ্গল কামনা করিয়া তিনি অবিলম্বে রাজি হইলেন। স্থির হইল পরদিন উভয়ে ব্রহ্মচারী মাতার কাছে যাইবেন।

চৌষট্টিঘাটের কাছে এক ভাঙা দোতালা বাড়ীতে ব্রহ্মচারী মাতা থাকেন। পরদিন অম্বাময়ী ও নিস্তারিণী যখন তাঁহার কাছে গিয়া উপস্থিত হইলেন তাঁহার সন্ধ্যাহ্নিক শেষ হইয়াছে বটে, কিন্তু তখনও আসন ছাড়িয়া ওঠেন নাই। দুজনে ভূমিষ্ঠ হইয়া প্রণাম করিলেন—অম্বাময়ী পায়ের কাছে মোটা প্রণামীর টাকা রাখিলেন। অম্বাময়ী তাঁহার মুখের দিকে চাহিয়া স্তব্ধ বিস্ময়ে দেখিলেন—হাঁ প্রকৃতই ব্রহ্মচারিণী বটেন—মাথার জটা হইতে পা পর্যন্ত আধিদৈবিক ক্ষমতায় দেদীপ্যমান। মাতার যেমন বিরাট চেহারা, তেমনি বিশাল মুখমণ্ডলে ভাঁটার মতো দুটি চোখ, মাথার জটা পিঠ ঢাকিয়া মাটিতে লুণ্ঠিত, গলায় থাকে থাকে ছোট বড় রুদ্রাক্ষের একরাশ মালা, কপালে সিঁদুরের ছাপ, পরিধানে গেরুয়া, পাশে রক্ষিত রক্তবর্ণ ত্রিশূল—সম্মুখে রক্তজবার এবং রক্তচন্দনের পূজার উপকরণ—পাশে নরকপালে কারণবারি।

তিনি বলিলেন—শুভমস্তু!

হাঁ—দেহের অনুরূপ কণ্ঠস্বর। মনে বিন্দুমাত্র সংশয় থাকিলে তাঁহার কণ্ঠ চাপিয়া মুহূর্তে বিনাশ করিবার মতো তাঁহার প্রবল প্রচণ্ডতা।

অম্বাময়ী চুপ করিয়া থাকিলেন আর নিস্তারিণী তাঁহাদের আগমনের কারণ ও উদ্দেশ্য বর্ণনা করিয়া গেলেন। সব শুনিয়া ব্রহ্মচারী মাতা তাহাদিগকে আগামী শনিবারে পুনরায় আসিতে বলিলেন—ইতিমধ্যে তিনি সমস্ত সমস্যার নাকি মীমাংসা করিয়া রাখিবেন।

শনিবারের পরে মঙ্গলবার, মঙ্গলবারের পরে অমাবস্যা—এমনি করিয়া বিশেষ বিশেষ তিথিতে ও বারে দুইজনে ব্রহ্মচারী মাতার কাছে যাতায়াত করিতে লাগিলেন এবং প্রতিবারেই অম্বাময়ী মাতাকে মোটা প্রণামী দিতে লাগিলেন। অবশেষে মাতা তপস্যার্জিত বুদ্ধিবলে বুঝিলেন—অতঃপর নীরব হইয়া থাকিলে ভক্তের সরিয়া পড়িবার সম্ভাবনা—কাজেই একদিন শনিবার অমাবস্যা তিথিতে তিনি অম্বাময়ীর সমস্যার স্বরূপ বিশ্লেষণ করিয়া বলিয়া দিলেন।

ব্রহ্মচারী মাতা অম্বাময়ীকে লক্ষ্য করিয়া বলিলেন—বাছা, তোমার পুত্রবধূর ডাকিনীর অংশে জন্ম। ডাকিনীর অংশে যে-সব স্ত্রীলোকের জন্ম তাহারা স্বামিহন্ত্রী হয়। তাহাদের প্রভাবে স্বামীরা ধীরে ধীরে শুকাইয়া মারা যায়। স্বামী যতই শুকাইয়া আসিতে থাকে ডাকিনী ততই স্বাস্থ্যবতী ও সুন্দরী হইয়া ওঠে।

অম্বাময়ী মনে মনে লক্ষণ মিলাইয়া লইতে লাগিলেন—সবই তো সত্য বটে। শশাঙ্ক কৃশ হইতে কৃশতর হইতেছে—মল্লিকার স্বাস্থ্য ও রূপ অনেক বাড়িয়া গিয়াছে। পুত্রের অবস্থা স্মরণ করিয়া তাঁহার চোখ ছল ছল করিয়া আসিল।

ডাকিনীর অংশে জন্ম বলিতে কি বুঝায় ব্রহ্মচারী মাতা তাহার ব্যাখ্যা করিতে লাগিলেন। শনি মঙ্গলবারে, অমাবস্যা তিথিতে কামরূপ কামাখ্যা হইতে ডাকিনীর হাড় গভীর রাত্রে আকাশ পথে উড়িয়া শ্রীক্ষেত্রে যায়। ঠিক সেই মুহূর্তে তাহার গতিপথের নীচে কোন কন্যা ভূমিষ্ঠ হইলে ডাকিনী তাহাকে ভর করে। তাহার মধ্যে ডাকিনীর অংশ আসিয়া জোটায়। এরূপ কন্যার মাতা প্রায়ই জীবিত থাকে না।

অম্বাময়ী দেখিলেন—কথা ঠিক। মল্লিকার মাতা তাহার জন্মের কিছুদিন পরেই মারা গিয়াছিল। অম্বাময়ী কাঁদিয়া ফেলিয়া বলিলেন—মাতাজী, এখন তুমি উপায় করিয়া দাও।

মাতাজী হাসিয়া তাঁহাকে সান্ত্বনা দিয়া বলিলেন—বাছা তোমার ভয় নাই। আমার কাছে ডাকিনী যোগিনী সবাই জব্দ—কারণ আমি কামরূপ কামাখ্যায় গিয়া দীর্ঘকাল তপস্যা করিয়া ডাকিনী সিদ্ধ হইয়াছি। আমি এখন মন্ত্রপূত আধিদৈবিক ঔষধের ব্যবস্থা করিয়া দিব যাহাতে তোমার পুত্রবধূকে পরিত্যাগ করিয়া ডাকিনীর অংশ পলায়ন করিবে, তোমার পুত্রের পুনরায় স্বাস্থ্যোদ্ধার ঘটিবে। কিন্তু তার জন্যে তোমার পুত্রকে একবার এখানে লইয়া আসা দরকার —কারণ তাহাকে সজ্ঞানে স্বয়ং এই ঔষধ পুত্রবধূর হাতে বাঁধিয়া দিতে হইবে।

অম্বাময়ী এই প্রস্তাবে প্রমাদ গণিলেন। শশাঙ্ক নিশ্চয় এসব কথা বিশ্বাস করিবে না—আর একটা গণ্ডগোল করিয়া মহা অনর্থের সৃষ্টি করিবে।

অম্বাময়ী বলিলেন—মাতাজী—আজকালকার ছেলেদের মতিগতি বুঝিয়া ওঠা দুস্কর—তাহাদের নাস্তিক বলিলেই চলে। তাহারা কি এসব দৈব ব্যাখ্যায় বিশ্বাস করিবে?

মাতাজী নরকপাল হইতে খানিকটা পানীয় গলাধঃকরণ করিয়া বলিলেন—

বাছা সেজন্য তুমি ভাবিও না। মহাশক্তির কৃপায় আমি এমন ক্ষমতা লাভ করিয়াছি যে মহানাস্তিকেও আমার প্রভাব লঙ্ঘন করিতে সমর্থ নয়। তোমার পুত্রকে আনিও, আমি যাহা বলিব—তাহাই সে বিশ্বাস করিবে।

বাস্তবিক ঘটিলও তাই। মাতার সঙ্গে কয়েকদিন ব্রহ্মচারিণীর কাছে যাতায়াতের পরে শশাঙ্কও বিশ্বাস করিয়া ফেলিল যে, তাহার পত্নীর ডাকিনীর অংশে জন্ম—সেইজন্যই তাহার শরীর খারাপ হইয়া যাইতেছে। ব্রহ্মচারী মাতার প্রদত্ত ঔষধ পত্নীর হাতে বাঁধিয়া দিলে তাহাদের উভয়েরই মঙ্গল। শশাঙ্ক এই কাজে সম্মত হইল—কতকটা বা পত্নীর মঙ্গল কামনায়, কতকটা বা নিজের ইষ্ট চিন্তায় কতকটা মায়ের কান্নাকাটিতে, কতকটা ব্রহ্মচারিণীর ব্যক্তিত্বের প্রভাবে।

মানুষ একান্তই ঘটনাচক্রের দাস। কে কি বিশ্বাস করিবে, কে কি কাজ করিবে তাহার খুব সামান্য অংশই নিজের ব্যক্তিত্বের উপরে নির্ভর করে। ঘটনার ব্যক্তিত্বের কাছে তাহার নিজের ব্যক্তিত্ব অতিশয় দুর্বল। তার উপরে আবার শশাঙ্ক চিরদিন দুর্বল প্রকৃতির জীব—মাতার আশ্রয়ে থাকায় তাহার নিজের ইচ্ছা অনিচ্ছা সাবালকত্ব লাভ করিতে পারে নাই।

ব্রহ্মচারিণী মন্ত্রপূত সিন্দুর লিপ্ত মটরদানার মতো একটি বস্তু দিলেন। ইহা বধূর বামহস্তে বাঁধিয়া দিতে হইবে। মাতাপুত্রে যুক্তি করিয়া স্থির করিল, মল্লিকার জন্য এক জোড়া অনন্ত গড়িয়া লইয়া যাইবে, যাহার বাম হাতেরটির মধ্যে মটরদানাটি ভরিয়া দেওয়া থাকিবে। কাজেই মল্লিকার জানিবার কোন সম্ভাবনা থাকিবে না—অথচ কাজ উদ্ধার হইয়া যাইবে।

মাতাপুত্র ও নিস্তারিণী দেবী তিনজনে এইরূপ পরামর্শ করিলেন। নির্দেশ-মতো অনন্ত গড়া হইল—এবং তন্মধ্যে ব্রহ্মচারিণীর ঔষধ ভরিয়া দেওয়া হইল। এইবার তাঁহারা প্রফুল্লচিত্তে দেশে রওনা হইলেন—সঙ্গে নিস্তারিণী দেবীও চলিলেন।

(৪)

মাঝ রাত্রে শশাঙ্ক ঘুম ভাঙ্গিয়া উঠিয়া দেখিল শুভ্র কোমল শয্যার একান্তে মল্লিকা পড়িয়া ঘুমাইতেছে—জানলা দিয়া অবারিত জ্যোৎস্নার ধারা আসিয়া তাহার সর্বাঙ্গে পড়িয়াছে—শুভ্র শয্যায় শুভ্রতরা রমণী—রজনীগন্ধার বনে মূর্ছিত জ্যোৎস্না। এই মল্লিকাই কি ডাকিনী? তাহার বিশ্বাস হইল না। সেদিন ব্রহ্মচারিণীর কাছে যাহা বিশ্বাস করিতে দ্বিধা হয় নাই—আজ তাহা মিথ্যার চেয়েও মিথ্যা মনে হইল। না এ হইতেই পারে না। কিন্তু তবু তো সে এই

বিশ্বাসের বশেই কাজ করিয়াছে—এই বিশ্বাসের বশেই ঔষধভরা অনন্ত জোড়া তাহাকে পরাইয়া দিয়াছে।

কাশী হইতে ফিরিয়া অনন্ত জোড়া মল্লিকার হাতে দিয়া শশাঙ্ক বলিয়াছিল—পরো, নূতন ডিজাইনের অলঙ্কার।

মল্লিকা পুছিয়াছিল—আচ্ছা এর নাম অনন্ত কেন?

শশাঙ্ক বলিয়াছিল—দেখ্‌ছ সাপের আকারে গড়া—সাপের নাম যে অনন্ত। তারপর বলিয়াছিল—এ যে আমার অনন্ত ভালবাসার প্রতীক।

মল্লিকা বলিল—অনন্ত, তবু অন্ত আছে। তারপর দীর্ঘ নিঃশ্বাস ফেলিয়া বলিয়াছিল—কোন্‌ ভালবাসার বা অন্ত নাই!

সে কি তখন স্বপ্নেও জানিত ওই অনন্ত কি বিষম বিষ বহন করিয়া তাহার বাহুযুগলকে জড়িত করিল?

শশাঙ্কর চোখে সেই অনন্ত জোড়া পড়িল। ইচ্ছা করিল টান মারিয়া তাহা খুলিয়া ফেলে—ইচ্ছা করিল সকল কথা তাহাকে বলিয়া মার্জনা চায়। কিন্তু দুর্বল প্রকৃতির পক্ষে কিছুই করা সম্ভব হইল না—বধূর পাশে শুইয়া পড়িল। তাহাকে নিকটে টানিতে গেলে ঘুমের মধ্যে মল্লিকার বাহু তাহাকে আঘাত করিল—বাম হাতের অনন্ত অতর্কিতে তাহাকে জোরে লাগিল। শশাঙ্ক তাকাইয়া দেখিল অনন্তের লাল পাথর বসানো চোখ জ্যোৎস্নায় সাপের চোখের মতো জ্বলিতেছে। শশাঙ্ক দূরে সরিয়া ঘুমাইয়া পড়িল।

শশাঙ্কদের সংসারে তাহাদের দূরসম্পর্কিত এক পিতৃ-মাতৃহীন অনাথ বালিকা প্রতিপালিত হইত। কালো মোটাসোটা মেয়েটি, মুখ কৌতুক-কৌতূহলে ভরা। তাহার সঙ্গে মল্লিকার সবচেয়ে বেশি স্নেহের সম্পর্ক ছিল। সে যে নিজে ওর মতই পিতৃমাতৃহীন। মেয়েটির নাম ফড়িং। মল্লিকা তাহাকে আদর করিয়া ডাকিত—কুমড়ো। সন্ধ্যা হইলেই কুমড়ো তাহার শয্যায় আসিয়া আশ্রয় লইত মল্লিকা মাসি একটা গল্প বলো।

সেদিন কুমড়ো আসিয়া বলিল—মল্লিকা মাসি একটা গল্প বলো—তোমাদের দেশের গল্প। মল্লিকা কলিকাতার গল্প বলিতে উদ্যত হইলে কুমড়ো বলিল—ও গল্প নয়, তোমার দেশের গল্প।

মল্লিকা হাসিয়া বলিল—কেন কল্‌কাতাই তো আমার দেশ।

কুমড়ো মাথা নাড়িয়া বলিল—না, আমি শুনেছি তোমার দেশ অন্যখানে।

বিস্মিত মল্লিকা বলিল—অন্যখানে কোথায় আবার?

কুমড়ো বলিল—হুঁ, ফাঁকি দিলে চলবে না—তোমার দেশ কামরূপ কামিখ্যে!

এবারে মল্লিকা হাসিয়া ফেলিল—বলিল ও-কথা আবার কে বললে?

কুমড়ো বলিল—কেন সবাই তো জানে—সবাই তো বলে। তোমার বাড়ী কামরূপ কামিখ্যে—তুমি ডাকিনী! তারপরে থামিয়া বলিল—আচ্ছা মাসি ডাকিনীরা নাকি আকাশ দিয়ে চলে? তুমি আকাশ দিয়ে যদি উড়ে যেতে পারো তবে দার্জিলিং যাবার সময়ে পাল্কী করে গেলে কেন?

মল্লিকা বলিল—দুর পাগলি আমি ডাকিনী হতে যাবো কেন?

কুমড়ো বুঝিল, মাসির এখানে তাহাকে ফাঁকি দিবার ইচ্ছা। ডাকিনী-জীবনের পরম লোভনীয় গল্পগুলি না শুনিতে পারিলে আর মাসির প্রিয়পাত্র হইয়া লাভ কি?

সে বলিল—কাশী থেকে ওই যে বুড়ি এসেছে সে সব কথা বলেছে। তুমি ডাকিনী—মানুষের রূপ ধরে আছো। রাতের বেলায় সকলে ঘুমোলে ছাদ ফুটো করে একখানা হাড় হ'য়ে আকাশ দিয়ে শ্রীক্ষেত্রে চলে যাও—আবার ভোরবেলা ফিরে এসে মানুষ হ'য়ে ঘুমিয়ে থাকো।

ইহা শুনিয়া মল্লিকা হাসিবে কি কাঁদিবে স্থির করিতে না পারিয়া বলিল—ছি কুমড়ো—ও কথা বলতে নেই। তোমার মেসো মশাই শুনলে রাগ করবেন।

কুমড়ো বলিল—রাগ করবেন না ছাই। তুমি ভাবছো মেসো মশাই জানেন না। তিনিও জানেন। তিনিই তো তোমাকে ওষুধ পরিয়ে দিয়েছেন!

মল্লিকা বলিল—ওষুধ আবার কই?

—কেন ওই অনন্ত জোড়া—ওরই বাঁ হাতেরটিতে বাবা বিশ্বনাথের ওষুধ ভরা আছে। পাছে তুমি জান্‌তে পারো ব'লে অনন্তের মধ্যে ভ'রে দেওয়া হ'য়েছে।

মল্লিকা বিস্ময়ে, ক্রোধে, হতাশায় চুপ করিয়া রহিল। গল্প জমিবার আশা নাই দেখিয়া ক্ষুণ্ণ মনে কুমড়ো প্রস্থান করিল।

মল্লিকা ডাকিনী—শশাঙ্ক একথা বিশ্বাস করে—অনন্তের মধ্যে ওষুধ ভরা—সব কেমন বিপর্যয়কর ঘটনা। একমুহূর্তে চিরদিনের চেনা পৃথিবী যেন ওলট-পালট হইয়া গেল!

কাশী হইতে শশাঙ্কদের প্রত্যাবর্তনের পরে যে-সব ঘটনা ঘটিয়াছে এতক্ষণে সে-সব নূতন অর্থে তাহার চোখে নূতন আকার ধারণ করিল।

তাহার মনে পড়িল নিস্তারিণী বুড়ি গোড়া হইতে তাহাকে ভাল চোখে দেখে নাই। সে পারৎপক্ষে মল্লিকার সঙ্গে কথা বলিত না। কিন্তু অন্যদের সঙ্গে

মল্লিকার কথা যে বলিত তাহাতে সন্দেহ নাই—কারণ মল্লিকা আসিয়া পড়িলেই চুপ করিয়া যাইত—সকলের সঙ্গে একটা অর্থভরা ইসারার বিনিময় হইত। বাড়ীর ছোট ছেলেমেয়েদের তাহার কাছে আসা বন্ধ হইয়া গিয়াছিল। পাশের বাড়ীর ছোট ছেলেটিকে একবার সে কোলে লইয়াছিল অমনি তাহার মা ছুটিয়া আসিয়া কোন কথা না বলিয়া ছেলেটাকে ছিনাইয়া লইয়া চলিয়া গেল—অথচ কাশী হইতে ইহারা ফিরিবার আগে ছেলেটা সারাদিন মল্লিকার কাছেই থাকিত। ঠাকুর ঘরে মল্লিকার প্রবেশ একপ্রকার নিষেধ হইয়া গিয়াছিল—ঢুকিতে গেলেই অম্বাময়ীর সতত-সতর্ক চোখ তাহা ধরিয়া ফেলিত—অমনি হুকুম হইত—বৌমা ওদিকে আবার কেন? কিম্বা ওখানে তোমার কি দরকার বৌমা!

সে স্তম্ভিত হইয়া ভাবিতে লাগিল—এ আবার কি রকম বিপদ? কিসে ইহার, সমাধান, কোথায় ইহার সান্ত্বনা? শশাঙ্কও নাকি তাহার ডাকিনীত্বে বিশ্বাসী!

বাড়ীর মধ্যে প্রাচীর ঘেরা একটি ফুল বাগান ছিল, কেহ যত্ন লইত না বলিয়া জঙ্গল হইয়া গিয়াছিল—কোন গাছে কখনো বা ফুল ধরিত, কখনো ধরিত না। শশাঙ্ক কাশী বেড়াইতে গেলে সময় কাটাইবার জন্য মল্লিকা সেই বাগেনের যত্ন লইত। বাগানের একান্তে একটা জবা গাছ ছিল। গাছটায় ফুল ধরিত না। মল্লিকার যত্ন ও জল পাইয়া গাছটা অজস্র ফুলে ভরিয়া গেল। মল্লিকা বলিল—ভালই হ'ল, মা কাশী থেকে ফিরলে জবাফুলের অভাব হবে না। কিন্তু অম্বাময়ী ফিরিবার পরও সে ফুল পূজার জন্য সংগৃহীত হইত না। মল্লিকা একদিন শাশুড়ীকে ওই ফুল লইবার জন্য বলিয়াছিল—শাশুড়ী কোন উত্তর দেন নাই—তার পরিবর্তে নিস্তারিণী বুড়ী উত্তর দিয়াছিল—ও ফুল অশুচি—পূজায় দিতে নেই। তখন মল্লিকা ভাবিয়াছিল কাশীবাসিনী হয়তো পূজার পুষ্প নির্বাচনের এমন কোন গূঢ় রহস্য জানে—যাহা তাহার জানা নাই। কিন্তু আজ সে স্পষ্ট বুঝিতে পারিল ডাকিনীর যত্নে-ফোটা ফুল দেবপূজায় নিষিদ্ধ!

কিন্তু শশাঙ্কও যে এই নিদারুণ মিথ্যায় বিশ্বাসী, এই কথাটা তাহার মর্মে নিরন্তর খোঁচা দিতে লাগিল।....কিন্তু সত্যই কি সে তাহাকে ডাকিনী বলিয়া বিশ্বাস করে?....দুর ছাই, এত চিন্তায় কাজ কি? হাতেই তো প্রমাণ আছে। কুমড়ো বলিল—বাম হাতের অনন্তের মধ্যে ডাকিনী তাড়াইবার ঔষধ বর্তমান। কুমড়ো এসব কথা কাণা-ঘুষায় না শুনিলে বলিবে কেমন করিয়া?

মল্লিকা একটা নোড়া সংগ্রহ করিয়া ঘরের দরজা বন্ধ করিয়া দিল। তারপরে

অনন্ত জোড়া খুলিয়া বাম হাতেরটিতে সবলে আঘাত করিল—এক আঘাতেই অনন্ত ভাঙিয়া গিয়া ভিতর হইতে সিন্দুর লিপ্ত একটা মটরদানার মতো বস্তু বাহির হইয়া আসিল। সেই বস্তুটিকে হাতে ঘুরাইয়া ঘুরাইয়া সে দেখিল—চিনিতে পারিল না, কি। তবু সে ভাবিল—ইহা স্যাঁকরার অনবধানতাপ্রযুক্ত কোন বাজে জিনিষ হইলেও হইতে পারে—দেখা যাক্ ডান হাতেরটিতে কি আছে? তখনি সে আর এক আঘাতে ডান হাতের অনন্তখানা ভাঙ্গিয়া ফেলিল—কিছুই, বাহির হইল না—সব শূন্য। সেই রুদ্ধ নির্জন ঘরে, শূন্য মেঝের উপরে, জ্যোৎস্নার আলোয় সেই ঔষধটি হাতে করিয়া সে মূঢ়ের মতো বসিয়া রহিল। কেবলি মনে হইতে লাগিল—সে ডাকিনী, সে ডাকিনী, তাহাকে তাড়াইবার জন্য এত ঔষধ, এত ষড়যন্ত্র, এত আয়োজন। সে-ও তবে দুর্বল নহে, তাহারও বিষম শক্তি আছে! হঠাৎ সে হা হা করিয়া হাসিয়া উঠিল—তার পরেই মূর্ছিত হইয়া পড়িয়া গেল। শশাঙ্ক কয়েক দিনের জন্য কলিকাতায় গিয়াছিল বলিয়া রাত্রে দরজা খুলিতে হইল না। ডাকিনী আহার করিল কি না করিল, সে সন্ধান করিবার প্রয়োজনও কেহ অনুভব না করাতে সারারাত্রির মধ্যে কেহ তাহাকে ডাকিল না। পরদিন প্রত্যূষে মল্লিকা এক নূতন জগতে এক নূতন জীবনে জাগিয়া উঠিল।

(৫)

মল্লিকা বাড়ীর লোকের সঙ্গে মিশিবার চেষ্টা ছাড়িয়া দিল। আগে সে মিশিতে চেষ্টা করিত—লোকে এড়াইয়া চলিত। এবারে চেষ্টাও পরিত্যাগ করিল, স্বামী থাকিলে তাহার সঙ্গে মিশিত—কিন্তু এখন তাহার মনে পড়িল ইদানীং স্বামীও যেন তাহাকে এড়াইয়া চলে। কয়েকদিন আগে শশাঙ্ক কাজের নাম করিয়া কলিকাতায় গিয়াছে—অনেক কয়েকদিন হইয়া গেল, আসিবার নাম নাই। ইহাও কি তাহাকে এড়াইয়া চলিবার একটা পন্থা নয়! মল্লিকা জানিত না বটে, কিন্তু কথাটা সত্য নিস্তারিণী আসিয়াই অম্বাময়ীকে বুঝাইয়াছিল যে, ছেলেকে যতটা সম্ভব মল্লিকার কাছ হইতে দূরে রাখিতে হইবে। অবশ্য হাতে ঔষধ থাকা পর্যন্ত কোন ভয় নাই—তবু সাবধান হইতে দোষ কি? তাহার পরামর্শেই অম্বাময়ী পুত্রকে কাজের অছিলায় কলিকাতা পাঠাইয়াছেন—এবং নিত্য নূতন কাজের ফরমাস পাঠাইয়া তাহার প্রত্যাবর্তনে বিঘ্ন ঘটাইতেছেন। মল্লিকা এত খবর রাখিত না কিন্তু স্বাভাবিক স্ত্রীবুদ্ধির বলে তাহার অনুমান প্রায় ঠিক জায়গায় পৌঁছিয়াছিল।

বাড়ীতে স্বামী নাই—অন্যান্য কাহারো সঙ্গে সে মেশেনা কাজেই মল্লিকা যেন লোক-সমাজে থাকিয়াও লোকসমাজের বাহিরে গিয়া পড়িল। প্রেততাত্ত্বিকেরা বলেন লোকের ভিড়ের মধ্যেই ছায়া শরীরীরা বিচরণ করিতেছে—মানুষে তাহাদের অস্তিত্ব জানিতে পারিতেছে না—কিন্তু উভয়পক্ষই যে আছে তাহাতে আর কোন সন্দেহ নাই। মল্লিকা ও বাড়ীর সকলের মধ্যে যেন সেই সম্বন্ধ। সে কাছে থাকিয়াও দূরে, ঘরের বধূ হইয়াও ঘরের নয়, মানুষ হইয়াও ডাকিনী। কেবল একটি বিষয়ে সাবধানতা অবলম্বন করিয়াছিল। লম্বা হাতার জামা পরিয়া অনন্তশূন্য বাহুদ্বয় ঢাকিয়া রাখিয়াছিল।

একবার সে ভাবিল শশাঙ্ককে চিঠি লিখিয়া জানাইবে। কিন্তু কি লিখিবে? তিনিও তো এই ষড়যন্ত্রে যোগ দিয়াছেন। তবে সেই কথাই সে না লেখে কেন? কিন্তু ইহার তো কোন প্রমাণ নাই, ছোট একটা মেয়ে কি বলিয়াছে তাহার উপর নির্ভর করিয়া লিখিলে তিনি তো হাসিয়া উড়াইয়া দিতে পারেন। ব্যাপারটা যদি হাসিয়া উড়িয়াই যায় তবে ক্ষতি কি? সংসারের এই তো বিপদ্! অনুমানের সত্যকে প্রমাণের সত্য করিয়া তোলা যায় না বলিয়াই কি অনুমানের সত্য তুচ্ছ? এইভাবে দিন যায় এবং রাত্রিও যায়। মল্লিকা ক্রমাগত মনে মনে জপিতে থাকে সে নাকি ডাকিনী। যতই সে এই কথা ভাবে ততই বাড়ীর সকলের প্রতি তাহার ধিক্কারের ভাব গভীরতর হয়—একসঙ্গে ধিক্কার, ক্রোধ, বিরক্তি, নৈরাশ্য, দুঃখ আরো কত কি? তাহার ইচ্ছা করে সকলের কাছে প্রমাণ করিয়া দেয় সে তাহাদের আর দশজনের মতোই সাধারণ মানুষ! কিন্তু প্রমাণ করিবে কি করিয়া? তাহাদের অনুমানের সত্যকে কি করিয়া সে অপ্রমাণ করিবে?

একদিন দুপুরবেলা নির্জন ঘরে আয়নায় নিজের ছায়া দেখিয়া সে চমকিয়া উঠিল। একি, তাহার এ কেমন চেহারা হইয়া গিয়াছে! ওই আয়নাখানা যেন একটা সুড়ঙ্গ পথের একটা মুখ তাহার মধ্য দিয়া আর এক দিকের, আর এক জগতের কোন্ ছায়াময়ী দৃশ্যমান? বাস্তবিক ছায়াময়ীই বটে। মল্লিকা কৃশ হইয়া গিয়াছে, মল্লিকার মতো স্নিগ্ধ রঙের উপরে একটা তীক্ষ্ণতা নামিয়াছে, বসনের শুভ্রতা আর গায়ের রঙের শুভ্রতা, সবশুদ্ধ মিলিয়া কেমন যেন একটা শাণিত অসির ভাব! চোখে অস্বাভাবিক দীপ্তি, মুখে এমন একটা হাসির রেখা—যাহাতে তরবারির দীপ্তি ও তরবারির শীতলতা দুই-ই মিশ্রিত আছে। নিজের ছায়া দেখিয়া সে নিজেই চমকিয়া উঠিল। সামান্য কয়দিন সে আয়নায় প্রসাধন

করে নাই—এরই মধ্যে তাহার একি পরিবর্তন! সে হাসিয়া ভাবিল—একেই তো ডাকিনীতে পাওয়া বলে। আমি তো আর মানুষ নই।

ইতিমধ্যে এমন একটা ঘটনা ঘটিল, যাহাতে নিতান্ত নাস্তিকেও বিশ্বাস করিতে বাধ্য হইল যে, মল্লিকা ডাকিনী ছাড়া আর কিছু নয়। গ্রামের বদি হাড়ীর ছোট ছেলেটার তড়কা হইল। লোকে বলিল, ছেলেটাকে ডাইনিতে পাইয়াছে—এখন চৌধুরী বাড়ীর বৌমার দয়া ছাড়া আর রক্ষা নাই। বদি ছেলেটাকে লইয়া এক দৌড়ে চৌধুরী বাড়ীতে প্রবেশ করিয়া নিজের ঘরের বারান্দায় যেখানে মল্লিকা একা বসিয়াছিল—সেখানে গিয়া ছেলেটাকে তাহার কোলে ফেলিয়া দিয়া একেবারে তাহার পা জড়াইয়া ধরিল।

মল্লিকা কিছুই বুঝিতে না পারিয়া জিজ্ঞাসা করিল—একি! একি!

বদি পা না ছাড়িয়া বলিল—বৌমা এবার তোমার দয়া ছাড়া উদ্ধার নাই। ছেলেটাকে রক্ষা করো।

মল্লিকা বলিল—ওর যে গা গরম দেখছি। ইস খুব জ্বর। তড়কা হয়েছে।

বদি বলিল—তড়কা নয় বৌমা। ডাকিনীর কৃপা হয়েছে—তুমি ছাড়া আর কে রক্ষা করবে?

মল্লিকা বুঝিল তাহার নূতন পরিচয় সারা গ্রামে রাষ্ট্র হইয়া গিয়াছে। সে ভাবিল, এই ছেলেটার পরিবর্তে তাহার মৃত্যু হয় না! ইতিমধ্যে দু'চারজন করিয়া লোক জড় হইতে লাগিল। তাহাদের দৃষ্টি এড়াইবার জন্যও বটে, ছেলেটাকে বাঁচানো যায় কিনা দেখিবার জন্যও বটে, সে তাড়াতাড়ি ঘরের মধ্যে উঠিয়া গেল এবং জল ও ইউ ডি কোলন মিশাইয়া ছেলেটার মুখে মাথায় দিতে লাগিল। অল্পেই ছেলেটার তড়কা ভাঙ্গিয়া সুস্থ হইল। তখন সে ছেলেটাকে আনিয়া তাহার মায়ের কোলে ফিরাইয়া দিল। বদি আনন্দে জয়ধ্বনি করিয়া উঠিয়া গলার রূপার মালাটা এক টানে ছিঁড়িয়া মল্লিকার পায়ের উপরে রাখিল—বলিল—বৌমা দয়া করে এটা তুমি নাও।

বদি আর কোন কথা না বলিয়া ছেলেটাকে কোলে তুলিয়া লইয়া সবেগে প্রস্থান করিল। কিন্তু দর্শকের ভিড় সরিল না। অন্বাময়ী ও নিস্তারিণীও এই ভিড়ের মধ্যে ছিলেন। দুইজনে পরস্পরের দিকে চাহিয়া অর্থপূর্ণ হাসি হাসিলেন। এমন সময়ে নিস্তারিণীর ইঙ্গিতে অন্বাময়ী বলিয়া উঠিলেন—তোমার অনন্ত কোথায়? মল্লিকা দেখিল ব্যস্ততায় জামার হাতা সরিয়া গিয়াছে। সে বলিল—খুলে রেখেছি।

অম্বাময়ী কঠোর স্বরে বলিলেন—খুললে কেন? আবার পরো।

মল্লিকা বলিল—খুলে ফেলে দিয়েছি—আর পরবো না। নিজের স্বরের কঠোরতায় সে বিস্মিত হইয়া গেল। সাধারণ বধূ হইলে এমন অবাধ্যতার জন্য দণ্ডের অন্ত থাকিত না। কিন্তু ডাকিনীর উপরে ক্রোধ প্রকাশ করিতে অত্যন্ত দুর্দান্ত শাশুড়ীরও ভয় হয়। ডাকিনী হইবার কিছু সুবিধাও আছে। এই ঘটনায় সকলেই বিস্মিত হইল যে, মল্লিকা ডাকিনী ছাড়া আর কিছু নয়।

অম্বাময়ী ও নিস্তারিণী নিভৃতে বসিয়া পরামর্শ করিতে লাগিলেন। অম্বাময়ী পুছিলেন—এখন কি করা যায়?

নিস্তারিণী বলিলেন—যতদিন ওষুধ ছিল ভয়ের কিছু ছিল না। ওষুধ ফেলে দেবার পরেই তো প্রকোপ সুরু হয়েছে।

চিন্তিত অম্বাময়ী বলিলেন—কিন্তু এখন উপায় কি?

নিস্তারিণী বলিলেন—উপায় আর কি? ওঁরা সব দেব-অংশী। ঘাঁটাঘাটি করা কিছু নয়। এখন উনি নিজ ইচ্ছায় গেলেই বেশি মঙ্গল।

অম্বাময়ী কাঁদো কাঁদো স্বরে বলিলেন—যত তাড়াতাড়ি যায় ততই ভালো। বাছা আমার ফিরে আসবার আগে যায় না!

নিস্তারিণী বলিলেন—জোর করা তো যায় না দিদি। উনি ক্রুদ্ধ হলে বাছার ক্ষতি করতে পারেন।

পুত্রের ক্ষতি হইবার আশঙ্কায় অম্বাময়ী শিহরিয়া উঠিয়া ইষ্টনাম জপ করিতে লাগিলেন।

মল্লিকার সঙ্গে কেহ মিশিত না—ইহা আগেই বলিয়াছি, কেবল ঐ অনাথ বালিকাটি মিশিত। কুমড়ো আসিয়া মল্লিকাকে বলিল—মাসি, সবাই তোমাকে ভয় করে, কেবল আমিই ভয় করি না।

তারপরে বলিল—ভয় করবো কেন? তুমি তো আমাদেরি মতো মানুষ। ওরা বলে তুমি ডাকিনী। হও না কেন ডাকিনী, আমার মাসি বটে তো! তুমি আমার ডাকিনী মাসি।

মল্লিকা কহিল—ওরা আর কি বলে রে?

কুমড়ো বলিল—একদিন কর্তা দিদি আর কাশীর দিদি বলাবলি করছিল—আমি সব শুনে ফেলেছি। শীগ্‌গীরই নাকি তুমি উড়ে চলে যাবে—ওরা কালীর থানে পুজো দিয়েছে।……আচ্ছা মাসি, তুমি আমাকেও নিয়ে যাও না কেন? আমার তো কেউ নাই—এরা আমাকে কেউ দেখতে পারে না।

মল্লিকা হাসিয়া বলিল—যাবি আমার সঙ্গে?

কুমড়ো সাগ্রহে বলিল—যাবো বই কি। ছাদ ফুটো করে দু'জনে উড়ে চলে যাবো। প্রথমে যাবো কামরূপ কামিখ্যে—তারপরে, যাবো শ্রীক্ষেত্রে! সে বেশ হবে মাসি। যাবার সময়ে এই বাড়ীর উপর দিয়ে উড়ে যেতে হবে—দেখবো ওরা কি করে?···আবার একটু থামিয়া বলিল—

হাঁ মাসি কবে যাবে?

মল্লিকা বলিল—শীগ্‌গীরই।

'সে বেশ হবে' বলিতে বলিতে কুমড়ো আনন্দে প্রস্থান করিল—বোধ হয় জিনিষপত্র বাঁধিবার জন্যেই।

মল্লিকা বুঝিল—এবার তাহার যাওয়াই ভালো। কিন্তু কোথায় যাইবে? কোনখানে তো তাহার কেহই নাই—পৃথিবীর কোথাও তাহার তিলমাত্র আশ্রয় নাই। অবশ্যই যাইতে হইবে এবং শীঘ্রই···কিন্তু কোথায়? চিন্তা করিয়া করিয়া মল্লিকা এ প্রশ্নের কোন কিনারা পাইল না।

ডাকিনী হইবার অসুবিধার মধ্যেও একটা সুবিধা মল্লিকা পাইয়াছিল—নির্দিষ্ট সীমার মধ্যে অবাধ স্বাধীনতা। সে যখন খুসি ঘুমাইত, যখন খুসি আহার করিত—আর সবচেয়ে সুবিধা ছিল রাত্রিবেলায় চৌধুরী বাড়ীর ছাদে ছাদে একাকী ঘুরিয়া বেড়াইত। কেহ বাধা দিত না, নিষেধ করিত না। গভীর রাত্রে এক ছাদ হইতে অন্য ছাদে ঘুরিতে ঘুরিতে তেতালার যে-ছাদটা গুড়নদীর ঠিক উপরেই তাহার উপরে আসিয়া দাঁড়াইত। দেখিত অনেক নীচে গুড়নদীর কালো জলে তারার ছায়া,—দেখিত নদীর ধারে দূরে চিতার আলো নির্বাপিতপ্রায়, দেখিত নদীর ওপরে পুঞ্জিত অন্ধকারে জোনাকীর ঝলমলানি; কান পাতিয়া শুনিত, দিনের বেলায় অশ্রুত গুড়নদীর ছল ছল ধ্বনি, আর শুনিতে পাইত প্রহর-গোনা যামঘোষের দিগন্তজোড়া ঊর্ধ্বোৎক্ষিপ্ত রব। তারপরে এক সময়ে নিশান্তের শীতল বাতাসে সচকিত হইয়া ক্লান্ত শরীরটাকে টানিয়া আনিয়া শূন্য শয্যায় ফেলিয়া কখন্ ঘুমাইয়া পড়িত। ছাদে বেড়াইবার সময়ে সে জানিত, জানালা দরজা আলিসার আড়াল হইতে অনেকগুলি কৌতূহলী চক্ষু তাহার গতিবিধি লক্ষ্য করিতেছে।

(৬)

এমন সময়ে হঠাৎ একদিন শশাঙ্ক ফিরিয়া আসিল। রাত্রি তখন অনেক। ষ্টেশনেই সে আহারাদি সারিয়া আসিয়াছিল—কাজেই আসিয়াই সে নিজের

শয়নগৃহে প্রবেশ করিল। মল্লিকা অকস্মাৎ স্বামীকে ফিরিতে দেখিয়া চমকিয়া উঠিল। শশাঙ্কও তাহাকে দেখিয়া চমকিয়া জিজ্ঞাসা করিল—মল্লিকা, তোমার হাতের অনন্ত গেল কোথায়?

মল্লিকা একবার রিক্তবাহুর দিকে তাকাইয়া হাসিয়া বলিল,—ভেঙে ফেলে দিয়েছি। ভীতবিস্ময়ে শশাঙ্ক বলিল, কেন?

মল্লিকা এবার হাসিল, বলিল—বুঝতে পারো না! আমি যে ডাকিনী।

শশাঙ্কর অন্তরাত্মা শিহরিয়া উঠিল—একি পরিহাস, না সত্য?

এবার সে ভালো করিয়া মল্লিকাকে লক্ষ্য করিল। জানালা দিয়া নির্গলিত জ্যোৎস্নার ধারাতে সে দাঁড়াইয়া; শাড়ীর শাদা জমিনে আপাদকণ্ঠ আবৃত; চুল-এলায়িত; কালো চুলের দ্বন্দ্বে বসনের শাদা, রঙের শাদা, জ্যোৎস্নার শাদা, হাসির শাদা—সবশুদ্ধ মিলিয়া কেমন যেন একটা অতীন্দ্রিয় শুভ্রতা। সেই ঋজুশুভ্র অনতিদীর্ঘ নারীমূর্তি যেন কোন্ দুষ্ট অদৃষ্টের একখানি শাণিত তরবারি! সে দাঁড়াইয়া ঘামিতে লাগিল।

মল্লিকা বলিল—বসো।

কিন্তু নিজের শয্যায় আসিয়া বসিবার সাহস শশাঙ্কর হইল না। কিছু দিন আগে যে মল্লিকাকে সে ছাড়িয়া দিয়াছিল, এ যেন সে মল্লিকা নয়। সংসারের ধূমে মলিন ম্লান চিরপরিচিত নারীকে অলৌকিকের শানপাথরে ঘসিয়া কে যেন অন্তর্নিহিত দীপ্তিময়ী লোকত্তরাকে বাহির করিয়াছে। এত কথা হয়তো তাহার মনে হইত না, কিন্তু যতদিন সে কলিকাতায় ছিল প্রায় প্রতিদিনই মার পত্র পাইত যাহাতে থাকিত এই ডাকিনীর নিত্য নব কার্যকলাপের পরিচয়—তার কতক সত্য, কতক মিথ্যা। সবই কল্পনার তুলিতে জ্বলন্ত বর্ণে অঙ্কিত। সেই সব ঘটনার সঙ্গে জড়িত করিয়া আজ যাহাকে সে দেখিল সে আর তাহার পত্নী নহে—পত্নীরূপিণী ডাকিনী।

শশাঙ্ক অস্ফুটস্বরে বলিল—তুমি কে?

মল্লিকা স্থির কণ্ঠে বলিল—আমি ডাকিনী। আমার দেশ কামরূপ কামিখ্যে। আমি গভীর রাত্রে ছাদ ফুটো করে কঙ্কাল হয়ে আকাশপথে উড়ে যাই—কামরূপ থেকে শ্রীক্ষেত্রে কত পাহাড় পর্বত, নদনদীর উপর দিয়ে, কত দেশ বিদেশ পার হয়ে। ওঃ সে কি আনন্দ! তারপরে ভোর হবার আগে মানুষ হয়ে তোমার পাশে আবার শুয়ে ঘুমোই।

শশাঙ্ক কাঠের মতো দাঁড়াইয়া শুনিতেছিল। মল্লিকা বলিল—চলো না একদিন আমার সঙ্গে। যাবে?

শশাঙ্ক আর সহ্য করিতে পারিল না—সে মাগো শব্দ করিয়া ছুটিয়া গৃহ হইতে বাহির হইয়া গেল। তাহার সেই সঙ্কুচিত পলায়নের দৃশ্যে মল্লিকা হাঃ হাঃ করিয়া হাসিয়া উঠিল। সেই হাসি যেন কঙ্কালের শীর্ণ শুভ্র হাত বাড়াইয়া শশাঙ্ককে ধরিবার জন্য পিছনে পিছনে ছুটিতেছে। শশাঙ্ক একেবারে তাহার মায়ের শয্যা-পার্শ্বে গিয়া হুমড়ি খাইয়া পড়িল।

অম্বাময়ী চমকিয়া উঠিয়া দেখিলেন, তাঁহার পুত্র—সারা গায়ে ঘাম—ঠক্ ঠক্ করিয়া কাঁপিতেছে। তাহাকে শান্ত করিয়া শুধাইলেন—এসেই বুঝি ঘরে গিয়েছিলি? আমাদের একবার পুছতে হয়। হাতে ওষুধ বেঁধে দিতাম, তবে ঢুকতিস। বল্ বল্, কি হয়েছে?

শশাঙ্ক সব খুলিয়া বলিয়া শেষে বলিল—মা ওযে আমাকেও সঙ্গে যেতে বলে। শঙ্কিত অম্বাময়ী 'ষাট ষাট' বলিয়া পুত্রের মাথায় ইষ্টমন্ত্র জপ করিয়া দিলেন এবং অবশেষে ইহার একটা বিহিত করিবার জন্য মল্লিকার ঘরের দিকে চলিলেন। তিনি একেবারে গলবস্ত্র হইয়া মল্লিকার কাছে গিয়া বলিলেন—ওগো, তুমি দেবী দানবী ডাকিনী যোগিনী যেই হও, আমরা তোমার কোন ক্ষতি করি নাই। তুমি স্বেচ্ছায় এ বাড়ীতে আশ্রয় নিয়েছিলে আবার স্বেচ্ছায় এখান থেকে নিজের দেশে প্রস্থান করো।

এই বলিয়া তিনি গললগ্নীকৃতবাস হইয়া জোড় হাতে দাঁড়াইয়া রহিলেন, মাতার পিছনে দাঁড়াইয়া পুত্র কাষ্ঠপুত্তলিকাবৎ। মল্লিকা মাতাপুত্রের এই স্থাণুভাব দেখিয়া একবার হাসিল—বলিল—তাই যাবো। এই বলিয়া সে উভয়ের পাশ দিয়া বাহির হইয়া গেল। যাইবার সময়ে একবার স্বামীর দিকে কটাক্ষ করিল। তাহার দিক হইতে কোন সাড়া আসিল না—কাঠের পুতুল কি সাড়া দিবে?

মল্লিকা ঘর হইতে বাহির হইয়া অকম্পিত পায়ে তর্ তর্ করিয়া ছাদে গিয়া উঠিল। এক মুহূর্তের জন্য দ্বিধা করিল না—নিজের কর্তব্যের ছক যেন সম্মুখে বিস্তারিত।

মল্লিকা ছাদ হইতে অন্য ছাদে, নিম্নতর হইতে উচ্চতর ছাদে গিয়া উঠিল এবং শেষে চারতলার চিলে কোঠার পাশে গিয়া দাঁড়াইল। মল্লিকা ঊর্ধ্বে তাকাইয়া দেখিল চৈত্র পূর্ণিমার জ্যোৎস্না দিগদিগন্তব্যাপিয়া শুভ্র-নৈরাশ্যের তাঁবু কানাৎ টাঙাইয়া দিয়াছে—তাহারি উচ্চতম প্রান্তে জাদুকরের মেয়ে চাঁদ শূন্যে

ঝুলিতেছে ; আরও না জানি কি বিস্ময় সঞ্চিত আছে। নীচে যতদূরে চোখ চলে সুপারি নারিকেলের মাথাগুলি তালে তালে দোলাদুলি করিতেছে। বাতাস উঠিয়াছে। মল্লিকার মনে হইল বাতাস উঠিয়াছে। পাল খুলিয়াছে, কাছিতে টান পড়িয়াছে। আর দেরী নয়। তাহার মনে হইল যে বাতাসে এখানকার সুপারি নারিকেলের মাথা দুলিতেছে সমুদ্রের ঢেউয়ে সে বাতাস কি কাণ্ডই না জানি করিতেছে। সুদূর সমুদ্রে জোয়ারের জল এতক্ষণ পূর্ণতার রেখা ছাড়াইয়া গিয়াছে। পৃথিবীর তীরে তীরে যত গুহা কন্দর আছে লবণাম্বুতে পূর্ণ হইয়া এতক্ষণে গদ্ গদ্ ভাষায় বেদনার কি স্তবোচ্চারণই না করিতেছে! সেই ব্যথার টান কি এই শুষ্কপ্রায় গুড়নদীর নাড়ীতেও আজ রাত্রে লাগে নাই? মল্লিকার মনে হইল আজ ব্যথার জোয়ার, নৈরাশ্যের হোলি। নিম্নে ঊর্ধ্বে কোথাও আজ পরিত্রাণ নাই, পরিচিত দিগন্ত' আশ্রয়ের তীর ধুইয়া মুছিয়া কোথায় সব অবলুপ্ত হইয়া গিয়াছে। মল্লিকা দেখিল এই সর্বপ্লাবী বন্যার মুখে কোথাও তাহার কোন আশ্রয় নাই; না পতিকূলে, না পিতৃকূলে, সংসারের সব দিগন্ত কোন সর্বনাশের তলায় নিশ্চিহ্ন। এই প্রলয় পয়োধির মুখে কোন্ বটপত্রকে অবলম্বন করিয়া সে বাঁচিবে? কোথাও যে তাহার কোন আশ্রয় নাই। আর সর্বনাশের মুখে একটুখানি বাঁচাইয়া রাখিয়া কি লাভ? মল্লিকা তাকাইয়া দেখিল, অতি নিম্নে গুড়নদীর রূপার পাত জ্যোৎস্নাচিক্কণ শীতল একটি বটপাতার মতো বাতাসে কাঁপিতেছে।

আবার বাতাস উঠিয়াছে, সুপারিনারিকেলের মাথাগুলির কি হায় হায় হাহাকার। দূরের গাছের মাথা, অদূরের গাছের মাথা, নিকটের গাছের মাথা, পায়ের তলাকার গাছের মাথা এবং শেষে মল্লিকার আঁচল বাতাসে উড়িতে লাগিল। দূরের বাতাস কাছে আসিয়া পড়িয়াছে—আর বিলম্ব নয়। তাঁবুর উচ্চতম প্রান্তে জাদুকরের মেয়েটা। অনেকক্ষণ হইল দুলিতেছে—এবারে লাফাইয়া পড়িবে—আর বিলম্ব নয়....ওর আগেই...

মল্লিকা চিলে-কোঠার ছাদে উঠিয়া একবার পৃথিবীটা নিরীক্ষণ করিয়া লইল এবং পরক্ষণেই মাগো রব করিয়া অতি নিম্নে গুড়নদী লক্ষ্য করিয়া ঝাঁপ দিল।

জানালা দরজার আড়াল হইতে একদল কৌতূহলী চক্ষু দেখিল ডাকিনী চিলে কোঠার ছাদে উঠিয়া স্বমূর্তি ধরিয়া কামরূপ কামিখ্যের অভিমুখে উড়িয়া চলিয়া গেল।

পরদিন সকালে যখন মল্লিকার মৃতদেহ নদীর জলে পাওয়া গেল, তখনো তাহাদের মত পরিবর্তন ঘটিল না। সবাই বলিল, ডাকিনী মানব দেহটা ফেলিয়া কঙ্কাল হইয়া উড়িয়া গিয়াছে—কামরূপ কামিখ্যেয় নরদেহে যাইবার উপায় নাই ; মানুষের ঘরে মানুষের রূপে আসিয়াছিল—এবার স্বরূপ ধরিয়া ফিরিয়া গিয়াছে। যাই হোক, বাড়ীর ডাকিনী দূর হওয়াতে সবাই নিশ্চিন্ত বোধ করিল এবং উত্তরোত্তর শশাঙ্কর স্বাস্থ্যের উন্নতি ঘটিতে লাগিল।

পেস্কার বাবু

জজের পেস্কার রতনমণি বাবু পঁয়ত্রিশ বছর কাজ করিবার পরে পেন্সন লইলেন।

সেদিনটার কথা আজও স্পষ্ট মনে পড়ে। অন্যদিনের মতোই রতনমণি বাবু আদালতে আসিলেন, সেই বুকের কাছে প্লেট-দেওয়া পুরানো ধরণের শার্টের উপরে তৈলাক্ত চাদরখানা ভাঁজ করিয়া রক্ষিত; ঘরে ঢুকিয়াই দেওয়াল-ঘড়ির দিকে একবার তাকাইলেন, ঘড়িটা ঠিক চলিতেছে বলিয়া যেন তাহাকে উৎসাহ দিলেন, যেমন উৎসাহ দেয় ক্লাসটিচার ঘরে ঢুকিয়া পাঠ-নিরত ভালো-ছেলেটিকে; তারপরে চেয়ারখানা রুমাল দিয়া বেশ করিয়া ঝাড়িয়া লইয়া সন্তর্পণে বসিয়া পড়িলেন; চাদরখানা গলা হইতে খুলিয়া চেয়ারের হাতলে জড়াইয়া পকেট হইতে চশমার ভাঙা খাপটি বাহির করিলেন; চশমার কাঁচ যতই পরিষ্কার থাক্ না কেন কোঁচার খুঁট দিয়া অন্ততঃ পাঁচ মিনিট ধরিয়া পরিষ্কার করিবেন; তারপরে চশমা পরিয়া লইয়া আর একবার ঘড়ির দিকে তাকাইবেন—ভাবটা যেন বিনা চশমায় দৃষ্টিতে ফাঁকি দিয়াছ কিনা এইবার দেখিব; ঘড়ি নিতান্ত সুবোধ বালকের মতো চলিতেছে দেখিয়া সমর্থন-মূলকভাবে একবার হাসিলেন; তারপরে ভাঙা গলায় হাঁক দিবেন—রঞ্জন, জল! রঞ্জন আদালতের বেয়ারা—সে এক গেলাস জল আনিয়া দেয়। রতনমণি বাবুর নিজস্ব একটি চিহ্নিত গেলাস আছে। রঞ্জন তাঁহার গেলাসে একটা চিহ্ন করিয়া রাখিয়াছিল পাছে ভুল ভ্রান্তি হয়। সে সেই চিহ্নটা পেস্কার বাবুর দিকে ফিরাইয়া গেলাসটা হাতে দেয়, কিন্তু তিনি এত সহজে ভুলিবার লোক নহেন, তাঁহার নিজের একটি গোপন চিহ্ন আছে, গেলাসটা ঘুরাইয়া ফিরাইয়া সেটা দেখিয়া লইয়া এক নিঃশ্বাসে জলটা আলগোছে পান করিয়া ফেলিয়া একটা তৃপ্তির দীর্ঘনিশ্বাস ছাড়েন—গেলাসটা রঞ্জনের হাতে ফিরাইয়া দিতে দিতে বলেন—বেঁচে থাক্ বাপু! কেমন, বাড়ীর সব ভালো তো!

তাঁহার নিত্যকার নিয়ম এই পর্যন্ত অনুষ্ঠিত হইলে অন্যান্য আমলারা আসিতে থাকে, দু'চারজন করিয়া উকীল বাবু আসিতে থাকেন—সবাই ঘরে ঢুকিয়া বৃদ্ধ রতনমণি বাবুকে একটা করিয়া নমস্কার করে—কিন্তু তখন তাঁহার বাহ্যজ্ঞান লুপ্ত হইয়া গিয়াছে—তিনি স্তূপীকৃত নথীর গাদার মধ্যে আত্মবিসর্জন করিয়াছেন—

কেবল যখন জজসাহেব আসেন তখন তিনি যন্ত্র চালিতের মতো উঠিয়া একবার মাথা ঝাঁকাইয়া নমস্কারের ভঙ্গী করিয়া বসিয়া পড়েন—নথীর গাদার মধ্যে হইতে তখন তাঁহাকে টানিয়া বাহির করা সব সময়ে জজের সাধ্যেও কুলায় না।

ইহাই রতনমণি বাবুর নিত্যকার অভ্যাস—এই রকম পঁয়ত্রিশ বছর ধরিয়া চলিতেছে। অবশ্য প্রথমদিকে তিনি পেস্কার ছিলেন না—কিন্তু সে সব এখন স্মৃতির বাহিরে গিয়া পড়িয়াছে। সহর সুদ্ধ লোক তাঁহাকে পেস্কারবাবু বলিয়া জানে, আদালত সংক্রান্ত সবাই তাঁহার অতি তুচ্ছ অভ্যাসটির সঙ্গেও ঘনিষ্ঠভাবে পরিচিত।

আদালতের সবাই জানিত টিফিনের সময়ে পেস্কার বাবুকে কোথায় দেখা যাইবে। উত্তরদিকের বটগাছটার তলায় কাঠের ঘরখানায় মোতি ময়রার প্রসিদ্ধ সন্দেশের দোকান, সেখানে একটি কাঠের টুলের উপরে পেস্কার বাবু আসিয়া বসেন, ময়রা শশব্যস্তে কলার পাতে করিয়া ছুটি বড় সন্দেশ রতন বাবুর হাতে দেয়—তিনি চক্ষু মুদ্রিত করিয়া ধীরে ধীরে সন্দেশ ছুটি গলাধঃকরণ করেন—তখন মোতি ঘটি হইতে তাঁহার হাতে জল ঢালিয়া দেয়, তিনি পান করেন ; মোতির অনেক অনুরোধ সত্ত্বেও তিনি গেলাসে জল গ্রহণ করিতে সম্মত হন নাই। সত্য কথা বলিতে কি আমাদের রতনমণি বাবু একটু শুচিবায়ুগ্রস্ত। মোতি কলার পাতার ঠোঙায় টাটকা সাজা তামাকের কল্কেটি তাঁহার হাতে দেয়—রতনমণি বাবু ধূমপান করেন, অতিরিক্ত ধূমপানে তাঁহার গোঁফের প্রান্ত তামাটে হইয়া গিয়াছে। রতনমণি বাবু উঠিয়া পড়িতেই আর সকলে তাড়াতাড়ি জলযোগ ও বিশ্রাম সারিয়া নেয়—এবারে পুনরায় আদালত বসিবে। মোতি ময়রা পেস্কার বাবুকে বড় খাতির করে—তাঁহার পৃষ্ঠপোষকতার ফলেই অন্যান্য কর্মচারী ও উকীলের মুহুরিরা তাহার দোকানে জলযোগ করে। মোতি রতনমণি বাবুর প্রিয় সন্দেশের নাম রাখিয়াছে 'পেস্কার-ভোগ'।

আমাদের রতনমণি বাবু কি ঘুষ লইতেন? এ প্রশ্নের উত্তর দেওয়া সহজ নহে। মাছ যেমন জলে বাস করে, মানুষ যেমন বাতাসে বাস করে, আদালতের জীবগণ তেমনি ঘুষের মধ্যে বাস করে। কিন্তু রতনমণি বাবু সম্বন্ধে এ বিষয়ে দ্বিমত আছে। তাঁহার বন্ধুরা বলে তিনি ঘুষ নিয়া থাকেন, শত্রুরা বলে ঘুষ লইবার মতো সাহস তাঁহার নাই। কিন্তু আমাদের মতো নিরপেক্ষ লোকের অভিজ্ঞতা এই যে তিনি ঘুষ নেন এবং নেন না। অর্থাৎ সারা বছর ঘুষ নেন না। কিন্তু বিজয়া দশমীর পরে যেদিন আদালত খোলে, সেদিনটা তিনি ঘুষ

নিয়া থাকেন। সেদিন একখানা বড় রুমাল তাঁহার টেবিলের উপর পাতিয়া দেন, অর্থী, প্রার্থী, দারোয়ান, চাপরাশি, আমলাগণ এমনকি অনেক জুনিয়ার উকীল পর্যন্ত সাধ্যানুযায়ী টাকাটা সিকেটা দেয়। আদালত শেষ হইলে ভারি রুমাল খানায় তোড়া বাঁধিয়া একবার মাথায় ঠেকাইয়া পকেটে ভরিয়া তিনি বাড়ী যান এবং গৃহিণীকে ডাকিয়া সন্তর্পণে তাহার হাতে দিয়া বলেন—'ভালো করিয়া তুলিয়া রাখিও—মায়ের আশীর্বাদ।'

ইহাই রতনমণি বাবুর জীবনের রুটিন। ইহাই তাঁহার পঁয়ত্রিশ বছরের রুটিন, পঁয়ত্রিশকে তিন শ পঁয়ষট্টি দিয়া গুণ করিলে যে সংখ্যা দাঁড়ায়—তাহার অভ্যাস, কেবল ছুটির ক'টা দিন ছাড়িয়া দিতে হইবে। সেই রতনমণি বাবুর আজ আদালত জীবনের শেষ দিন—কাল হইতে তাঁহার পেন্সন জীবন সুরু হইবে।

আদালতের কাজ শেষ হইল মাত্র—নাজির বাবু আসিয়া রতনমণি বাবুর কানে কানে বলিলেন—পেস্কার বাবু—একবার এদিকে আসবেন। নাজির বাবুকে অনুসরণ করিয়া তিনি নাজির বাবুর আফিস ঘরে গিয়া প্রবেশ করিয়া দেখিলেন—বহুলোক সেখানে সমবেত—সবাই আদালতের কর্মচারী, নাজির, সেরেস্তাদার হইতে চাপরাশী পর্যন্ত সবাই আছে।

তিনি নাজির বাবুকে কহিলেন—এ আবার কি?

নাজির বাবু তাঁহাকে একখানা চেয়ার দেখাইয়া দিয়া বলিলেন—বসুন।

ব্যাপার আর কিছুই নয়। রতনমণি বাবুর বিদায় উপলক্ষ্যে আদালতের কর্মচারিগণ একটি প্রীতি সম্মেলনের আয়োজন করিয়াছে মাত্র।

সকলের সম্মতিক্রমে নাজির বাবু সভাপতির আসন গ্রহণ করিলে মুন্সেফের পেস্কার যে ছোকরাটি স্থানীয় রঙ্গমঞ্চে জনার অভিনয় করিয়া মহিলাগণের অশ্রু ও ভদ্রমহোদয়গণের করতালি আকর্ষণ করিয়া থাকে সে হার্মোনিয়ম বাজাইয়া স্বরচিত সঙ্গীত আরম্ভ করিল—

"সত্যই কি তুমি যাবে চলে
আমাদের একা ফেলে—
মোরা অসহায়—"

করতালির মধ্যে সঙ্গীত সমাপ্ত হইলে নাজির বাবুর আহ্বানে বক্তারা একে একে রতনমণি বাবুর গুণ বর্ণনা ও তাঁহার বিদায়ে তাঁহাদের দুঃখ প্রকাশ করিতে লাগিলেন—আর রতমমণি বাবু মূঢ়ের মত বসিয়া বসিয়া সমস্ত দৃশ্যটি দেখিতে লাগিলেন—যেন ইহার প্রকৃত তাৎপর্য তিনি গ্রহণ করিতে অশক্ত।

অবশেষে সকলের বক্তব্য শেষ হইলে নাজির বাবু হু'চার কথায় মনোভাব প্রকাশ করিতে রতনমণি বাবুকে অনুরোধ করিলেন। রতনমণি বাবু উঠিয়া বলিলেন—'আজকার মতো যাওয়া যাক্—কাল আবার দেখা হবে।' এই বলিয়া তিনি বসিয়া পড়িলেন। সকলে বলাবলি করিতে লাগিল পেস্কার বাবু অত্যন্ত অভিভূত হইয়া পড়িয়াছেন—দেখিলে না তাঁহার কণ্ঠস্বর কি রকম গদ্‌গদ্। লোকে যাহাই বলুক, আমরা জানি রতনমণি বাবু পেন্সন লইবার মর্মার্থ গ্রহণ করিতে পারেন নাই। এই আদালতেই তাঁহার জীবন, এখানে তাঁহার জীবনের পঁয়ত্রিশ বছর কাটিয়াছে, পঁয়ত্রিশ বছর ত অনেকেরই জীবনের আদ্যন্ত, সেখান হইতে যে একদা তাঁহাকে অকস্মাৎ বিদায় লইতে হইবে ইহা কখনও তিনি ভাবেন নাই—আজও তাহা বিশ্বাস করিয়া উঠিতে পারিতেছেন না। তাই অতি স্বাভাবিক ভাবেই বলিলেন—'আজকার মতো যাওয়া যাক্, কাল আবার দেখা হবে।'

সভা ভঙ্গে প্রচুর জলযোগের আয়োজন ছিল—'পেস্কার-ভোগ' সন্দেশ। জলযোগান্তে যে যাহার গৃহে রওনা হইল—রতনমণি বাবুও নিত্যকার মতো চাদর খানা কাঁধের উপর ফেলিয়া আদালত ত্যাগ করিলেন।

পরদিনও নিত্যকার মতো বেলা দশটায় চাদরখানা কাঁধের উপরে ফেলিয়া যখন রতনমণি বাবু বাহির হইতে উদ্যত, তখন গৃহিণী বলিলেন—কোথায় চল্‌লে আবার?

রতনমণি বাবু নিতান্ত তাচ্ছিল্যের সঙ্গে বলিলেন—কেন—আজ কি নতুন দেখ্‌ছ নাকি? আমি দশটায় কোথায় যাই তা কি জানো না?

বিস্মিত গৃহিণী বলিলেন—তোমার যে পেন্সন হয়েছে।

কিন্তু গৃহিণীর সব কথা তাঁহার কানে পৌঁছিল না, অনেক আগেই তিনি গৃহিণীর কণ্ঠস্বরের বাহিরে চলিয়া গিয়াছেন।

আদালতে পৌঁছিয়া রতনমণি বাবু দেখিলেন যে, শ্যামাচরণ নামে একজন জুনিয়ার কেরাণী পেস্কার পদে উন্নীত হইয়া তাঁহার বহুকালের চেয়ারখানি অধিকার করিয়া বসিয়াছে। রতনমণি বাবু তাহাকে দেখিয়া বলিলেন ও তুমি এখানে বসেছ? আচ্ছা ব'সো ব'সো, আমি ওঘরে বসছি। এই বলিয়া তিনি সেরেস্তাদারের ঘরে গিয়ে একখানা শূন্য চেয়ারে বসিয়া পড়িলেন। ক্রমে ক্রমে কেরাণীকুলে ও অর্থী প্রার্থীতে আদালত পূর্ণ হইয়া উঠিল। সবাই রতনমণি

বাবুকে দেখিয়া বিস্মিত হইয়া গেল। ব্যাপার কি? আবার তিনি কেন? পেন্সন লইয়া মানুষে দুপুরটা সুখে ঘুমাইয়া কাটাইয়া দিবে। নতুবা কাশীবাস করিবে—কিন্তু রতনমণি বাবুর সবই নূতন!

সেরেস্তাদার পুছিলেন—দাদা, আপনি এখানে যে?

রতনমণি বাবু প্রশ্নটা ভুল বুঝিয়া বলিলেন—হাঁ, আর আদালতে বস্‌বো না, ছেলেমানুষদেরও একটা সুযোগ দেওয়া চাই। তাই শ্যামাচরণকে দিলাম ওখানে বসিয়ে। ছেলেমানুষ পাছে ভুলভ্রান্তি করে—তাই আমি রইলাম মাথার উপরে।

তারপরে একটু থামিয়া বলিলেন, দাও, তোমাদের হাতে বেশি কাজ থাকলে দাও, একবার দেখি।

অতিরিক্ত কাজ পাইবার আশায় তিনি মোটেই বঞ্চিত হইলেন না। অনেকগুলি খাতা ও নথী তাঁহার টেবিলের উপর আসিয়া পড়িল। রতনমণি বাবু এক মুহূর্তে নথীর ডুবজলে অন্তর্হিত হইলেন। টিফিনের ফাঁকে নিয়মিতভাবে টিফিন সারিয়া আসিলেন। তারপরে আবার কাজ—এইভাবে পাঁচটা পর্যন্ত চলিল। পাঁচটা বাজিলে চাদর লইয়া রতনমণি বাবু উঠিয়া পড়িলেন।

রতনমণি বাবুর পেন্সন হইয়াও ছুটি হইল না। তিনি আগেকার মতই নিয়মিত সময়ে আসেন, সেরেস্তাদারের ঘরে বসিয়া বাড়তি কাজ কর্ম করেন, ছুটি হইলে আগেকার মতই বাড়ী চলিয়া যান। সবাই তাঁহাকে বড় পেস্কার বাবু বলে, শ্যামাচরণের নাম হইয়াছে ছোট পেস্কার বাবু। টিফিনের অবকাশে শ্যামাচরণের সঙ্গে দেখা হইলে রতনমণি বাবু তাঁহার পিঠে হাত বুলাইয়া বলেন—শ্যামাচরণ কোন ভয় নাই, মাথার উপরে আমি। আর ভয়ই বা কিসের? নথী ঠিক থাকলে কেউ কিছু বলতে পারবে না! তবে শোন একটা গল্প বলি,—একবার এক জজ সাহেব এল মিঃ রঙ্গনাথম্। এদিকে মাদ্রাজী—যেমন রং, তেমনি চেহারা, কিন্তু মেজাজে সাহেবের বাবা! আসছে মেদিনীপুর থেকে, আমি আগেই খবর পেয়েছি; ওখানকার নাজির আমার বন্ধু কি না। সে লিখে পাঠালো—দাদা এবারে বাঘ যাচ্ছে—এখানকার তিনটে পেস্কারের চাকুরি খেয়েছে, সাবধানে থেকো। আমি লিখে পাঠালাম, ভয় ক'রো না—এখানে বাঘের ঘোগ আছে। জজ সাহেব তো চেষ্টায় আছেন আমার ভুল ধরবেন—হঠাৎ যখন তখন নথী তলব ক'রে বসেন। নাঃ, কোন দিনও কোন খুঁত পান না। অবশেষে যাওয়ার সময়ে সাহেব বলে গেলেন—পেস্কার বাবু, আপনার

মতো 'এফিসিয়েণ্ট অফিসার' এর আগে আমি দেখিনি। তবেই তো দেখ্‌লে নথী ঠিক থাকলে কারো বাপের সাধ্যে নেই কিছু বলে।

এই অত্যাশ্চর্য কাহিনী বলিয়া অবশেষে গলা খাটো করিয়া শ্যামাচরণের কানে কানে বলেন—আর একটা কথা, বিজয়া দশমীর পরে কাছারী খোলার দিন ছাড়া কখনো যেন 'দর্শনী' নিয়োনা!

রতনমণি বাবু 'ঘুষ' শব্দের পরিবর্তে 'দর্শনী' শব্দ ব্যবহার করেন। শ্যামাচরণ সব মন দিয়া শোনে—নথী ঠিক রাখিতেও তাহার আপত্তি নাই তবে শেষের উপদেশটি সে কি ভাবে পালন করিত সে সম্বন্ধে বিশদ আলোচনায় প্রবেশ না করিলেই তাহার প্রতি সুবিচার করা হইবে।

এই ভাবে দিনের পরে দিন, মাসের পরে মাস অতিবাহিত হয়। বড় পেস্কার বাবু পেন্সন লইয়াও আদালতের কর্মচারী শ্রেণীভুক্ত হইয়া কাজ করেন। কর্মচারীরা অপচ্ছন্দ করেনা, একে তো সবাই তাঁহাকে ভালোবাসে, তা ছাড়া হাতের কাজটা তাঁহার কাছে ফেলিয়া দিলে সম্পন্ন হইয়া যায়। সবাই জানে বিজয়া দশমীর পরে বড় পেস্কার বাবুর রুমালে কিছু দিতে হইবে—প্রধানতঃ কর্মচারীরাই দেয়; আগেকার মত তোড়া তেমন ভারি হয় না। রতনমণি বাবু হাসিয়া বলেন—পেন্সেনের মতো দর্শনীও আমার অর্ধেক হ'য়েছে।

আসল কথা, মানুষের জীবন ধারণের জন্য একটা মোহের আবশ্যক। তাই একটা না একটা মোহের সে সৃষ্টি করিয়া লয়। হাঁসের ডিমের ভিতরকার পাখীর পক্ষে যেমন ডিমের প্রয়োজন, নহিলে কোমল অঙ্গে বাহিরের ঘাত প্রতিঘাত সহ্য করিবে কেমন করিয়া? মানুষের পক্ষেও তেমনি প্রয়োজন একটা আবরণের। পাখীটা একটু শক্ত হইলেই খোলস ভাঙ্গিয়া আকাশে উড়িয়া যায় হংসরূপে; ভগ্নমোহ মানুষও তেমনি কৈবল্যের আকাশে পরমহংসরূপে উড়িতে থাকে। কিন্তু তেমন সৌভাগ্য কয়জনের ভাগ্যে ঘটে? অধিকাংশের জীবন ধারণের পক্ষে মোহাবরণ অত্যাবশ্যক। এই বড় পেস্কারের ভূমিকা রতনমণি বাবুর মোহাবরণ—ইহার ভঙ্গে হয় তাঁহার মুক্তি নয় তাঁহার মৃত্যু।

রতনমণি বাবুর পেন্সন লইবার পরে প্রায় দশ বৎসর গত হইয়াছে। এখন তিনি প্রায় চলৎশক্তি হীন বৃদ্ধ। তবু তাঁহার আদালতে আসিবার কামাই নাই। একজন চাকরে তাঁহাকে বাড়ী হইতে ধরিয়া আনিয়া পুরাতন চেয়ার খানাতে বসাইয়া দেয়। দৈবাৎ চেয়ার বদল হইলে তিনি ব্যস্ত হইয়া ওঠেন—

বলেন, আমার চেয়ারখানা গেল কোথায়। তাঁহার চেয়ার খুঁজিয়া আনিয়া তাঁহাকে বসাইয়া দেওয়া হয়—তিনি বসিয়া পড়িয়া চোখ বুঁজিয়া একটা আরামের দীর্ঘ 'আঃ' শব্দ করেন। রতনমণি বাবু প্রায় অন্ধ, চোখে অল্পই দেখেন—হাতে কলম সরে না, তবু এক গাদা নথী তাঁহার সম্মুখে রাখা চাই—তিনি সেগুলি নাড়াচাড়া করেন। এরূপে অভিনয় সাঙ্গ হইলে কাছারীর শেষে আবার চাকরের সাহায্যে বাড়ী ফিরিয়া যান। এই রকম চলিতেছিল—হয় তো তাঁহার জীবনের শেষ দিন পর্যন্ত এই ভাবেই চলিত—কিন্তু ইতিমধ্যে এক বিঘ্ন ঘটিল। সে বিঘ্ন আর কিছুই নয় এক বাঙালী আই-সি-এস-যুবক জজরূপে বদলি হইয়া আসিলেন। মাঝে মাঝে তিনি আদালতের সেরেস্তা প্রভৃতি পরিদর্শনের উদ্দেশ্যে কড়া তামাকের পাইপ টানিতে টানিতে এঘরে ওঘরে ঘুরিয়া বেড়াইতেন। এই জাতীয় পরিদর্শনে রতনমণি বাবুর ভয়ের কোন কারণ ছিল না—কারণ ইতিপূর্বে একাধিক জজ তাঁহাকে দেখিয়াও দেখে নাই; বুড়া মানুষের এই ছেলেমানুষিকে তাঁহারা স্নেহের চক্ষেই দেখিয়াছেন; একজন ইংরাজ জজ তো তাঁহাকে 'গ্র্যাণ্ড পা অব্ দি কোর্ট' পদবী আখ্যা দিয়াছিলেন। কিন্তু কর্তব্যপরায়ণ বাঙালী আই-সি-এস সেরেস্তাদারের অফিসে প্রবেশ করিয়া এদিক ওদিক ঘুরিতে ঘুরিতে রতনমণি বাবুর সম্মুখে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। রতনমণি বাবু উঠিয়া দাঁড়াইয়া সেলাম করিলেন। জজ সাহেব তাঁহাকে অগ্রাহ্য করিয়া সেরেস্তাদারকে ইংরাজিতে পুছিলেন—এই বৃদ্ধ লোকটি কে?

সেরেস্তদার বলিলেন—আমাদের পুরাতন পেস্কারবাবু।

বাঙালী জজ পাইপ কামড়াইতে কামড়াইতে বলিলেন—লোকটা এখানে কেন? সেরেস্তাদার বাবু দীর্ঘ-ব্যাখ্যা আরম্ভ করিলে মধ্য-পথে তাঁহাকে নিরস্ত করিয়া জজ বলিলেন—লোকটাকে বাহির হইয়া যাইতে বলো।

রতনমণি বাবু যেন কি বলিতে যাইতেছিলেন—কর্তব্য-পরায়ণ বাঙালী জজ হাঁকিলেন—চিপ্‌রাশি—

চাপ্‌রাশি শশব্যস্তে ছুটিয়া আসিল। জজ বলিলেন—বাবুকো বাহার দেখ্‌লাও। চাপরাশি রতনমণি বাবুর হাতে ধরিয়া আদালতের বাহিরে আনিয়া দাঁড় করাইয়া দিল। রতনমণি বাবুর চোখ দিয়া জল গড়াইতে লাগিল। অন্ধের চোখে দৃষ্টি নাই—কিন্তু জল আছে। কর্তব্য সমাধান করিয়া শিষ্ দিতে দিতে বাঙালী জজ খাস কামরায় ফিরিয়া গেলেন। কে বলিবে বাঙালী কর্তব্যপরায়ণ নহে?

বাড়ী ফিরিয়া সেই রাতেই রতনমণি বাবুর বিষম জ্বর হইল—এবং অল্প কয়েক ঘণ্টার মধ্যেই জ্বর ঘোর বিকারে পরিণত হইল। খবর পাইয়া আদালতের কর্মচারীগণ দেখিতে গেল—কিন্তু চৈতন্যহীন রতনমণি বাবু কাহাকেও চিনিতে পারিলেন না। ডাক্তার জবাব দিয়া চলিয়া গেল, বন্ধুরা হতাশ্বাসে স্তব্ধ হইয়া দাঁড়াইয়া রহিল—আর মুমূর্ষু রতনমণি বাবু বিকারের ঘোরে নথীর নম্বর হাঁকিয়া যাইতে লাগিলেন—

৭৭৩।২১ খাজনা

৩৯৩।২৩ মর্টগেজ

২৯১।২৪ মোৎফরাক্কা

…চিপ্ রাশি, বাবুকো বাহার দেখ্লাও…

…হুজুর, আমার নথী ঠিক আছে…

…না, না, আমি বাইরে যাবো না….

শ্যামাচরণ, নথী ঠিক থাক্‌লে আর কোন ভয় নাই…

…চিপ্ রাশি, বাবুকো বাহার দেখ্লাও…

…হুজুর, আমার নথীপত্র সব ঠিক আছে…

…না…না….আমি বাইরে যাবো না…

৭৭৩।২১ খাজনা

৩৯৩।২৩ মর্টগেজ

২৯১।২৪ মোৎফরক্কা…

সবাই বুঝিল আর কোন আশা নাই। তাহারা নীরবে দাঁড়াইয়া অশ্রুমোচন করিতে লাগিল—আর মুমূর্ষু পূর্বোক্তরূপ বকিয়া যাইতে থাকিল।

…না, না, হুজুর আমার নথী ঠিক আছে…

…৭৭৩।২১ খাজনা…

এইরূপ বকিতে বকিতে মুমূর্ষু ক্রমেই নিস্তেজ হইয়া পড়িতে লাগিল, সঙ্গে সঙ্গে তাহার বিকারের উক্তিও ক্ষীণ হইয়া আসিতে লাগিল। অবশেষে সন্ধ্যার কিছু আগে ঠিক আদালত ভাঙিবার সময়ে রতনমণি বাবু শেষ নিশ্বাস পরিত্যাগ করিলেন। এখানকার আদালতের লীলা তাঁহার শেষ হইল। বোধ করি উচ্চতর কোন আদালতে নথী পেশ করিবার উদ্দেশ্যে তিনি প্রস্থান করিলেন।

প্রকৃতিস্থ মানুষের কথার চেয়ে বিকারের রুগীর কথাই এ ক্ষেত্রে অধিকতর বিশ্বাসযোগ্য…হুজুর, আমার নথীপত্র সব ঠিক আছে। উচ্চতর আদালতে তাঁহার নথীতে কোথাও ভুলভ্রান্তি বাহির হইবে না, আর সেখানকার জজ যতই কর্তব্যপরায়ণ হোক এই বৃদ্ধকে চাপ্‌রাশি দিয়া ঘরের বাহির করিয়া দিবে না, ইহাও একপ্রকার নিশ্চিত।

গদাধর পণ্ডিত

(১)

নরেশচন্দ্র পাটের হাকিম হইয়াছে। জোড়াদীঘি গ্রামে তাহার আফিস। চাকুরিটি পাইয়া তাহার ভরসা হইয়াছিল, কলিকাতায় না হোক কোন জেলা-সহরে সে থাকিতে পাইবে। কিন্তু এমনি তাহার ভাগ্য যে, জেলা তো দূরে থাকুক, মহকুমাতে থাকাও ঘটিয়া উঠিল না—একেবারে গ্রামে আসিয়া বসিতে হইল। গ্রামে থাকিবার হুকুম পাইয়া তাহার কলিকাতাবাসী মন দুশ্চিন্তাগ্রস্ত হইয়া উঠিল—এমন কি একবার চাকুরি ইস্তফা দিবার কথাও চিন্তা করিয়া ফেলিল, কিন্তু বন্ধু ও আত্মীয়স্বজনের উৎপাতে কোন সৎকার্য করিবার কি উপায় আছে? তাহারা বুঝাইল, সরকারী চাকুরী হেলায় হারাইবার বস্তু নয়, বিশেষ করিয়া চিরকালই যে তাহাকে গ্রামে থাকিতে হইবে এমন নয়; চাকুরি পাকা হইলেই চেষ্টা-চরিত্র করিয়া সহরে ট্রান্সফার হইলেই চলিবে—এমন কত হইয়াছে। তা ছাড়া গ্রামে থাকিবার কতকগুলি সুবিধাও আছে, যেমন অনেক জিনিষ খুব সুলভ, আর অনেক জিনিষ আদৌ মেলে না—কাজেই সে-সব কিনিয়া বৃথা অর্থব্যয় করিতে হয় না। আর গ্রামে সেই একমাত্র সরকারী চাকর, কাজেই অখণ্ড সম্মান ভোগ করিতে পারিবে—সহরে পাটের হাকিমকে চেনে কে? এই সব যুক্তির তাড়নায় আর প্রয়োজনের তাড়াতেও বটে নরেশচন্দ্র জোড়াদীঘিতে গিয়া কাজে যোগ দেওয়া স্থির করিয়া ফেলিল।

ইহা ছাড়া আরও একটা কারণ ছিল, যাহা তাহার বন্ধুবান্ধবেরা জানিত না, কিন্তু পাঠকের জানিতে বাধা নাই নরেশচন্দ্র অল্প বয়স হইতেই আদর্শবাদী। ইস্কুলে পড়িবার সময়ে সে আচার্য প্রফুল্লচন্দ্রের বক্তৃতাদি শুনিত ও কাগজে পড়িত। তখন হইতেই সে স্থির করিয়াছিল যে গ্রামে গিয়া দেশের উন্নতি করিবে। কলেজে ঢুকিয়া রবীন্দ্রনাথের 'স্বদেশী সমাজ' পড়িয়াছে, গান্ধীজীর 'হরিজন' নিয়মিত পড়িত। কাজেই ইস্কুলের আদর্শবাদ বয়সের সঙ্গে সঙ্গে বাড়িয়াছে বই কমে নাই। কিন্তু অবশেষে সত্য সত্যই একদিন যে তাহাকে গ্রামে যাইতে হইবে, তাও আবার পাটের হাকিম হইয়া ইহা স্বপ্নাতীত ছিল। কলিকাতায় থাকিয়া গ্রামের উন্নতি—এই ছিল তাহার স্বপ্ন। হঠাৎ তাহার মনে হইল বিধাতা পুরুষ নিতান্ত কৃপাপরবশ হইয়াই গ্রামে তাহার চাকুরি করিয়া

দিয়াছেন—গ্রামের ও নিজের উভয়েরই উন্নতি হইবে—'এক ঢিলে দুই পাখী' প্রবাদের বাহিরেও মরে।

এমন সময় সে সহর হইতে তাহার বাল্যবন্ধু অভয়কুমারের এক পত্র পাইল। অভয়কুমার লিখিয়াছে যে, সে আজ কয়েক বৎসর সেখানে ইস্কুলের সাব-ইন্সপেক্টররূপে রহিয়াছে। সহরের অধীনেই জোড়াদীঘি গ্রাম; এই পথ ছাড়া জোড়াদীঘিতে যাইবার উপায় নাই। কাজেই নরেশ যেন আগে এখানে আসিয়া তাহার বাসায় ওঠে—তার পরে জোড়াদীঘিতে যাইতে পারিবে। অভয়কুমারের পত্র পাইয়া নরেশ অনেকটা আশ্বস্ত হইল—তাহা হইলে নিতান্ত সে জলে পড়িবে না। আর অভয় বাল্যকাল হইতেই বাস্তববাদী, সব দিক দিয়াই সে ছিল আদর্শবাদী নরেশের বিপরীত। নরেশ বুঝিল, বিদেশে নির্ভর করিবার মতো একটা লোক পাইবে। সংসারপটুতা বিষয়ে আদর্শবাদীরা বাস্তববাদীদের উপর নির্ভর করে, মনে মনে তাহাদের ঈর্ষা করে—ওইখানে বাস্তববাদের জিৎ।

(২)

জোড়াদীঘিতে আসিয়া নরেশচন্দ্র একেবারে মুষড়িয়া গেল। এতদিন সে সাহিত্যের ত্রিশিরা কাচের ভিতর দিয়া পল্লীকে দেখিত, পল্লী বড়ই মনোরম লাগিত। এবারে প্রথম বাস্তবে পল্লী দেখিল, সাহিত্যের বর্ণনার সঙ্গে যাহার কোন মিল নাই। তাহার আরও ধারণা হইয়াছিল, সে যখন পল্লীর প্রতি সহানুভূতি লইয়া আসিতেছে, পল্লীবাসীরা তাহাকে দু'হাত মেলিয়া আলিঙ্গন করিয়া লইবে। কিন্তু তেমন কিছুই ঘটিল না। এই সাহেবী পোষাকধারী ইংরাজি শিক্ষিত বিদেশী যুবককে গ্রামের লোক এড়াইয়া চলিতে লাগিল। দূর হইতে লোকে তাহাকে সেলাম করে কিন্তু তাহাতে প্রাণের টান নাই, সরকারী চাকুরির মোহ মাত্র আছে। এমন যে হইবে বন্ধু অভয়কুমার ইঙ্গিতে বলিয়াছিল কিন্তু আদর্শবাদী নরেশ তাহা বিশ্বাস করে নাই।

গ্রামের জমিদারের বৈঠকখানা বাড়ীতে সে আশ্রয় পাইয়াছে। জমিদারবাবু কলিকাতায় থাকেন, কাজেই বৈঠকখানায় তাহার একাধিপত্য। কলিকাতায় থাকিতে গ্রামের যে বর্ণনা পাইয়াছিল তাহার কতক অংশ সত্য বলিয়া বুঝিল। খাদ্যবস্তু যে এত সুলভ হইতে পারে ধারণা তাহার ছিল না। কাজ তাহার সামান্যই, অধিকাংশ সময় সে বই ও খবরের কাগজ পড়িয়া কাটাইয়া দেয়! গল্পগুজব করিবার বা আড্ডা দিবার মতো লোকের সঙ্গে এখনো তাহার আলাপ হয় নাই।

একদিন সকালে সে বসিয়া আছে এমন সময়ে একটি লোক তাহার কাছে আসিয়া উপস্থিত হইয়া মাথা হইতে একটা ঝুড়ি নামাইয়া সাষ্টাঙ্গে প্রণিপাত করিল। লোকটা বৃদ্ধ, শরীর কৃশ, মাথাভরা টাক, পরণে মলিন একখানি খাটো ধুতি।

লোকটি প্রণিপাত সারিয়া উঠিয়া হাত জোড় করিয়া বলিল—হুজুরের জন্য কিছু তরকারী এনেছি। নরেশ দেখিল, ঝুড়ির মধ্যে কুমড়ো, লাউ, বেগুন প্রভৃতি আনাজ।

নরেশ বলিল—তা বেশ করেছ, এর দাম কত?

বৃদ্ধ মৃদু হাসিয়া বলিল—এ আমার ক্ষেতের তরকারি—দাম আর কি? তা ছাড়া হুজুরের কাছে থেকে কি দাম নিতে পারি?

বিস্মিত নরেশ বুঝিতে পারিল না এই অনুগত লোকটি কে? সে শুধাইল—তুমি কে? তোমাকে তো আমি চিনি না।

বৃদ্ধ বলিল—হুজুরকে আমি খুব চিনি। আপনি মহামান্য ইন্সপেক্টার শ্রীল শ্রীযুক্ত অভয়কুমার রায়ের বন্ধু। হুজুর, আমি এখানকার পাঠশালার হেড পণ্ডিত।

এতক্ষণে নরেশের মনে পড়িল, অভয়কুমার তাহাকে এখানকার পাঠশালার কথা বলিয়াছিল বটে। অভয় তাহাকে বলিয়া দিয়াছিল, পাঠশালার প্রতি একটু দৃষ্টি রাখিও। হেড পণ্ডিত বেজায় ফাঁকিদার। সে আরও বলিয়াছিল, গ্রামের উন্নতি করিবার আশা ছাড়িয়া দাও। ও সব তোমার আমার কর্ম নয়। যদি পাঠশালার পণ্ডিতটাকে একটু শাসনে রাখিতে পার তবেই অনেক করা হইবে। নরেশ শুধাইয়াছিল, পাঠশালার পণ্ডিত তাহাকে মানিবে কেন? অভয় বলিয়াছিল, আরে তুমি যে সাহেবী পোষাক পর তাহাই যথেষ্ট। বিশেষ সে যখন জানিবে যে তুমি আমার বন্ধু, তখন আমার চেয়ে তোমাকে বেশী করিয়া মানিবে। নরেশ দেখিল তাহার কথাই সত্য। সে পাঠশালার সন্ধান লইবার আগেই পাঠশালা তাহার সন্ধান করিয়া লাউ এবং কুমড়ো লইয়া ভেট করিতে আসিয়াছে।

নরেশ বলিল—পণ্ডিত মশাই, এ সব তো আমি নিতে পারি না। এ যে প্রকারান্তরে ঘুষ নেওয়া।

এ রকম কথা পণ্ডিত জীবনে প্রথম শুনিল। সে একেবারে বসিয়া পড়িল। হাত জোড় করিয়া বলিল—হুজুর, ঘুষ দেওয়া বেআইনি এ কথা আমি জানি।

কিন্তু লাউ কুমড়ো কোন কালেই ঘুষ নয়, বিশেষ সবাই এসব জিনিষ নিয়ে থাকেন।

নরেশ বলিল—কিন্তু এত হাঙ্গামা করবার দরকার ছিল কি? আমার প্রয়োজন অতি সামান্য, আর এসব তো এখানে খুব সস্তা!

পণ্ডিত সপ্রতিভাবে বলিল—সেই জন্যই তো এনেছি হুজুর। দামী জিনিষ দেওয়ার মতো কি আমার অবস্থা?

এই সূত্র অবলম্বন করিয়া সহজেই পণ্ডিতের আর্থিক অবস্থার কথা আসিয়া পড়িল। নরেশ বলিল—আপনি বসুন। এই বলিয়া সে একটা মোড়া দেখাইয়া দিল। কিন্তু পণ্ডিতকে কিছুতেই বসাইতে পারিল না। পণ্ডিত ক্রমাগত বলে—হুজুর আমার অন্নদাতা, পিতৃতুল্য—তাঁহার সম্মুখে কি বসিতে পারি?

নরেশ শুধাইল—পণ্ডিত মশাই, আপনার স্যালারি কত?

এখন 'স্যালারি' কথাটা পণ্ডিত কোন জন্মে শোনে নাই—কি উত্তর দিবে?

নরেশ তাহার অজ্ঞতা বুঝিতে পারিয়া ব্যাখ্যা করিয়া শুধাইল—আপনি পান কত?

পণ্ডিত বলিল—হুজুর, চার টাকা।

চার টাকা। ব্যাপারটা পুরাপূরি বুঝিতে না পারিয়া নরেশ শুধাইল—মাসে?

পণ্ডিত বলিল—মাসে আর পাই কই হুজুর? পাঁচ, ছ মাস অন্তর টাকা আসে। এবারে তো এগার-মাস বাকি পড়েছে।

চার টাকা বেতন তার আবার এগার মাস বাকি! নরেশের মাথা ঘুরিতে লাগিল। তাহার মনে হইল বৈঠকখানার কড়িকাঠ ফাঁক হইয়া তাহার যত সদিচ্ছা ও গ্রামোন্নয়নস্পৃহা সোজা নির্ব্বাণলোকের দিকে প্রস্থান করিল।

নরেশ এবারে পুছিল—তবে আপনার চলে কি ক'রে?

পণ্ডিত বলিল—এই ক্ষেত খামার ক'রে, লাউ বেগুন লাগিয়ে।

ক্ষেত খামারের কথাটা নরেশের মন্দ লাগিল না, কারণ আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র বাঙ্গালীকে এই পরামর্শ বহুবার দিয়াছেন। কিন্তু পড়া কখন হয়? তাহার সমাধান তো আচার্যদেবের বক্তৃতায় নাই। কাজেই সে পুছিল—ক্ষেত খামার করা মন্দ নয় কিন্তু পাঠশালার কাজে অসুবিধা হয় না?

পণ্ডিত বলিল—পাঠশালার কাজে অসুবিধা! পাঠশালা আছে বলেই তো সুবিধা হয়, ছেলেগুলোকে নিয়ে লেগে যাই।

—তবে পড়ান কখন ?

—ওই কাজ করতে করতে। যেমন ধরুন, শশার মাচায় অনেক শশা ফলেছে। আমি বললাম—ওরে, নন্তু দেখত ক'টা শশা। নন্তু গুণে এলো তিন আর চার সাত, আর পাঁচ বারো, আর আট কুড়ি। যোগ শিক্ষা হ'ল। আবার ধরুন, যে দিন শশা তুলতে হবে সেদিন বিয়োগ শিক্ষা হ'ল। কুড়িটা শশার মধ্যে বারোটা তোলা হ'ল—থাকলো আটটা।

দেশজ কিণ্ডারগার্টেনের নমুনা পাইয়া নরেশ কৌতূহলী হইয়া উঠিল ; পুছিল—আর গুণ, ভাগ ?

পণ্ডিত হাসিয়া বলিল—ততদিন কোন ছাত্রই পাঠশালায় থাকে না। তার অনেক আগেই পাঠশালা ছেড়ে নিজের নিজের ক্ষেত-খামারে লেগে যায়।

—আপনার এই পড়াবার রীতি ইন্সপেক্টর সাহেব জানেন ?

—বিলক্ষণ। সেবারে যখন আমি শশার ক্ষেতে যোগ শিক্ষা দিচ্ছিলাম, হুজুর হঠাৎ সাইকেল করে এসে উপস্থিত। অমনি বিয়োগ শিক্ষাও দিলাম। তেত্রিশটা শশার মধ্যে তেইশটা তুলে হুজুরকে ভেট দিলাম। হুজুর সে কি খুশি !

এই পর্যন্ত বলিয়া একটু থামিয়া বলিল—হুজুর একদিন পাঠশালায় পায়ের ধুলো দেবেন।

নরেশ বলিল—অবশ্যই একদিন যাবো। কিন্তু আমার মনে হয় যে, আপনি কর্তব্য কার্যে অবহেলা করছেন।

নরেশের কথার সম্যক মর্ম বুঝিতে পারিলে পণ্ডিত হয়তো কাঁদিয়া ফেলিত, কিন্তু কি যে তাহার কর্তব্য এবং কিভাবে যে সে তাহা অবহেলা করিতেছে বুঝিতে না পারিয়া হুজুরকে পাঠশালা দর্শনের জন্য বারম্বার অনুরোধ করিয়া সে প্রস্থান করিল।

পণ্ডিতের সঙ্গে কথাবার্তা বলিয়া নরেশের মোহ-যবনিকার একপ্রান্ত কিঞ্চিৎ ফাঁক হইয়া গিয়াছিল বটে—কিন্তু তৎসত্ত্বেও তাহার বার বার মনে হইল—লোকটা জাতি গঠন কার্যে বিষম অবহেলা করিতেছে, ইহার একটা ব্যবস্থা করা প্রয়োজন। কিন্তু একবারও তাহার মনে হইল না, যে কাজের মাসিক বেতন চার টাকা এবং তাহাও এগার মাস বাকি পড়ে—সে কাজের অবহেলার অভিযোগ একেবারে অচল। তাই কেহ অভিযোগও করে না, মাহিনাও মিটায় না—অনেক দিন হইল একটা বোঝাপড়া হইয়া গিয়াছে। শূন্য উদরের উপর কাহারো দাবী নাই—সে দাবী যতই না কেন মহৎ হোক।

(৩)

বাজারের কাছে ছোট একখানি চার-চালা ঘরে গদাধর পণ্ডিতের পাঠশালা বসিয়াছে। চারচালাখানার খড় জীর্ণ, মেঝে কাঁচা, বেড়া ভাঙ্গা। তারই মধ্যে কোন রকমে তিনটা ভাগ। একদিকে চিনি, বাতাসা, গুড় প্রভৃতির ছোট একখানা দোকান। সেখানে গদাধর পণ্ডিত উপবিষ্ট; হাঁটু পর্যন্ত ধুতি, কাঁধের উপরে একখানা গামছা, গলায় মলিন উপবীত, হাতে একখানা ছড়ি। সেই ছড়িখানাই বোধ করি পণ্ডিতের পাঠশালার রাজদণ্ড। কিন্তু সেখানা দিয়া যে কেবল ছাত্র তাড়না চলে এমন মনে করিলে ভুল হইবে; ছাত্র তাড়নায় অবশ্য সেটা লাগে—কিন্তু এখন দোকানের মাছি তাড়াইবার কাজে নিযুক্ত। গদাধর বসিয়া দ্বিপ্রাহরিক নিদ্রার আমেজে ঢুলিতেছে, আর মাঝে মাঝে অসুচ্চস্বরে বলিতেছে—পড়্, পড়্। যাহাদের উদ্দেশ্যে এই উপদেশ উচ্চারিত—তাহারা, গুটি আট-দশ বালক মাঝখানের ঘরে হুটোপাটি করিতেছে।* তৃতীয় ঘরটায় কয়েকটা গোরু বসিয়া রোমন্থন কার্যে নিরত। পাঠশালার অদূরে বিখ্যাত সেই শশার মাচা—সেখানে ছাত্ররা যোগ বিয়োগ শিক্ষা পাইয়া থাকে।

একদিন দুপুর বেলা নরেশচন্দ্র পাঠশালা পরিদর্শন করিতে আসিয়া উপস্থিত হইল। তাহাকে দেখিয়া গদাধর শশব্যস্তে উঠিয়া পাশের দোকান হইতে একটা মোড়া আনিয়া দিয়া বলিল—বসুন হুজুর। তারপর হাত জোড় করিয়া বলিল—একেবারে খবর না দিয়ে—

নরেশ বলিল—ইচ্ছে করেই খবর না দিয়ে এসেছি—কি রকম কাজ চলে দেখবার জন্যে।

তারপর দোকানখানার দিকে চাহিয়া বলিল—এ কি, দোকানও চালান নাকি?

গদাধর পণ্ডিত বলিল—আজ্ঞে, না চালিয়ে করি কি? ছেলেমেয়েতে চারটি। বিশেষ, এতে ছেলেদের মণকিয়া, শেরকিয়া শিখবার সাহায্য করে।

—কই, আপনার ছাত্রসব কই?

পণ্ডিত হাঁকিয়া উঠিল—ওরে নস্তু, গদা, রতা, পল্‌তা—সব কোথায় গেলি? হুজুর এসেছেন যে, সেলাম ক'রে যা।

কিন্তু পণ্ডিতের আদেশ সত্ত্বেও কেহ আসিল না। আসিবে কে? ছাত্রেরা কেহই নাই।

পণ্ডিত বলিল—হুজুর, সবাই ছিল। আপনার সাহেবী পোষাক দেখে সব ভয়ে পালিয়েছে। দুর্, দুর্, দুর্—

শেষোক্ত সাবধান বাণী একটি কুকুরের প্রতি।

নরেশ বলিল—ও ঘরটাতে আবার গোরুও ঢুকিয়েছেন দেখছি।

গদাধর হাসিয়া বলিল—ঠিক তা নয়, আমরাই গরুর ঘরে ঢুকেছি।

তার পরে ব্যাখ্যা করিয়া বলিল—পুরানো পাঠশালা ঘরখানা ও বছর পুড়ে যায়। সদরে লেখালিখি করে ঘর তুলবার টাকা পাওয়া যায় না। অবশ্য ইন্সপেক্টর সাহেব বলেছেন যে, এজন্যে বারো টাকা দেবেন। কিন্তু দু' বছর হ'য়ে গেল—টাকা এলো না। কাজ তো চালান চাই। তখন বাজারের দোকানদারদের ধরলাম। তারা এই ঘরখানা তুলে দিল। সর্ত এই হ'ল যে, এর একখানা কামরায় তাদের গোরুগুলো থাকবে। কাজেই হুজুর, এ-ঘরে ওদেরও যে অধিকার, আমাদেরও সেই অধিকার।

পাঠশালার আগুন্ত স্বচক্ষে দেখিয়া নরেশের কেমন বিভ্রান্তি ঘটিল। যে শিক্ষাসূত্রের এঁকটা দিক সে বিশ্ববিদ্যালয়ে দেখিয়াছে তাহারই অপর দিকটা যে খড়ের জীর্ণ চারচালায় আসিয়া পর্যবসিত—যাহাতে গরু ও মানুষের সমান অধিকার—ইহা তাহার কল্পনারও অতীত ছিল। কিন্তু কেন জানি না তাহার মনে হইল, ইহার জন্য এই পণ্ডিতই দায়ী, আর কেহ নয়।

গদাধর বলিল—হুজুর ঐ আমার শশার মাচা—ওখানে ছাত্ররা যোগ বিয়োগ শিখে থাকে। একবার দয়া করে পদার্পণ—

নরেশ ক্রুদ্ধভাবে বলিল—না থাক, আর দরকার নেই।

সে পাঠশালা পরিত্যাগ করিয়া বাসায় চলিয়া গেল। বাসায় গিয়া সে অভয়কুমারকে দীর্ঘ পত্র লিখিয়া পাঠশালা ও পণ্ডিতের সমস্ত ব্যাপার জানাইল এবং মন্তব্য প্রকাশ করিল যে, এ সমস্তের জন্যই পণ্ডিত দায়ী। তাহাকে অবিলম্বে পদচ্যুত না করিলে জাতি-গঠন সম্ভব হইবে না। যেন ওই গদাধর পণ্ডিতই জাতি-গঠনের পথে ঐরাবতের বাধা সৃষ্টি করিয়া দণ্ডায়-মান। যেন ওই একটিমাত্র বাধা অপসৃত হইলেই জাতীয় জীবনের জাহ্নবী ধারা অনর্গল গতিতে প্রবাহিত হইবে। চিঠিখানা লিখিয়া ডাকে দিয়া নরেশ অনেকটা স্বস্তি বোধ করিল। জাতির প্রতি কর্তব্য যেন তাহার সমাপ্ত হইল।

আট দশ দিন পরের কথা। একদিন বিকাল বেলা নরেশ বেড়াইয়া ফিরিতেছে। গ্রামের এ দিকটায় সে ইতিপূর্বে আসে নাই। একজনকে পুছিল—ওই বাড়ীটি কার?

লোকটা বলিল—ওটা গদাধর পণ্ডিতের বাড়ী।

নরেশের কৌতূহল হইল গদাধর পণ্ডিতের বাড়ীখানা একবার দেখিয়া আসে। সে বাড়ীর কাছে গিয়া দেখিল, বাড়ী তো ভারি। জীর্ণ খান দুই খড়ের ঘর—চারিদিকে আগাছার জঙ্গলে পরিবেষ্টিত। সে দাঁড়াইয়া গদাধর পণ্ডিতের নাম ধরিয়া ডাকিতে সুরু করিল। পাঁচ সাতবার ডাকিবার পরেও কোন উত্তর আসিল না, অথচ ভাঙা বেড়ার ফাঁক দিয়া লোকের আভাস পাওয়া যাইতেছে। গদাধর পণ্ডিতের গার্হস্থ্য জীবনের পরিচয় লাভের লোভ সম্বরণ করিতে না পারিয়া সে বেড়া ধাক্কাইতে সুরু করিল। তখন ছোট্ট কাঠের একটা জানালা খুলিয়া গেল এবং ভিতর হইতে গদাধর পণ্ডিত বলিল—হুজুর, বেড়া ধাক্কাবেন না, বেড়া পড়ে যাবে।

নরেশ রুষ্টভাবে কহিল (সে দিনের পর হইতে সে পণ্ডিতের উপর রাগিয়া আছে)—ভিতরে কি করছেন? আসুন না। এতক্ষণ ডাকাডাকি করছি—আচ্ছা ভদ্রলোক তো!

পণ্ডিত বলিল—ডাক শুনছি হুজুর, কিন্তু বাইরে যাবার উপায় নেই।

অপমানিত বোধ করিয়া নরেশ বলিল—কেন?

গদাধর বলিল—আমরা স্ত্রী-পুরুষে নল-দময়ন্তীর পালা অভিনয় করছি।

নরেশ কিছুই বুঝিতে না পারিয়া বলিল—ঠাট্টা করবার আর লোক পেলেন না?

—সর্বনাশ, হুজুরের সঙ্গে কি ঠাট্টা করতে পারি!

তারপরে সে ঘরের মধ্যে কাহার প্রতি লক্ষ্য করিয়া বলিল—আঃ, তুমি একটু চুপ করো তো। হুজুরকে বল্‌বো না তো কাকে বল্‌বো? এবারে হুজুর জানলেন—দেখো এবারে কাপড় মেলে কি না।

এ পর্যন্ত বলিয়া সে পুনরায় নরেশকে লক্ষ্য করিয়া সুরু করিল—হুজুর, স্ত্রী-পুরুষে মিলে আমাদের দু'খানা বস্ত্র, দুখানাই ধুতি। একখানা আমি পরি, একখানা আমার সহধর্মিণী পরে। পরতে পরতে যখন খুব ময়লা হয়, তখন কেচে নিতে হয়। রবিবারটা ছুটি—আজ একখানা কেচে শুকোতে দিয়েছি। যতক্ষণ না শুকোচ্ছে আমরা স্ত্রী-পুরুষ একখানা ধুতির দুই দিক জড়িয়ে ঘরে বন্ধ হ'য়ে থাকি। এ সেই নল-দময়ন্তীর কথা আর কি? ভাগ্যিস্ পুরাণে এই গল্পটা ছিল—নইলে কি যে করতাম হুজুর। এই বলিয়া সে খুব একটা সপ্রতিভের হাসি হাসিল। নরেশ হাসিবে কি কাঁদিবে স্থির করিতে না পারিয়া প্রস্থান করিল।

বাসায় আসিয়া একখানা ধুতি চাকরের হাতে দিয়া সে পণ্ডিতের বাড়ীতে পাঠাইয়া দিল। বাঙ্গালা দেশের লোক সে, দারিদ্র্য দেখিয়াছে, দারিদ্র্যের নগ্নরূপও দেখিয়াছে—কিন্তু নগ্নতা ঢাকিবার এমন পৌরাণিক প্রয়াস যে ঘটিতে পারে তাহা সে কল্পনাও করিতে পারে নাই। হাসির ছটায় দারিদ্র্য যে কি মর্মান্তিক তাহা এই প্রথম সে দেখিল। আজকার ঘটনায় গদাধর পণ্ডিতের সম্যক চেহারা তাহার চোখে পড়িল। এমন হত-দরিদ্রের হাতে যাহারা জাতি-গঠনের ভার দিয়া নিশ্চিন্তে বসিয়া থাকে—দোষ সেই জাতির। গদাধর পণ্ডিতকে সমস্ত দায়িত্ব-মুক্ত বলিয়া এবারে তাহার ধারণা হইল। তাহাকে বরখাস্ত করিবার জন্য চিঠি লিখিয়া ফেলিয়াছে বলিয়া তাহার আক্ষেপ হইল। স্থির করিল, কালকার ডাকেই অভয়কুমারকে সব ঘটনা লিখিয়া জানাইবে—পণ্ডিতের চাকুরির যেন কোন ক্ষতি না হয়।

এই ঘটনার পরে সে আর কখনো গদাধর পণ্ডিতের পাঠশালায় বা বাড়ীতে যায় নাই, পণ্ডিতকে এড়াইয়া চলিতে চেষ্টা করিত। তাহার কাছে নিজেকে অপরাধী বলিয়া তাহার মনে হইত। এমন সময়ে সে একদিন অভয়কুমারের চিঠি পাইল। অভয়কুমার পণ্ডিতের কার্যে অবহেলার বিষয়ে তাহার সঙ্গে একমত। সে লিখিয়াছে যে, আমি গদাধর পণ্ডিতকে পদচ্যুত করিবার ব্যবস্থা করিলাম। শীঘ্রই অন্য পণ্ডিত যাহাতে ওখানে নিযুক্ত হয় তাহার ত্রুটি করিব না, আর তুমি যে কষ্ট স্বীকার করিয়া এদিকে দৃষ্টি দিয়াছ এজন্য ধন্যবাদ জানিবে। চিঠিখানা পড়িয়া নরেশ একেবারে বসিয়া পড়িল। তাহার দ্বিতীয় পত্র কি যথাসময়ে পৌঁছায় নাই? গড়িমসি করিয়া চিঠি লিখিতে দু'চার দিন বিলম্ব হইয়া গিয়াছিল। এখন সে গদাধর পণ্ডিতকে কি বলিবে? তাহার জন্যই যে পণ্ডিতের চাকুরী গেল—ইহা তো বুঝিতে বাধিবে না। এখন উপায় কি? পণ্ডিত অবশ্য কাজকর্ম কিছুই করে না, কিন্তু চার টাকা মাহিনার এগার মাস বাকি পড়িলে কি খাইয়া কাজ করিবে? ছেলেমেয়ে, স্ত্রী-পুরুষে যে তাহারা ছয়টি প্রাণী। আদর্শবাদের ঝোঁকে সে কি করিতে কি করিয়া ফেলিল!

পরদিন সকাল বেলা নরেশ একাকী বসিয়া আছে এমন সময়ে অপ্রত্যাশিত-ভাবে গদাধর পণ্ডিত আসিয়া উপস্থিত। নরেশ পালাইতে পারিলে বাঁচিত, কিন্তু সে পথ ছিল না।

পণ্ডিত সাষ্টাঙ্গে প্রণিপাত করিয়া বলিল—হুজুর, আমার চাকুরিটা গিয়াছে। এবারে বোধ হয় আমার দুরবস্থা ঘুচবে।

এই বলিয়া সে হাসিতে লাগিল। এরকম তৃপ্তির হাসি নরেশ তাহার মুখে আর কখনো দেখে নাই।

পণ্ডিত গদগদ কণ্ঠে বলিয়া চলিল—ইচ্ছে থাক্‌লেও চাকুরিটা ছাড়া সম্ভব হয় নি। তিন পুরুষ হ'ল আমরা এই কাজ করছি। সে কি সহজে ছাড়া যায়? অথচ জানতাম, একটু নড়াচড়া করলেই দু'পয়সা বেশি আনতে পারি। এবারে সেই সুযোগ মিল্‌লো।

নরেশ অপরাধীর কণ্ঠে বলিল—তা এ কথা আমাকে জানাবার কারণ কি?

পণ্ডিত বলিল—শুনছিলাম হুজুরের এক জন পাচক ব্রাহ্মণের দরকার। আমি তো ব্রাহ্মণ, ভাবলাম একবার জেনেই আসি—এখন তো আর পাঠশালার হাঙ্গামা নেই।

নরেশ ইহার কি উত্তর দিবে? পণ্ডিতের কথায় তাহার আদর্শবাদের মাথায় 'এটম বোম' নিক্ষিপ্ত হইল। যে-দেশের পাঠশালার পণ্ডিত চাকুরি গেলে খুশি হয়—অপরের পাচকবৃত্তিকে শ্রেয়ঃ মনে করে, মনে করে এবার তাহার সাংসারিক উন্নতি হইবে—সেদেশের কি আর ভবিষ্যৎ বলিয়া কিছু আছে!

সে তখন পণ্ডিতকে একটা ছুতানাতা করিয়া বিদায় দিল। আর সেই রাত্রেই সে গ্রাম ত্যাগ করিয়া কলিকাতায় রওনা হইল। কলিকাতায় পৌঁছাইয়াই চাকুরিতে ইস্তফা পত্র পাঠাইয়া দিল। তারপরে আর কখনো সে দেশের উন্নতি করিতে চেষ্টা করে নাই। এখন সে সিভিল সাপ্লাই-এ কাজ করে, বেতন মোটা।

এক গজ মার্কিন ও এক চামচ চিনি

(১)

মে মাসের দুপুর, বেলা আড়াইটা, কিম্বা তিনটা হওয়াও বিচিত্র নয়। বাহির হইতে হইবে, অনেকক্ষণ আগেই বাহির হওয়া উচিত ছিল, কিন্তু রৌদ্রের দিকে তাকাইবামাত্র সমস্ত কর্মস্পৃহা লুপ্ত হইয়া যায়। জরুরি কাজের জন্য একজনের সঙ্গে বেলা দেড়টায় দেখা করিবার কথা—গড়িমসি করিতে করিতে প্রায় তিনটা বাজিল। আর বিলম্ব নয় ভাবিয়া উঠিয়া পড়িলাম। জামা কাপড়গুলাও আগুনের মতো গরম। কোন মতে একটা জামা গায়ে চাপাইয়া, ছাতা-টা হাতে লইয়া আর একবার চিন্তা করিয়া লইলাম। জানালা দিয়া দেখা যাইতেছে বাহিরে রৌদ্রের জহরাগ্নির শিখা। রাজপুতরমণীর নিষ্ঠা থাকিলে নিশ্চিন্তমনে এমন অগ্নিসমুদ্রে আত্মসমর্পণ করা যায়—কিন্তু আমি যে নিরীহ বাঙ্গালী ভদ্রলোক। রাজপুতরমণীর সহিষ্ণুতার জন্য বৃথা আক্ষেপ করিয়া লাভ নাই ভাবিয়া বাহির হইতে যাইব এমন সময়ে পাশের ঘর হইতে শুনিলাম—বেরোচ্ছ নাকি? একবার শুনে যেয়ো। আমার সহধর্মিণীর কণ্ঠস্বর।

পাশের ঘরে প্রবেশ করিয়া দেখি ধৌত-শীতল মসৃণ মেঝের উপরে, দ্রুত ঘূর্ণ্যমান বৈদ্যুতিক পাখার নীচে, খস্‌খসের সিক্ত সুগন্ধি পর্দা খাটানো জানালার পাশে একটি বালিশ আশ্রয় করিয়া আমার সহধর্মিণী 'সাহারা অতিক্রম' নামে একখানি ভ্রমণ পুস্তক পাঠ করিতেছেন। পদশব্দে আমার অস্তিত্ব উপলব্ধি করিয়া বলিলেন আচ্ছা, সাহারা মরুভূমিতে কি সত্যই এই রকম গরম?

আমি বলিলাম—তোমার এই ঘরটির চেয়ে কিছু বেশী গরম বই কি?

আমার নির্বুদ্ধিতায় বিস্মিত হইয়া (আজও তাহার বিস্ময় গেল না) বলিলেন—না গো না, এই কল্‌কাতা সহরের চেয়ে—

বাক্যটি সমাপ্ত হইবার আগেই বলিলাম—বেশি গরম না হ'তেও পারে।

—তবে ওদের এতো বড়াই কিসের—বলিয়া গৃহিনী মুখ খুলিলেন। ভাবিলাম বলি, কলিকাতা সহরে যে কত গরম তাহাতো তোমার বুঝিবার কথা নয়, কিন্তু মনের কথা মনেই রহিল, গৃহিণীর কাছে সব ভাব প্রকাশ বুদ্ধিমানের লক্ষণ নয়।

এতক্ষণে তিনি আমাকে ভালো করিয়া নিরীক্ষণ করিয়া বলিলেন—বেরোচ্ছ বুঝি?

তারপরে একটু থামিয়া বলিলেন—তোমাদেরই জীবন সুখের। আমরা চিরকাল ঘরেই বদ্ধ হয়ে রইলাম!

কথাটা সর্বৈব মিথ্যা নয়, বাড়ীতে এবং সিনেমা, থিয়েটারের ঘরে দিবা রাত্রির অনেকটা সময় তিনি বদ্ধ হইয়া থাকেন সত্য। একটি দীর্ঘনিশ্বাস চাপিয়া গেলাম। দীর্ঘনিশ্বাসেরও কৈফিয়ৎ দিতে হয়।

গৃহিণী বললেন—এক কাজ করো তো। আস্‌বার সময়ে এক গজ মার্কিণ নিয়ে এসো তো।

মার্কিণ! গৃহিণী কি জাগ্রত না সুপ্ত! প্রলাপ নয় তো? না, কিছুক্ষণ আগে পিতৃ-প্রেরিত মণি-অর্ডার-টি স্বহস্তে স্বাক্ষর করিয়া লইয়াছেন, কাজেই প্রলাপ বলি কি করিয়া? মাথা-টা ঘুরিয়া গেল—আর একটু হইলেই পড়িয়াছিলাম আর কি? টেবিল-টা আশ্রয় করিয়া কোন মতে রক্ষা পাইলাম।

কি বলি? কন্‌ট্রোলের কথা কি গৃহিণী জানেন না? কন্‌ট্রোল হইবার পর হইতে চিনি ও কেরোসিন তৈল পাওয়া যায় না বলিয়া অনেক সময়ে তিনি আমাকে গঞ্জনা দিয়াছেন। আর বস্ত্র-কন্‌ট্রোলের কথা কি অবগত নহেন?

বলিলাম: মার্কিণ তো পাওয়া যায় না?

—তবে লংক্লথ এনো, বলিয়া তিনি পাতা উল্টাইলেন।

সাহস সঞ্চয় করিয়া বলিলাম—তুমি তো নিয়মিত খবরের কাগজ (অর্থাৎ বিজ্ঞাপন) পড়ো—কাপড় যে পাওয়া যায় না তা কি জানো না?

এবারে 'সাহারা অতিক্রম' রাখিয়া সহধর্মিণী আমাকে লইয়া পড়িলেন—ওই তোমার এক কথা! পাওয়া যায় না! সবাই পায় আর তুমি পাওনা কেন?

আমি বলিলাম—কেউ পায় না।

—খুব পায়। ওই বলিয়া তিনি বিশ পঁচিশটি ব্যক্তির নাম করিয়া গেলেন যাহাদের অধিকাংশই এখনো অজাত কিম্বা বহু কলে মৃত। তারপরে একটু থাকিয়া ঘুষ-ব্যঞ্জক স্বরে বলিলেন—যায়, যায় পাওয়া যায়, একটু খুঁজে পেতে এনো।

স্ত্রীলোকের সঙ্গে তর্ক করা বৃথা কাজেই আর দ্বিরুক্তি না করিয়া বাহির হইয়া পড়িলাম। আমার সহধর্মিণী 'সাহারা অতিক্রম' করিতেছেন ভাবিয়া তাঁহার জন্ত উদ্বেগ বোধ করিতে করিতে কলিকাতার রৌদ্র-সমুদ্রে ডুবুরীর মতো নিমগ্ন হইলাম—একগজ মার্কিণ মুক্তার আশায়।

(২)

মশাই মার্কিণ আছে ?

অপর পক্ষ নীরব। ইহা আমার সপ্তম দোকান, কেহই কথা বলে নাই, তবু এখনো আশা আছে, রবার্ট ব্রুস নাকি অষ্টম বারে কৃতকার্য হইয়াছিলেন। এবারে ভাগ্য অপেক্ষাকৃত প্রসন্নতর, দোকানী কথা বলিল। সে একটা বিড়ি নিজে ধরাইয়া, আর একটা আমার দিকে ছুঁড়িয়া দিয়া বলিল, নিন ধরান। আমি বিড়ি খাই না, কিন্তু মার্কিণের কিছু সুরাহা হইতে পারে ভাবিয়া তাহাকে খুশী করার আশায় বিড়ি-টি ধরাইলাম। সহৃদয় দোকানী বলিল—মশয়, আপনি ভদ্দরলোকের ছেলে, লেখাপড়া জানেন বলেই মনে হচ্ছে, কাপড় যে পাওয়া যায় না—তা কি এখনো জানেন না ? আমি অনেকক্ষণ থেকে দেখ্‌ছি আপনি দোকানে দোকানে অনর্থক ঘুরে বেড়াচ্ছেন। ও রকম ক'রে কাজ হয় না।

এই কথায় যেন ক্ষুদ্র একটুখানি আশার আলো দেখিতে পাইলাম—দুস্তর বাধার মধ্যে সূক্ষ্ম জীবন-টানেলের রন্ধ্রপথে একটুখানি আলো। 'ও রকম ক'রে কাজ হয় না।' তবে কাজ হইবার অন্য এক রকম পন্থা নিশ্চয় আছে। তখনি চকিতের মতো সেই অতি পুরাতন অথচ চির নূতন, পরিচয়াতীত অথচ সদা প্রত্যক্ষ, ধনীর সান্ত্বনা আর দরিদ্রের স্বপ্ন, বহুজনকাম্য অথচ স্বল্প জনলভ্য সেই শব্দটি মনে পড়িয়া গেল—"ব্ল্যাক মার্কেট"। এদিক্ ওদিক্ তাকাইয়া বলিয়া ফেলিলাম—ব্ল্যাকমার্কেটে পাওয়া যায় না ?

সে কোন দিকে না তাকাইয়া (আমাকে চিনিয়া ফেলিয়াছিল) বলিল—পাওয়া যায়। তবে আপনাকে বেচবে কেন ?

—কেন ?

—কেন ? ব্ল্যাক মার্কেটের খদ্দের মোটর গাড়ী থেকে নামে, হীরার আংটির ঝলক তুলে রূপোর সিগারেট কেস্ থেকে ফৌজি সিগারেট বের ক'রে 'অফার' করে ; নিজেই সে অন্য জিনিষের ব্ল্যাক মার্কেটের বিক্রেতা ; সোণার তাল আর কোথাও জমিয়ে রাখতে সাহস না ক'রে দাঁতগুলো সোণা দিয়ে বাঁধিয়ে নিয়েছে ; আপনার মতো পুঁই ডাঁটা খাওয়া-চেহারার ব্ল্যাক-মার্কেট-রহস্যে প্রবেশ নিষেধ !

লোকটা কি অন্তর্যামী নাকি ! আমি পুঁই ডাঁটা খাই, লেখা পড়া জানি এবং ভদ্রলোকের ছেলে, এসব গুহ্য তথ্য জানিল কেমন করিয়া ?

আমি বলিলাম—মশাই, সব কথাই তো বুঝলাম কিন্তু এখন মার্কিণ না নিয়ে বাড়ী ফিরি কি উপায়ে ?

লোকটি হাসিয়া বলিল—ওঃ গিন্নি বুঝি রাগ করবেন ?

—নাঃ আর সন্দেহ নাই যে লোকটা অন্তর্যামী। সম্ভবতঃ শাপভ্রষ্ট কোন দেবতা।

আমি দুঃখে ও সহানুভূতিতে বিগলিত হইয়া বলিলাম—আজ্ঞে ঠিক বলেছেন।

লোকটি বলিল—কোন ভয় নেই। ওষুধ শিখিয়ে দিচ্ছি। কাছে আসুন।

এই বলিয়া গুরু যেমন শিষ্যের কানে ইষ্ট-মন্ত্র প্রদান করে, তেমনি করিয়া তিনি (সে বলিতে আর ইচ্ছা করিতেছে না) কয়েকটি কথা বলিয়া দিলেন। এক মুহূর্ত্তে আমার দ্বিধা দুঃখ দূরীভূত হইয়া নবীন জীবন প্রাপ্ত হইলাম। এতক্ষণ পৃথিবী-টাকে এক খানা ছিন্ন কন্থার মতো বোধ হইতেছিল, এক নিমেষে তাহা বাদশাহী কিঙ্খাবে পরিণত হইল। আমি তাঁহাকে প্রণাম ও নমস্কারের মাঝামাঝি একটা মুদ্রা করিয়া দ্রুতপদে গৃহের উদ্দেশ্যে রওনা হইলাম।

বাড়ীতে ঢুকিয়া দেখিলাম এতক্ষণে 'সাহারা অতিক্রম' সমাধা করিয়া গৃহিণী শয্যা ত্যাগ করিয়াছেন। তিনি আমাকে আক্রমণ করিবার পূর্ব্বেই আমি বলিয়া বসিলাম—কোথায় গো ? শীগ্গীর্ শীগ্গীর্ এক কাপ চা নিয়ে এসো! চা দিয়ে তোমার মার্কিণ নিয়ে যাও।

খবরের কাগজে জড়িত একটি পুঁটুলির মতো হাতে ছিল, খবরের কাগজ-খানা দোকানীর দয়ার দান।

—কই চা আনো, আর এই মার্কিণ নিয়ে যাও। এর জন্য কি অল্প ঘুরতে হ'য়েছে।

আমার প্রথম সাড়া পাইয়া গৃহিণী নিজের অস্তিত্ব বিজ্ঞপিত করিয়া দিলেন, এবারে চায়ের তাগিদে একেবারে নীরব। কোন সাড়াশব্দ নাই।

বাস্তবিক দোকানী যে শাপভ্রষ্ট তাহাতে সন্দেহ ছিল না, নতুবা সে কি করিয়া জানিল যে আমার ঘরে চায়ের চিনি নাই—এবং চিনির অভাবে চা না দিতে পারিয়া লজ্জিত গৃহিণী আত্মগোপন করিবেন।

আমি নীচের তলায় বৈঠকখানায় বসিয়া ক্রমাগত হাঁকিতেছি—কই গো, চা আনো আর মার্কিণ নাও। গৃহিণী আর দেখা দেন না। তাঁহার দেখা না পাইয়া এত খুশী আর কখনো হই নাই। তিনিও কি অনুরূপ খুশী হইতেছিলেন।

চা আসিল না, কিন্তু গৃহিণীও আসিলেন না।

গৃহিণী আসিলেন সেই রাত্রে আহারের সময়ে। পুছিলেন—কখন এলে ?

—সেই বিকেল বেলা। তোমাকে কত ডাকলাম, কোথায় ছিলে ?

তিনি বলিলেন, তুমি বের হবার পরেই আমি ওদের বাড়ীতে বেড়াতে গিয়েছিলাম।

ওরা আমাদের এক প্রতিবেশী।

গৃহিণী মার্কিণের কথা তুলিলেন না দেখিয়া আমিও আর চায়ের কথা তুলিলাম না ঃ আহারান্তে গৃহিণী স্বীকার করিলেন সাহারা গরম কিন্তু কলিকাতা সহরও কম গরম নয়—আমি যেন আর দুপুর বেলা কখনো না বাহির হই—এই অনুরোধটি তিনি করিলেন। আমি সম্মত হইলাম।

সিন্দুক

পাশের ঘরে সদ্য মৃত রামবাবুর দেহটি পড়িয়া আছে আর এ ঘরে তাঁহার চারি পুত্র পিতার সিন্দুকটি জড়াইয়া পড়িয়া আছে, নড়েও না চড়েও না। দৃশ্যটি সময়োচিত নয়, কিন্তু সংসারে সময়োচিত কয়টা ঘটনা ঘটে? রামবাবু বিপত্নীক, কাজেই কাঁদিবার আসল লোকটি ছিল না; আর যাহাদের কাঁদিবার কথা তাহাদের বিষয় তো উল্লেখ করিলাম। শ্মশানে যাইবার সময় অতিক্রান্ত হয় অথচ পুত্রদের সেদিকে দৃষ্টি নাই, অবশেষে পাড়াপ্রতিবেশী উদ্যোগী হইয়া মৃতদেহ সৎকারের জন্য লইয়া গেল—পিতৃশোকাতুর পুত্রেরা পৈত্রিক সিন্দুকটি বুকে জড়াইয়া মৃতবৎ পড়িয়া রহিল।

বিচক্ষণ পাঠক ইতিমধ্যে নিশ্চয় বুঝিতে পারিয়াছেন যে সিন্দুকটি সামান্য নহে। বাস্তবিক, সিন্দুকটির একটু ইতিহাস আছে, অথবা সিন্দুকটিই ইতিহাস। সেই ইতিহাসই এই কাহিনীর বর্ণনীয়।

রামবাবু গ্রামের মধ্যে ধনী; তাঁহাকে গাঁয়ের লোক মানে, পাঁচ গাঁয়ের লোক চেনে, দশ গাঁয়ের লোকে ধনীর দৃষ্টান্ত নিতে হইলে এক বাক্যে রামবাবুর উল্লেখ করে। কিন্তু রামবাবুর ধনে মূলে কি—নিশ্চয় করিয়া কেহ জানে না। তালুক মুলুক জমিদারী নাই; ক্ষেত খামার জমি জমা যাহা আছে তাহাতে সংসার চলে কিন্তু সংসারে ধনী নাম অর্জন চলে না; ব্যবসা বাণিজ্য রামবাবুর নাই; লগ্নীকারবার বা তেজারতি আছে বলিয়াও কেহ জানে না। এ ছাড়া বাকি থাকিল পৈত্রিক ধন আর গুপ্ত ধন। ও-দুটির বিষয়ে অনুমান চলে, প্রমাণ চলে না। কিন্তু পরের ধন সম্পর্কে অনুমান যেমন সচল, প্রমাণ তেমনি অচল। কাজেই বিনা প্রমাণে রামবাবুর ধনখ্যাতি ব্যাবিলনের শূন্যোদ্যানের মতো সকলের বিস্ময় ও বাহবা উদ্রেক করিয়া বিরাজমান; শূন্যোদ্যানের ফুলগুলি এত উচ্চে বিকশিত যে স্বভাবতঃই তাহাকে কল্পবৃক্ষ বলিয়া ভ্রম হয়। কিন্তু এতৎ সত্ত্বেও সত্যের খাতিরে বলিতে হয় যে রামবাবুর কোন ধন ছিল না বলা চলে না, তাঁহার মূলধন ঐ সিন্দুকটি।

বাস্তবিক এত বড় সিন্দুক একালে দেখা যায় না, সেকালেও কদাচিৎ দেখা যাইত—এই সিন্দুকের তুলনা দিতে হইলে এক সিন্দবাদের বিখ্যাত সিন্দুকটি ধরিয়া টান দেওয়া ছাড়া উপায় নাই। প্রকাণ্ড লোহার সিন্দুক ঘরের আধখানা

জুড়িয়া বিরাজ করে। মোটা মোটা লোহার পাত দিয়া আগা গোড়া জড়ানো; ভিতরে পাঁচ সাতটা লোক অনায়াসে গুড়ি মারিয়া বসিয়া থাকিতে পারে। আর তালাটাই বা কত বড়ো! একটা মানুষের আস্ত মাথার মতো। সিন্দুকের সারা গায়ে সিঁদুর আর চন্দনের দাগ—কত বছরের পুরাতন, কত বিচিত্র রকমের চিহ্ন!

এই সিন্দুকটি যে রামবাবু কি সূত্রে পাইয়াছিলেন লোকে জানে না। খুব সম্ভবতঃ পৈত্রিক সূত্রে প্রাপ্ত। গ্রামের বৃদ্ধদের মুখে শুনিতে পাওয়া যায় গ্রামের নদীটি যখন সচল ছিল, সে বহু বছর আগেকার কথা, তখন নদী দিয়া বড় বড় পালোরী নৌকা যাতায়াত করিত। তখন নবাবী আমল—একবার ঢাকা হইতে মুর্শিদাবাদগামী একখানি নবাবী বজরা ঝড় উঠিয়া এখানে নদীর বাঁকে ডুবিয়া যায়। সেই নৌকায় নাকি মোহর-ভরা এই সিন্দুক ছিল। রামবাবুর কোন পূর্বপুরুষ জল হইতে এই সিন্ধুকটি উদ্ধার করিয়া বাড়ী লইয়া আসেন। সেই হইতেই তাঁহার ঐশ্বর্যের সূত্রপাত।

অন্যান্য কিম্বদন্তীর মতো হয় তো এ ঘটনাও সত্য নয়, বিশেষ রামবাবুর অতীত বা বর্তমান ঐশ্বর্যের কোন প্রত্যক্ষ প্রমাণ নাই। কিন্তু গাঁয়ের লোকে এত তলাইয়া বোঝে না—সিন্দুকটাই কি যথেষ্ট প্রমাণ নয়? গ্রামের মধ্যে যাহারা সূক্ষ্ম হিসাবী তাহারা সিন্দুকের মনফল কষিয়া বহুবার বহু রকমে হিসাব করিয়াছে—মোহর ভর্তি হইলে কত? টাকায় ভর্তি হইল কত? আর কোম্পানীর কাগজে ঠাসা হইলেই বা কত মূল্য রামবাবুর ঐশ্বর্যের! আর এমন হওয়াও বিচিত্র নয় যে সিন্দুকটা শূন্য—তাহা হইলে তো রামবাবুকে ঐন্দ্রজালিক বলিতে হয়—শূন্য সিন্দুকে এরূপ খ্যাতির পূর্ণতা! ঐন্দ্রজালিকেরও মায়া বিস্তারের জন্য একখানা শুষ্ক হাড়ের প্রয়োজন হয়।

রামবাবুর গ্রামের নাম জোড়াদীঘি। জোড়াদীঘিতে একবার পর পর ডাকাতি সুরু হইল। ডাকাত অন্য গ্রামের। জোড়াদীঘির লোক অতিষ্ঠ হইয়া উঠিল। কিন্তু ডাকাতের সঙ্গে পারিয়া উঠিবার উপায় নাই—তাহাদের বন্দুক আছে, ঢাল শড়কি আছে। এ সব না হইলে ডাকাতের দলকে বাধা দেওয়া সম্ভব নয়। কিন্তু টাকা কোথায়? তখন গাঁয়ের লোক কাঁদিয়া আসিয়া রামবাবুর পায়ের উপর পড়িল,—বলিল—কর্তা, আর তো সহ্য হয় না, একবার সিন্দুকটা খুলে কিছু বের করুন, দুশমনদের আমারা দেখে নিই।

রামবাবু সব শুনিয়া, অনেকক্ষণ ভাবিয়া, একটা খড়কে দিয়া দাঁত খুঁটিতে খুঁটিতে চিবাইয়া চিবাইয়া বলিলেন—তা হ'লে সিন্দুক খুলতেই হ'ল দেখ ছি।

গাঁয়ের লোক আশ্বস্ত হইয়া ফিরিয়া গেল। কিন্তু সিন্দুক খুলিবার আর প্রয়োজন হইল না—যে কারণেই হোক ডাকাতি বন্ধ হইয়া গেল।

গ্রামের লোক নিজেদের মধ্যে বলাবলি করিতে লাগিল—দুশমনেরা এবার খবর পেয়েছে যে কর্তা এবারে সিন্দুক খুলবেন। সিন্দুকের নামেই দুশমনদের এমন ভয় জানিয়া গাঁয়ের লোকে খুব এক চোট হাসিয়া লইল। সিন্দুকের উপরে তাহাদের আস্থা বাড়িয়া গেল।

আর একবারের কথা। বন্যা হইয়া ক্ষেত-খামার ভাসিয়া গেল। লোকে রামবাবুর কাছে আসিয়া বলিল—কর্তা, সিন্দুক না খুল্‌লে তো প্রাণে মরি।

রামবাবু বলিলেন—সে কথা ঠিক। এ রকম ক্ষেত্রে সিন্দুক না খুললে আর কবে খুলবো।

কিন্তু খুলিবার প্রয়োজন হইল না। দু'একদিনের মধ্যেই চাউল ও বস্ত্র বিতরণের জন্য সদর হইতে লোক আসিয়া উপস্থিত হইল। রামবাবু সকলকে শুনাইয়া শুনাইয়া বলিলেন—না, এরা আমাকে খরচ করতেই দেবে না দেখ্‌ছি।

সকলে বলিল—দুঃখ করবেন না, হুজুর, অসময়ের জন্য আপনার সিন্দুক থাকে। রামবাবু দাঁত খুঁটিতে খুঁটিতে বলিলেন—তোমরা যখন চাইছো, তাই থাক—সিন্দুকের উপরে সকলের ভক্তি বাড়িয়া গেল।

সিন্দুকটাকে লইয়া রামবাবু কিছু ঘটা করিতেন। প্রতিদিন সন্ধ্যাবেলা স্নান করিয়া গরদের ধুতি চাদর গায়ে সিন্দুকের সম্মুখে বসিয়া পূজার্চনা করিতেন এবং অবশেষে সিন্দুকটাকে ধূপ দীপ লইয়া আরতি করিতেন। অক্ষয়তৃতীয়ার দিনে সিন্দুকটাকে বটের পল্লব দিয়া সাজাইতেন আর বিজয়া দশমীতে সিন্দুকটাকে আগাগোড়া সিন্দুর ও চন্দন দ্বারা আলিম্পিত করিতেন। বাড়ীর চাকরবাকর ও আত্মীয়-পরিজন মুগ্ধবিস্ময়ে কর্তার কাণ্ড দেখিত।

এই আব্‌হাওয়ার মধ্যে রামবাবুর পুত্রগণ বাড়িয়া উঠিতে লাগিল। তাঁহার চারি পুত্র। পুত্রেরা বয়ঃপ্রাপ্ত হইয়াই বুঝিতে পারিল ওই সিন্দুকটাই তাহাদের পরিবারের হৃৎ-পিণ্ড। বয়স বাড়িবার সঙ্গে সঙ্গেই তাহাদের গতিবিধি সিন্দুকের কাছে ক্রমেই সন্দেহজনক হইয়া উঠিতে লাগিল। রামবাবু দেখিতে পাইলে বলিতেন—উঁহু, ওদিকে না, যাও পড়ো গে। পুত্রেরা ছুটিয়া পালাইত। তাহারা এক আধবার গোপনে সিন্দুকটা খুলিতে চেষ্টা করিয়াছে। কিন্তু লৌহ-আবরণ নির্দয় আর চাবিও অলভ্য। বাস্তবিক তাহার চাবি যে কোথায় তাহা কেহই

জানিত না, রামবাবুর সতর্কতা অসীম। নিরুপায় পুত্রেরা ভাবিত—এখন না হোক, একদিন সিন্দুকের রহস্য-উদ্ধার হইবেই পিতার মৃত্যুর পরে।

সেই বহু প্রতীক্ষিত শুভদিন আজ সমাগত। পুত্রগণ সিন্দুক জড়াইয়া পড়িয়া আছে। কিন্তু চাবি কোথায়? কেহই জানে না। কাহাকেও ছাড়িয়া কেহ খুঁজিতে যাইতে রাজি নয়—কি জানি অপরে কি করিয়া বসে। কাজেই অধিকার সাব্যস্ত করিয়া সিন্দুক জড়াইয়া পড়িয়া থাকা ছাড়া আর উপায়ন্তর নাই। হয় তো এমনি করিয়া পড়িয়া থাকিয়াই শেষ পর্যন্ত তাহাদের প্রায়োপবেশনে মরিতে হইত, দিনে দিনে, তিলে তিলে। এমন সময়ে গভীর রাত্রে শ্মশানবন্ধুগণ ফিরিয়া আসিয়া প্রকাণ্ড একটা চাবি পুত্রদের উদ্দেশ্যে ছুঁড়িয়া দিল,—বলিল—কর্তার কোমরে ছিল। পুত্রগণ চাবি লুফিয়া লইয়া দরজা বন্ধ করিয়া দিয়া গা-ঝাড়া দিয়া দাঁড়াইল।

তখন সেই গভীর রাত্রে ক্ষীণ দীপালোকমাত্র সহায়ে রামবাবুর চারিপুত্র বহুকালের রহস্য-উদ্ধারে প্রবৃত্ত হইল। তালার চাবি ঘুরাইতেই খট্ করিয়া শব্দ করিয়া দুর্জয় তালা খুলিয়া গেল। চার জনে মিলিয়া আট হাতের শক্তিতে সিন্দুকের গুরুভার ঢাকনা তুলিল এবং সকলে একসঙ্গে দীপালোক তুলিয়া ভিতরে তাকাইল। শূন্য সিন্দুক শূন্য! কোথাও কিছু নাই! নাঃ এ তাদের চোখের ভ্রম ছাড়া আর কিছুই নয়। চারিজন ভিতরে নামিয়া পড়িয়া ডুবারি যেমন করিয়া রত্ন সন্ধান করে তেমনি করিয়া হাতড়াইয়া মরিতে লাগিল। সত্যই কোথাও কিছু নাই। এমন সময়ে একখানা কাগজের টুকরা দেখিতে পাইল। চারজনে সেখানা লুব্ধের মতো লইয়া বাহিরে আসিল। ছোট্ট একখানা কাগজের চিরকুট। দীপালোকে দেখিল—তাহাতে পিতার হস্তাক্ষর। চার পুত্র একসঙ্গে চার-কণ্ঠস্বরে তাহা পাঠ করিল। কাগজে রামবাবুর হস্তাক্ষরে লিখিত—'বাপু সকল, আমার মৃত্যুর পরে সিন্দুক খুলিলেই দেখিতে পাইবে সিন্দুক শূন্য। সিন্দুক যেমন, আমার অদৃষ্টও তেমন—দুইই শূন্য। কিন্তু বুদ্ধি-একেবারে শূন্য নয়। দেখনা, সিন্দুক লইয়া কেমন আসর জমাইয়া গেলাম। এখন তোমরা যদি বুদ্ধিমান হও তবে ইচ্ছা করিলে আমার সুনাম ও ধনগৌরব বজায় রাখিতে পারো। তোমাদের কাজ শুধু ধনাপবাদ পরিপাক করা। সব অপবাদের প্রতিবাদ করবে—কেবল ধনাপবাদ ছাড়া। তুমি যে ধনী, অপরের এই বিশ্বাসই প্রকৃত ধন। ইহাকে রক্ষা করিতে সামান্য একটুখানি বুদ্ধি ও কাণ্ডজ্ঞান ছাড়া আর কিছুই প্রয়োজন নাই। প্রমাণ—আমার সিন্দুক। তোমরা ধনী—অপরের

মনে এই বিশ্বাস আমি স্থাপন করিয়া গেলাম। ইহাই তোমাদের একমাত্র পৈত্রিক সম্পত্তি। এখন ইহাকে রক্ষা করা বা না করা তোমাদের দায়িত্ব। পিতার কর্তব্য আমি পালন করিয়া গেলাম। ইতি নিঃস্ব কিন্তু ধনাপবাদগ্রস্ত পিতা।"

চারিপুত্র পিতার পত্র পড়িয়া মূঢ়ের মতো বসিয়া নীরবে চুল ছিঁড়িতে লাগিল। কেবল জ্যেষ্ঠের মাথায় সুবৃহৎ টাক বলিয়া সে কনিষ্ঠের চুল ছিঁড়িতে থাকিল। ধনতত্ত্ব সম্বন্ধে চরম কথা রামবাবুর পত্রে থাকা সত্ত্বেও পুত্রদের মনে পিতার সম্বন্ধে যে-সব অব্যক্তভাব উদিত হইতে লাগিল তাহা প্রকাশ না করাই শ্রেয়ঃ—কারণ জগতে এখনো পিতৃভক্ত পুত্রের অভাব ঘটে নাই।

অতি সাধারণ ঘটনা

মানুষের মাথা যে এমন করিয়া কাঠের উপরে ঢুঁ মারিতে পারে এই লাইনের 'বাসে' না উঠিলে তাহা কখনই জানিতে পারিতাম না। উঁচু নীচু রাস্তায় বাস-খানা এক একবার হুঁচোট খায় আর আট দশটা মাথা ছাদের কাঠের তক্তায় গিয়া আঘাত করে। কাঠও ফাটে না, মাথাও ভাঙে না—দুই-ই সমান শক্ত। আমি মাথায় ছোট, আমার মাথা ততদূর পৌঁছায় না বটে, কিন্তু সম্মুখবর্তীর পিঠে গিয়া গুঁতা মারে, গুঁতাটাকে সে আগে চালান করিয়া দেয়, এমন করিয়া গুঁতাটা অগ্রসর হইতে হইতে গতির তীব্রতা হারাইয়া ফেলিয়া প্রথম সারির লোকের একটা শিরঃকম্পনে গিয়া অবসিত হয়। বাসের গায়ে পুরাতন অক্ষরে লেখা আছে বটে ষোলজন যাত্রী বসিবে, কিন্তু আমরা প্রায় পঞ্চাশজন লোক বসিয়া, দাঁড়াইয়া, বাঁকিয়া, দুমড়িয়া, ঝুলিয়া এবং দুলিয়া চলিয়াছি; পঞ্চাশজন এবং পঞ্চাশজনের আনুষঙ্গিক পোঁটলা পুঁটলি। ভিড়টা এমনই সূচীভেদ্য যে সহ-যাত্রীদের কাহারও পূর্ণ মূর্তি দেখিবার সুযোগ নাই। কাহারো চেহারার সিকি, কাহারো দু'আনা, কাহারো মাথা, কাহারো জুতা মাত্র দেখিতেছি। আবার, একজনের দেহটাকে অনুসরণ করিয়া আর একজনের পায়ে গিয়া দৃষ্টি ঠেকে, একজনের হাতটাকে অনুসরণ করিলে আর একজনের কাঁধে গিয়া পৌঁছায়—গন্তব্যস্থলে পৌঁছান অবধি যখন এইভাবে ঝুলিয়া থাকা ছাড়া গত্যন্তর নাই, কাজেই ওই এক ধাঁধার মীমাংসা লইয়া কাটাইতেছি। পা দু'খানা এত পুষ্ট অথচ মুখখানা রোগা! পা এবং মুখ একই জীবের কি না মীমাংসা করিতে ব্যস্ত এমন সময়ে কাঠামো শুদ্ধ একবার নড়িয়া গেল, আর একটু হইলে একখানা মিলিটারী গাড়ীর সঙ্গে ধাক্কা লাগিয়াছিল আর কি! ধাক্কা না দিলে কাহারো বাঁচিবার আশা ছিল কি?—পথের পাশেই গভীর নালা। বোধ করি কেহই বাঁচিত না! মুখ তুলিতেই বাসের দেয়ালের গায়ে লেখা চোখে পড়িল—"No chance"—কি সর্বনাশ! কোম্পানী তো স্পষ্ট করিয়া সতর্কবাণী লিখিয়া রাখিয়াছে—নো চান্স! যে রকম ব্যাপার দেখিতেছি তাহাতে 'নো চান্সই' বটে তো! কোন রকমে একবার নামিতে পারিলে হয়। পরে জানিয়াছি কথাটা 'No chance' নয়, 'No change'—অর্থাৎ ভাঙানি পাওয়া যাইবে না। কিন্তু G-টা C-এর মতো দেখায়—লেখাটা বোধ হয় দ্ব্যর্থক!

এমন সময়ে নর-বূ্যহের অবকাশে একখানা হাতের মণিবন্ধের অংশ চোখে পড়িল। আর কিছু দেখা যাইতেছে না। ধাঁধার মীমাংসায় আবার লাগিয়া গেলাম—এ মণিবন্ধ যার, তার মুখ কোথায়? মণিবন্ধটা কোমল, সুকুমার বর্ণ উজ্জ্বল! কিশোর বালকের হওয়াই সম্ভব। এমন সময়ে একটা গুতার ফলে সম্মুখে ঝুঁকিতে বাধ্য হইলাম—তখনি চোখে পড়িল মণিবন্ধের প্রান্তে একখানি শাঁখা। তবে তো বালিকার হাত। আর একবার হুঁচোট—আরও একটু অগ্রসর হইতেই চোখে পড়িল শাঁখার নীচেই একখানি লোহা। এবারে আর সন্দেহ নাই যে বিবাহিতা স্ত্রীলোকের ওই মণিবন্ধ। তার মুখখানা বোধ করি ওই পাঞ্জাবীদ্বয়ের দাড়ির মেঘের আড়ালে অন্তর্হিত। এমন সময়ে গোটা দুই আচ্ছা রকম ধাক্কা দিয়া বাসখানা থামিয়া গেল। একটা ষ্টেশন। এই লাইনের ইহাই উপান্ত ষ্টেশন। অধিকাংশ লোক ভারতীয় বহু জাতির বিচিত্র প্রতিনিধির দল—দাড়ি, পাগড়ী, টুপি, টিকি, টাক ও পোঁটলা পুঁটলি লইয়া প্রস্তর খণ্ডবাহী জলস্রোতের মতো সবেগে নামিয়া গেল। বাস প্রায় খালি—এতক্ষণে বসিবার জায়গা পাওয়া গেল।

বসিয়া পড়িলাম। হাত, পা, ঘাড়, মাথা সব যেন আর কাহারো। বাঁকিয়া চুরিয়া দাঁড়াইয়া থাকিতে থাকিতে সব অবশ হইয়া গিয়াছিল। হাত পা টান করিয়া ঘাড়টাকে কয়েকবার ঘুরাইয়া চেতনা ফিরাইয়া আনিবার চেষ্টায় নানারূপ কসরৎ করিতেছি। ঘাড়টাই সবচেয়ে অসাড় হইয়াছে—বারংবার দুই বিপরিত দিকে ঘুরাইয়া লইতেছি। একবার ঘাড় ঘুরাইতেই পাশের দিকের বেঞ্চিতে একটি মেয়ের উপরে চোখ পড়িল। কচি বয়স, সিঁথায় সিঁদুর, মুখে কচি ডাবের শ্যামল সৌকুমার্য এবং অনবদ্য স্নিগ্ধ রমণীয় একটি নিটোলতা; শ্যামল বাঙলার শ্যামা বালিকা।

লাবণ্য মসৃণ দু'খানি বাহু ক্রমশঃ সূক্ষ্ম হইয়া অবশেষে পাঁচটি নীরব আঙুলে পর্যবসিত হইয়াছে। কোমল মনিবন্ধে শুধু একখানি করিয়া শাঁখা ও লোহা। ওঃ, তবে ইহারি মণিবন্ধের অংশ জনতার অবকাশে চোখে পড়িয়াছিল! কিন্তু ঘাড়টা এখনো স্ববশে ফেরে নাই—এখনো মাঝে মাঝে ঘুরাইতেছি। একবার মেয়েটিকে চোখে পড়ে আর একবার পথের পাশের কৃষ্ণচূড়ার অফুরন্ত পুষ্পিত আবীরের ছটা। হঠাৎ মনে হইল কিন্তু এ কি! মেয়েটি বিবাহিত অথচ হাতে কোন অলঙ্কার নাই কেন? বাঙলা দেশের বিবাহিত মেয়ে যত গরীবই হোক না কেন, আর মেয়েটিকে তো চেহারায় ও পোষাকে মধ্যবিত্ত ঘরের

বলিয়াই মনে হয়, দুএকখানা সোনার অলঙ্কার পরিয়াই থাকে। একটা রুলি, দু'খানা চুড়ি, যা সকলেরই জোটে, বিবাহের সময়ে এই সামান্য অলঙ্কার না পায় এমন মেয়ে বাঙলাদেশে বিরল, ইহার কি তাহাও জোটে নাই? ইহার দারিদ্র্য কি এমনি অসাধারণ! অথচ মেয়েটির মধ্যে আর কোন অসাধারণত্ব চোখে পড়ে না। কিম্বা এমনও হইতে পারে যে অলঙ্কারগুলো কোন আসন্ন বিপদের পথ রোধ করিতে গিয়াছে? এই অল্প বয়সে এমন কি বিপদ ইহার ঘটিল যাহাতে শাঁখা ও লোহা ছাড়া আর সব খুলিয়া দিতে হইয়াছে? ওই রিক্ত মণিবন্ধের নিরঞ্জন কোমলতা কেবলি মনের মধ্যে খোঁচা দিতে লাগিল। অলঙ্কারের মধ্যে মেয়েদের ইতিহাস নিহিত—তাহাদের সৌভাগ্যের দুর্ভাগ্যের এবং পতনের।

বাস শেষ ষ্টেশনে আসিয়া থামিল। এখানে একটি প্রসিদ্ধ যক্ষ্মানিবাস অবস্থিত। যাহারা আসে—ওই যক্ষ্মানিবাসের আত্মীয়স্বজনকে দেখিতেই আসে। অন্য কাজে বড় কেহ আসে না। মেয়েটি নামিল—হাতে ছোট একটি ফলের পুঁটুলি। আর পাঁচজনের সঙ্গে সে অদূরস্থিত যক্ষ্মানিবাসের দিকে দ্রুত পদে চলিয়া গেল। অমনি এক বিদ্যুতের ঝলকে তাহার মণিবন্ধচ্যুত অলঙ্কারের ইতিহাস বেদনার বহ্নি-ভাষায় আমার মনে উচ্চারিত হইয়া গেল। কোথায়, কেন সেই অলঙ্কারগুলি গিয়াছে বুঝিতে বিলম্ব হইল না। লুপ্ত অলঙ্কারের মধ্যে তাহার গুপ্ত ইতিহাসের একটা আভাস পাওয়া গেল। গাছপালার আড়ালে পথের বাঁকে মেয়েটি অন্তর্হিত হইয়া গেল, কিন্তু আসন্ন অস্ত আভায় করুণ তাহার সেই মুখ, শঙ্খমাত্রসহায় অনন্ত-অলঙ্কার সেই শূন্য মণিবন্ধ, কিছুতেই ভুলিতে পারিলাম না। অনেক দিন ধরিয়া এই দু'টি ছবি আমার চেতনার মধ্যে সূচী চালনা করিয়া বেদনার কন্থা বুনিয়া যাইতে লাগিল। ভাবিলাম, যক্ষ্মানিবাসে গিয়া একবার খোঁজ করিলেই তো সব জানা যায়—সব জানাতেই সব কৌতূহলের পরিসমাপ্তি! কিন্তু তাহা আর সম্ভব হইল কোথায়? ভাবিলাম, নিজের মনেই মেয়েটির ইতিহাস রচনা করিয়া কৌতূহল শান্ত করি না কেন? তাহার ইতিহাসের কাঠামোটা তো সর্বজনবিদিত—তাহার ভাগ্যে নূতন আর কি ঘটিবে? তাহার ব্যক্তিগত বেদনার মেঘের মধ্যেই তো সহস্রের অশ্রুজল সঞ্চিত হইয়া আছে! তাহার অজ্ঞাতে তাহার কাহিনী রচনা স্থির করিয়া ফেলিলাম। দুঃখের চক্রাবর্তনে তাহার কাহিনী শিল্পসামগ্রী হইয়া উঠিল। শিল্পেই পূর্ণতা—পূর্ণতাই শান্তি।

অতি সাধারণ ঘটনা, অতি সাধারণ মানুষ। অমিত আর শমিতার মাথা

ভিড়ের মধ্যে তলিয়ে যাবার মাপে বিধাতা তৈরী করেছিলেন বলেই হোক, আর ইচ্ছার অভাবেই হোক, কখনো তারা ভিড়ের ঊর্ধ্বে নিজেদের মাথা উদ্ধত করে তোলেনি। পাহাড়ের সানুতে দৃষ্টির অতীত যে-সব শিলাখণ্ড পড়ে থাকে, তারাও একদিন অগ্ন্যুৎপাতের ঠেলায় অন্তিম ভাস্বরতায় আকাশপথে উৎক্ষিপ্ত হয়ে দৃষ্টি আকর্ষণ করে—অমিত শমিতার ভাগ্যে এমন কি সেই বেদনার দ্যুতিরও সৌভাগ্য ছিল না, বিধাতা নিতান্তই কৃপণ হাতে তাদের গড়েছিলেন। তারা ছিল ইতিহাসের রাজপথের 'ক্যাম্প-ফলোয়ার'—যেখানে কেবল রাজা মন্ত্রী পাত্র মিত্রকেই চোখে পড়ে, বাকি অগণ্য লোক যেখানে নগণ্য; তারা জন নয়, জনতা মাত্র।

অমিত-শমিতা নাম এক সঙ্গে করলাম বটে এক জায়গায় তাদের জীবনে গ্রন্থিও পড়েছিল সত্য, কিন্তু বরাবর তারা এমন এক ছিল না। গোড়া থেকে এক থাকলে মাঝখানে এক হবার আনন্দ থেকে তারা বঞ্চিত হ'ত। বিধাতা তাদের নগণ্য করেছিলেন কিন্তু নিরানন্দ করেন নি।

অমিত-শমিতার বিবাহের কথারই আভাস দিলাম। আধুনিক মতে স্ত্রী এক, পুরুষ এক; বিবাহে একে একে গ্রন্থি বেঁধে মিলন হয় বটে কিন্তু সে দুইয়ের মিলন; সংসারের উচ্চাবচ পথে একটু জোর হুঁচোট খেলেই গ্রন্থি ছিঁড়ে মিলিত দুই আবার হয়ে যায়—এক আর এক। প্রাচীন মতে স্ত্রী আধ, পুরুষ আধ; বিবাহের হোমানলে দুইআধ গলিত হয়ে একে পরিণত হয়। সংসারের আবর্তে তাতে টান পড়ে বটে, কিন্তু ভিন্ন হবার কথাই ওঠে না;—রাসায়নিক প্রক্রিয়ায়, আধে আধে পূর্ণতা ঘটেছে যে।

অমিত-শমিতার বিবাহ হ'ল। কিন্তু অমনিতে হয় নি। প্রজাপতি অবশ্য অনুকূল ছিলেন কিন্তু সেই প্রজাপতির গুটি থেকে ঠিক কতখানি স্বর্ণসূত্র পাওয়া যাবে তা পরিমাপ করার ভার যাঁর উপরে, তিনি হয়ে দাঁড়ালেন প্রতিকূল। অমিতের পিতা অর্ধেন্দুবাবু একালের নূতন বোতলে সেকালের পুরানো মদ। ছিপি না খোলা পর্যন্ত হালের চোলাই বলে মনে হয়, কিন্তু ছিপি খুললেই বেরিয়ে আসে মনুসংহিতার গন্ধ। সেকালের মদ বললো, পুত্রের বিবাহের কর্তা পিতা; একালের বোতল বললো, দেখই না, ছেলে যদি নিজের শক্তিতে সোনার খনি আবিষ্কার করেই ফেলে—অত গোল করা কিছু নয়। তখন মদে বোতলে আপোষ হয়ে গিয়ে গ্রামের তারিণীচরণকে চিঠি লিখে দিল—ব্যাপারটার একবার খোঁজ খবর করা দরকার। তারিণীচরণ অর্ধেন্দুবাবুর গ্রামের লোক—গ্রামে

কলকাতায়, যেখানে এখন রয়েছে অমিত এম-এ পাঠের উপলক্ষ্যে। তারিণী-চরণের চিঠি এলো—শমিতরা জাতের এক আধ ধাপে নীচে হলেও তা চোখ বুজে সহ্য করবার মতো—কারণ গুটিতে স্বর্ণসূত্রের দৈর্ঘ বললেই হয়। তারিণীচরণ আবগারী বিভাগের লোক—জানে যে সত্যে পৌঁছবার পথ অত্যুক্তি। অর্ধেন্দুবাবু চোখ বুজেই রইলেন, সব জেনেও কিছু জানলেন না। বরঞ্চ না জানার পথ খোলা রাখবার জন্তে পুত্রকে একখানি চিঠি লিখে 'ফর্মাল প্রটেষ্ট' জানালেন, অথচ তার ভাষা এমন হল না, যাতে বিবাহ ভেঙে যাবার আশঙ্কা আছে'। অতএব অর্ধেন্দুবাবুর অনুপস্থিতিতেই অগত্যা অমিতের সঙ্গে শমিতার বিবাহ সম্পন্ন হয়ে গেল।

ওরা ছিল এক কলেজের পড়ুয়া। কলকাতায় তখন সবে দ্বৈতী শিক্ষার ধারা স্বর্গলোক থেকে অবতীর্ণ হয়েছে। স্ত্রী-পুরুষের দ্বৈতী ধারার মিলনে কলেজের কলরোল নদনদী সঙ্গমের কলধ্বনিকে ছাপিয়ে গিয়েছে। কিছুদিন এমন চলবার পরে কর্তৃপক্ষের মনে কি হ'ল, যার ফলে দ্বৈতী শিক্ষা অদ্বৈতপাঠে পরিণত হ'ল। মেয়েদের সময় ধার্য হ'ল সকালে; ছেলেদের দুপুরে। তবু ঐ এগারটার কাছ ঘেঁসে রইলো একটা দেখা-শোনার দিগন্ত।

অমিত-শমিতা মাত্র এক বছর দ্বৈত সাধনার সুযোগ পেয়েছিল—তার পরে এলো এই অসি-পত্রের ব্যবধান। প্রেম দুর্মর, সহজে তার অঙ্কুর মরতে চায় না; বাস্তব থেকে উৎপাটিত মূল হয়ে গেলেও আশার মধ্যে বায়ুজীবীরূপে বেঁচে থাকে। অমিত-শমিতার আশা রইলো—কলেজের গণ্ডী পার হতে পারলে আবার শিক্ষা জগতের পরলোক, অর্থাৎ পোষ্ট গ্রাজুয়েটে গিয়ে দেখা হবে। সেখানে বিরহের আশঙ্কা নেই। হ'লও তাই। কিন্তু এখানে একটু কৈফিয়ৎ দেওয়া প্রয়োজন মনে করি। কলেজের সীমাতেই তাদের সম্বন্ধে প্রেম শব্দটা প্রয়োগ উচিত হয়নি—কারণ সে অনুভূতি ওখানে তাদের ঘটেনি। অমিতের কথাই বলি। সে প্রথমে দেখতো ক্লাসের একান্তে এক গুচ্ছ মেয়ে—সকলকে একসঙ্গে চোখে পড়তো অর্থাৎ কাউকেই চোখে পড়তো না। এ সেই যুধিষ্ঠিরের অস্ত্র পরীক্ষার ব্যাপার আর কি! যুধিষ্ঠির তো শুধু পাখীটাকে দেখেননি, গাছ এবং আকাশের সঙ্গে এক করে পাখীটাকে দেখেছিলেন বলেই তিনি দ্রোণাচার্যের "ফেল করা" ছাত্র। তারপরে অমিত এক বিচিত্র অভিজ্ঞতা অনুভব করলো। মাঝে মনে হ'ত সব মেয়েই এসেছে—তবু যেন ও-দিকটা শূন্য—সবই আছে, তবু কি যেন নেই। কেউ যদি তখন তাকে রহস্যে বলে দিত যে, অমিত, একেই বলে প্রেমের

পূর্বাভাষ, তবে সে কথাটা নিশ্চয়ই হেসে উড়িয়ে দিত। যখন এইরকম চলছে, অর্থাৎ ক্লাসের স্বাদ—বিস্বাদ, এমন সময়ে হঠাৎ সে করিডরে শমিতাকে দেখতে পেলো। চমকে উঠলো, সে যেন এক আবিষ্কার!—আমেরিকার ডাঙা চোখে পড়বার আগে তার ভাঙা ডালপালা সমুদ্রে দেখে কলম্বাস যেমন চমকে উঠেছিলেন। অমিতের মনে হ'ল, তাই তো! এই মেয়েটিই তো ক্লাসের লাবণ্য, যার অভাবে সমস্ত এমন বিস্বাদ বোধ হচ্ছে। পরীক্ষা করতেও বিলম্ব হ'ল না। তারপর দিন ক্লাসে শমিতা এলো, অমিতের মনে হ'ল—ক্লাস যে শুধু হৃদ্য হয়েছে তা নয়, এতক্ষণে পূর্ণ হ'ল। এতদিনে সে জনতা ভেদ ক'রে বিশেষ একটি জনকে দেখতে পেলো। এবারে সে অস্ত্র পরীক্ষায় যুধিষ্ঠিরের স্থান থেকে অর্জুনের স্থানে ডবল প্রমোশনে উন্নীত হ'ল।

তারপরে এলো তারা পোস্ট-গ্রাজুয়েটের ক্লাসে। সেখানে প্রতিদিন প্রেমের নূতন নূতন অভিজ্ঞতা কচি গাছের নূতন কিশলয়ের মতো খেলতে লাগলো তাদের হৃদয়ে। কিন্তু অমিত-শমিতার প্রেমের অভিজ্ঞতা বর্ণনা করতে আমি বসিনি তো। আর বসলেই বা কি হ'ত? এমন কোনো অভিজ্ঞতা তাদের জীবনে ঘটেনি যাকে নূতন বলা যায়; বিধাতা যে তাদের প্রতি অকৃপণ নন, সে তো গোড়াতেই বলে রেখেছি। জগতের আদি যুগে কোন কোন প্রবল জ্যোতিষ্ক আর একটা গ্রহের কাছ ঘেঁষে চলে যাবার সময়ে তার হৃদয়ে আগুনের জোয়ার জাগিয়ে দিয়ে যেতো, কিন্তু নিজে ধরা দিত না। অনেকেরই প্রথম প্রেমের অভিজ্ঞতা ঐ জাতীয়। জ্যোতিষ্কের টানে হৃদয়ে জোয়ার জাগে—কিন্তু না দেয় ধরা, না পারে ধরতে। কিন্তু ওরা প্রথমবারেই পরস্পর পরস্পরের কাছে ধরা দিল। অমিত-শমিতা বিবাহে প্রতিশ্রুত হ'ল।

শমিতার সংসারে ছিলেন বিধবা মা। হিন্দু সংসারে স্ত্রীর মূল্য শূন্য, কিন্তু স্বামীর পাশে অধিষ্ঠিত হবার ফলে তার মূল্য যায় বেড়ে; সেই স্বামীর অবর্তমানে আবার সে শূন্যতায় পর্যবসিত হয়। শমিতার মা-র মূল্য এখন শূন্য। তাঁর হাতে কিছু টাকা ছিল, কিন্তু টাকাকে মূলধন ক'রে কি ভাবে সংসারে নিজের প্রভাব প্রতিপত্তি বাড়াতে হয়, সে কৌশল তাঁর জ্ঞাত ছিল না। বিশেষ ও-টাকাকে তিনি মেয়ের সম্পত্তি ব'লেই জানতেন—সংসারে তাঁর আর কেউ তো নেই। তিনি বিবাহে খুসিই হলেন।

ওদের বিবাহ হয়ে গেল। বলা বাহুল্য, অর্ধেন্দুবাবু এলেন না—কেননা, বিবাহে উপস্থিতিতে বিবাহকে কতখানি স্বীকার করে নেওয়া হয়, সে সম্বন্ধে তাঁর

সন্দেহ ছিল—অথচ মনে মনে অনিচ্ছা ছিল না, কাজেই এ-দুয়ের সামঞ্জস্য করবার উদ্দেশ্যে বিবাহে হল তাঁর কূটনৈতিক অনুপস্থিতি।

বিবাহের পরে দুটি উল্লেখযোগ্য ঘটনা ওদের সম্মিলিত জীবনে ঘটলো। অমিত সামান্য একটি চাকুরী পেলো আর শমিতার মা মারা গেলেন। যাই হোক, ইতিহাসের পাতার বাইরে যে অগণ্য লোকের জীবনস্রোত বইছে, তাদের সঙ্গে মিলিয়ে তাদের জীবনও চলা শুরু করলো—কখনো বা দুঃখের কালো পাথর ডিঙিয়ে, কখনো বা উচ্ছল হাসির অজস্রতায়, আবার কখনো বা পঙ্কিল আবর্তনের মন্থন সহ্য করে।

ওদের একটি দুঃখ ছিল যে অর্ধেন্দুবাবু এলেন না। কিন্তু সে দুঃখ দীর্ঘকাল রইলো না। অর্ধেন্দুবাবু এলেন না বটে, কিন্তু তাঁর পত্র এলো। সে পত্রের ছত্রে ছত্রে পুরাতন মদের ছিটা। অর্ধেন্দুবাবু পুত্রের অবিমৃষ্যকারিতার জন্য তাকে তিরস্কার করেছেন। প্রাচীনকালের রাম ও পরশুরাম প্রভৃতি প্রাতঃস্মরণীয় ভদ্রলোকগণ পিতৃআজ্ঞা পালনের জন্য কত কি অপ্রত্যাশিত কাজ করতে কুণ্ঠিত হননি—তার দীর্ঘ ফর্দ সেই পত্রে রয়েছে। অবশেষে আছে পিতার প্রতি পুত্রের কর্তব্যের স্মারক। অর্ধেন্দুবাবু উদারভাবে লিখেছেন যে, যদিচ বধূমাতার জলগ্রহণ করা তাঁর পক্ষে সম্ভব নয়, অত্রাচ অমিত যদি তাঁকে মাসে মাসে কিছু টাকা পাঠায় তবে তা তিনি গ্রহণ করতে সম্মত আছেন।

চিঠি পড়ে শমিতা বললো—মার তো কিছু টাকা আছে, তাই থেকে মাসে মাসে কিছু পাঠালেই হয়।

অমিত বললো—তা কি হয়? আমি দেখি কি করতে পারি।

সে কাজের উপরে খুচরো আর একটা কাজ জোগাড় করে নিলো এবং উদ্বৃত্ত অর্থ পিতাকে পাঠাতে লাগলো। এতে তার খাটুনি বেড়ে গেল। স্বাস্থ্য তার কোনদিনই ভালো ছিল না, এখন তাতে ঘাটতি দেখা দিতে শুরু হ'ল।

শমিতা বলে,—তুমি কাজ ছেড়ে দাও, ওই টাকা থেকে পাঠালেই চলবে।

অমিত বলে—ও-টাকাও তো আমার, প্রয়োজনকালে ও-টাকা কাজে লাগবে। এখন চলছে—চলুক।

অর্ধেন্দুবাবু টাকা পেয়ে খুসি হলেন, কিন্তু সন্তুষ্ট হলেন না। যে এত দিচ্ছে সে আরও কত দিতে পারতো, এই চিন্তা তাঁকে অসন্তুষ্ট করে রাখলো। একটা না একটা উপলক্ষ্য করে তিনি টাকার দাবী চড়িয়ে যেতে লাগলেন, অমিতও সাধ্যাতীত পরিশ্রম ক'রে সে চাহিদা মিটিয়ে যেতে লাগলো। অর্ধেন্দুবাবু অনেক

মনে হাসেন, বৈবাহিক তাঁকে ঠকিয়েছিল বটে, এখন তিনি তার সঞ্চিত স্বর্ণসূত্রে টান দিচ্ছেন। আর হাসতেন বিধাতা পুরুষ, অর্ধেন্দুবাবু স্বর্ণসূত্র উপলক্ষ করে নিজের পুত্রের স্বাস্থ্যে টান দিচ্ছেন, দেখতে পেয়ে।

(২)

অবশেষে ডাক্তারে একদিন স্পষ্ট করে বলতে বাধ্য হল যে, রোগটা টি-বি বলেই মনে হচ্ছে, তবে কিনা ভগবান আছেন। বাঘে যখন ধান খায় আর ডাক্তারে যখন ভগবানের নাম উচ্চারণ করে, তখন বুঝতে হবে সর্বনাশের আর অধিক বিলম্ব নেই।

সেদিনও প্রতিদিনের মতো অমিত অফিসে বেরুতে উদ্যত হচ্ছিল, শমিতা একেবারে দরজা রোধ করে দাঁড়ালো। বললো,—তুমি কি সর্বনাশের কিছুই বাকি রাখবে না।

অমিত বললে,—কিন্তু চাকরী না করলে চলবে কি করে?

শমিতা বললো,—তুমি চলে গেলে আমার চলে কি সুখ? শমিতা চাপা মেয়ে—এর বেশি বলা তার স্বভাবসিদ্ধ নয়। অমিত বুঝলো যে ওই কথা কয়টিতে আর দশজন মেয়ের অনেক কান্না, অনেক মাথাকোটা ঘনীভূত হয়ে শ্বাসরুদ্ধ হয়ে রয়েছে। অগত্যা সে বেরুবার আশা ছাড়লো।

তবু অমিত আর একবার বলবার চেষ্টা করলো—শমি, চলবে কেমন করে?

শমিতা শুধু বললো,—সে আমি দেখবো। মেয়েরা যখন 'দেখবো' বলে, তারা সত্যিই দেখে। পুরুষের মুখে ওটা একটা কথার মাত্রা মাত্র। অমিত শয্যা গ্রহণ করতে বাধ্য হ'ল; শমিতা সংসারের ভার তুলে নিল।

যক্ষ্মা ব্যাধিটা রাজকীয় ব্যাধি। প্রাচীনকালে রাজারা মানুষের দণ্ডাতীত ছিলেন, তাই তাঁদের দণ্ডিত করবার জন্যে অদৃষ্ট এই ব্যাধিটির সৃষ্টি করেছিল, সেই জন্যেই তো ওর পুরা নাম রাজযক্ষ্মা। কিন্তু যেহেতু আধুনিক গণতন্ত্রের যুগে প্রত্যেক মানুষই একটি ছোট-খাটো রাজা, ওই ব্যাধিটা তাই ক্ষুদে রাজাদের ঘাড়ে এসে চেপেছে। কিন্তু স্বভাব বদলাতে পেরেছে কি? ওকে রাজকীয় আড়ম্বরে চিকিৎসা করতে হয়। সে সামর্থ্য আছে ক'জনের? আবার লোকেও ব্যাধির পূর্ব কৌলীন্য ভুলতে পারেনি; কাজেই যক্ষ্মাবাসগুলোতে খরচের উদারতা ঘটিয়ে সাধারণের আয়ত্তের বাইরে করে রেখেছে।

শমিতা সংসারের ভার নিয়ে দেখলে আয় বাড়াবার একমাত্র উপায় খরচ

কমানো। শ্বশুরের মাসোহারার দিকেই তার প্রথম দৃষ্টি পড়লো। শমিতা অনেক ভেবে চিন্তে রাত জেগে অর্ধেন্দুবাবুকে সব অবস্থা জানিয়ে একখানা চিঠি লিখে ফেললো। শ্বশুরকে এই তার প্রথম চিঠি। অর্ধেন্দুবাবুর উত্তর এলো—কিন্তু তা অমিতের নামে, তাতে পুত্রবধূর উল্লেখ পর্যন্ত নেই। পিতৃ-আজ্ঞা লঙ্ঘন ক'রে বিবাহ করবার দণ্ডস্বরূপ এই ব্যাধি যে তাকে আক্রমণ করেছে—একথা তিনি স্পষ্ট ভাষায় জানিয়ে দিয়েছেন। অদৃষ্টের উপরে তাঁর হাত নেই। পুনশ্চ জানিয়ে লিখেছেন এখন থেকে অমিত যেন তাঁর মাসোহারা চুনারের ঠিকানায় পাঠায়; ওখানকার স্বাস্থ্য ভালো ব'লে তিনি সেখানে কিছুকাল থাকবেন। শমিতা চিঠিখানা প'ড়ে ছিঁড়ে ফেললো, অমিতকে কিছু জানালো না। অমিত মাঝে মাঝে শুধাতো—বাবার টাকা নিয়মিত পাঠানো হচ্ছে কিনা? শমিতা বলতো, হচ্ছে বই কি। কি করে যে হচ্ছে অমিত আর তা জানবার জন্যে পীড়াপীড়ি করতো না। এই মিথ্যা কথাটা বলে শমিতা এমন আনন্দ পেলো, মহা সত্যকথা বলেও তেমনটি কখনো সে পায়নি।

ওদের সংসার কেমন ক'রে চলে এ প্রশ্ন অবান্তর, কারণ সংসার চলে না, চালাতে হয়। শমিতা কিছু কিছু সঞ্চয় ক'রেছিল, তার সঙ্গে মা'য়ের টাকা যুক্ত হ'য়ে একরকম ক'রে তাদের দিন চলে যায়—যাতে ভিতরে ভিতরে টান পড়ে অথচ বাইরে টোল খায় না।

অমিতের রোগ সারবার নয়, কিন্তু হয়তো কমতো যদি মনে তার দুশ্চিন্তা না থাকতো। সে যে অসহায় একটি মেয়ের ঘাড়ে নিজের ভার তুলে দিতে বাধ্য হ'য়েছে, এই গ্লানি তাকে ভিতরে ভিতরে চাবকাচ্ছিল।

তাদের বিবাহিত জীবনের প্রথম দিকে শমিতা কতবার চাকুরি করতে চেয়েছে—অমিত হেসে জবাব দিয়েছে, তুমিও যদি আয়ের পথ দেখো, তবে খরচ করবে কে? অমিত কিছুতেই তাকে চাকুরি করতে দিতে সম্মত হয়নি—ওতে তার পৌরুষ ব্যথা পেয়েছে। এখন তাই শমিতা চাকুরি করবার প্রস্তাব আর পাড়েনি, জানতো ওতে তাকে মর্মান্তিক কষ্ট দেওয়া হবে। কিন্তু সেদিন হঠাৎ অমিতই তাকে চাকুরি নেবার জন্যে অনুরোধ করলো। বললো—শমি, একটা ভাল চাকরির বিজ্ঞাপন দেখছিলাম, একবার চেষ্টা ক'রে দেখ না। এই কথা শুনে শমিতার চোখ ছল ছল ক'রে উঠলো, তার কাছে কি লুকানো থাকবে না—কত দুঃখ, কত সংস্কার দমন ক'রে তবে ওই প্রস্তাব অমিত করতে পেরেছে? অমিত তখন কি দেখছিল? দেখছিল সকাল বেলার স্থলপদ্মের পাপড়ির

মতো শাড়িখানা প'রে শমিতা সবে ফিরেছে, গ্রীষ্মের দুপুর তখন আড়াইটে, রৌদ্রের তাপে গাল দুটিতে তপ্ত আভা, কপালে অশাসিত চূর্ণ কুন্তল নানা বিচিত্র রেখায় লিপ্ত, কণ্ঠে স্বেদ বিন্দুর মুক্তার পাঁতি, চোখের কোণে ঈষৎ রক্তিমা। অমিত দেখলো, শমিতা সুন্দর। বাস্তবিক রৌদ্রে ঘুরে না এলে মেয়েদের সত্যিকার সৌন্দর্য খোলে না।

অমিত ভাবলো—এখন আর বৃথা পৌরুষের গর্ব ক'রে কি হবে? শমিতা চাকুরি নিলে আয়ের পথ প্রশস্ত হ'য়ে তার দুশ্চিন্তা কমবে।

শমিতা বললে, সে কি হয়! এখন চাকরি করতে গেলে তোমাকে দেখবে কে?

আসলে দেখবার সময়ের অভাবটা সত্য নয়। যে-কষ্ট সুস্থ সময়ে অমিতকে সে দিতে পারেনি, অসুস্থতার মধ্যে তা দেবার কল্পনাও শমিতার কাছে অসহ্য। কাজেই শমিতার আর চাকুরি করা হ'ল না। ওদের সংসার কি করে চলে? সংসার চলে না—সংসারকে চালাতে হয়।

(৩)

এই রকমে সুখে দুঃখে যখন ওদের জীবনযাত্রা চলছিল তখন অমিতের দেহের যক্ষ্মার বীজাণুগুলো নিশ্চিন্ত ব'সে ছিল না। ওই অন্ধ রোগ-বীজাণুর শ্রেষ্ঠ আবাস মানুষের দেহ বটে, কিন্তু মানুষের-সঙ্গে তাদের হৃদ্যতার কোন সম্বন্ধ নেই; তারা দিনরাত্রি মানুষের স্নেহ দয়ামায়ার প্রতি সম্পূর্ণ অন্ধনিরপেক্ষতায় নিজেদের নিজেদের ধ্বংসমূলক কাজ করে যায়; নিরন্তর তারা মানুষের ফুসফুসে সুড়ঙ্গ খুঁড়ে চলেছে—জীবন থেকে মৃত্যুতে পৌঁছবার নিশ্চিততম, সরলতম, একান্ততম পথ। ওরা স্নেহহীন, দয়াহীন, মায়ামমত্বহীন, ওরা অন্ধ, অজ্ঞান, সম্পূর্ণ এক স্বতন্ত্র জগতের অধিবাসী; মানুষের বুকের মধ্যে আর এক বিচিত্র জগৎ; মানুষের জগৎ ও বীজাণুর জগৎ এমন সমান্তরাল যে কোন কালে তাদের মিলিত হ'বার সম্ভাবনা নেই। তারপর হঠাৎ একদিন দুই সমান্তরাল রেখা এক জায়গায় গিয়ে থেমে যায়—একই সঙ্গে দুইয়ের চিরাবসান।

এমন সময়ে শমিতার এক আত্মীয় শহরের নিকট এক যক্ষ্মাবাসের ডাক্তার হ'য়ে এলেন। শমিতা তাঁকে গিয়ে ধরলো। তিনি অমিতের প্রতি বিশেষ আগ্রহ দেখিয়ে তাকে কিছু কম খরচে যক্ষ্মাবাসে ভর্তি ক'রে নিলেন।

অমিত টাকার কথা তুললো না, জানে যে ওতে শমিতাকে কেবল কষ্ট

দেওয়াই হবে। তা'ছাড়া ভাবলো—আর কতদিনই বা! এ-ক'টা দিন শমিতার ইচ্ছেয় বাধা দেবার উৎসাহ তার হ'ল না। ও ভাবলো—এ-ক'টা দিনের সেবার স্মৃতি শমির মনে অক্ষয় হ'য়ে থাক্। আমার যখন আর কিছু করবার সাধ্য নেই—ওর মনে দুঃখের খোঁচা দেবার অহঙ্কারই বা করি কেন?

অমিত যক্ষ্মাবাসে ভর্তি হ'লে শমিতা রোজ বিকালে দেখা করতে যায়। অমিত টাকার প্রশ্ন তোলে না দেখে শমিতার ভালো লাগে না। বুঝতে পারে যে তার মনে প্রশ্নটা অব্যক্ত কাঁটার মত বিঁধে আছে। তাই সে একদিন নিজেই কথাটা তুলে বসলো—জানো, আমি স্কুলে একটা চাকরি নিয়েছি। কিন্তু পাছে এই কথায় ও মনে করে যে তার জন্যেই শমিতার এই কাজ গ্রহণ করতে হ'য়েছে, তাই ব্যাখ্যা স্বরূপে বললে—এখন তো সারাদিন ব'সে থাকা, একা একা ভাল লাগে না, তাই কাজ নিয়ে কোন রকমে ভুলে থাকি।

অমিত কি একথা বিশ্বাস করলো? কি জানি, হয়তো সে বিশ্বাস করতেই চায়। কিন্তু টাকা যে কোত্থেকে আসছে তা অমিতের চোখ এড়াতে পারলো না। সে দেখছে শমিতার হাতের চুড়ির গোছা ক্রমে ক্ষীণ হ'য়ে আসছে। সে দেখতো, সবই বুঝতো, তবু চুপ ক'রে থাকতো, কারণ চুপ ক'রে থাকা ছাড়া আর যা করবে, তাতেই শমিতার কষ্ট বাড়বে বই কমবে না। কেবল সে রাতের বেলায় জেগে থেকে অনেকক্ষণ ধ'রে ভগবানের কাছে প্রার্থনা করতো,—সেরে উঠবার নয়, কারণ তা বিধাতারও অসাধ্য,—সে প্রার্থনা করতো মরবার; শমিতার চুড়ির গোছা নিঃশেষ হবার সঙ্গে সঙ্গেই যেন তার জীবনান্ত ঘটে! যে বিধাতা জীবন দান করতে অশক্ত, তিনি কি এই ইচ্ছামৃত্যু দানেও সমর্থ নন?

নিজের হাতের চুড়ির গোছা যে ক্রমে ক্ষীণ হয়ে আসছে, সেদিকে শমিতার খেয়াল ছিল না। হঠাৎ একদিন আচম্বিতে তার খেয়াল হ'ল। শমিতা এলে অমিত তার অগোচরে একবার ক'রে চুড়ির সংখ্যা গুণে দেখতো। শমিতা এতদিন তা লক্ষ্য করেনি। আজ হঠাৎ দু'জনের দৃষ্টি পরস্পরের কাছে ধরা পড়ে গেল। কিন্তু শমিতা যেন কিছুই বোঝেনি এমন ভাবে বললো,—একলা আসতে হয়, ফিরতেও একলা, তাতে আবার সন্ধ্যে হ'য়ে যায়, দিনকাল খারাপ, কতকগুলো চুড়ি খুলে রেখেছি। কেমন, ভালো করিনি?

অমিত শুধু বললো, ভালোই করেছো। সে রাত্রে অমিত একা বিনিদ্র জেগে প্রার্থনা করলো—হে সুখ-দুঃখের দাতা, যে একই সঙ্গে মানুষের বুকে আত্মবিস্মৃত প্রেম আর যক্ষ্মার বীজাণু বিতরণ ক'রে রেখেছ, তোমার কাছে কি

ক'রে প্রার্থনা করতে হয় জানিনে। সে প্রার্থনার কতটুকু তুমি গ্রহণ করো, কতখানি বর্জন করো তাও জানিনে। তবু এ বিশ্বাস আছে, সুখের প্রার্থনার চেয়ে দুঃখের প্রার্থনা হয়তো দ্রুত হস্তে মঞ্জুর করে থাকো। আমার দেহাবসান শমির ওই চুড়ি ক'গাছার সঙ্গে ঘটিয়ে দাও প্রভু! তারপরে তার মনে হ'ল, এ প্রার্থনা কি তার সুখের নয়? এ অবস্থার একমাত্র সুখ যা সম্ভব, তাইতো সে চেয়েছে! সর্ব-দুঃখের দাতা কি তা মঞ্জুর করবেন? দুঃখের ছদ্মবেশে এই সুখটুকু কি সে ফাঁকি দিয়ে আদায় ক'রে নিতে পারবে? আর যদি শমির চুড়ি নিঃশেষ হ'বার পরেও তার জীবনান্ত না ঘটে, তখন কি হবে? সে শঙ্কিত-সম্ভাবনাকে আর সে কিছুতেই চিন্তা করতে পারলো না। ঘুমিয়ে পড়লো।

শমিতার সে রাত্রে বাড়ি ফিরে এসে ঘুম হ'ল না। ঘুম না হওয়া তার নূতন নয়। কিন্তু আজকার নিদ্রাহীনতা একপ্রকার নূতন আনন্দের। সে ঘরে থেকে উল্লাসে পায়চারী ক'রে ফিরতে লাগলো—আমি মিথ্যা কথা বলেছি—আমি মিথ্যাবাদী। মিথ্যা কথা সে অমিতের জন্যে আগেও বলেছে—কিন্তু আগে এমন মিথ্যা কথায় প্রত্যুৎপন্নমতিত্বের পরিচয় দেয়নি। আজকার বিশেষ আনন্দ ওতেই। শমিতার মনে হচ্ছিল, কাছাকাছি যদি কোন ঘনিষ্ঠ বন্ধু থাকতো তবে তাকে এখনি এত রাত্রে ঠেলে তুলে সব ঘটনা বর্ণনা করলে যেন আনন্দ দ্বিগুণিত হ'য়ে ফিরে পাবে। এই মিথ্যাভাষণের আনন্দ প্রণয়ের বিদ্যুৎ শিখার মতো তার আসন্ন বৈধব্যের শুভ্রশূন্যতার প্রান্ত বেষ্টন ক'রে চিরায়ুষ্মতীর রঙিন পাড় অঙ্কিত ক'রে দিল।

এর পরের ঘটনা অতিশয় সংক্ষিপ্ত। সুখদুঃখের বিধাতা, সুখের চেয়ে দুঃখ দিতে যিনি অধিকতর তৎপর, তিনি অন্তত একবারের জন্যেও অমিতের কথা রাখলেন। শমিতার শেষ চুড়িখানা নিঃশেষ হ'বার সঙ্গে সঙ্গেই অমিতের জীবনান্ত ঘটলো।

সেদিন শমিতা যখন এলো—তার হাতে একখানাও চুড়ি নেই। সেদিন সকালেই শেষ চুড়ি ক'খানা বেচে যক্ষ্মাবাসের আগামী মাসের পাওনা সে মিটিয়ে দিয়েছে।

শমিতা নিজেই প্রসঙ্গ তুললো। কালকে ফিরবার পথে হঠাৎ মাঠের মাঝখানে 'বাস্'এর কল বিগড়ে গেল। তখন সন্ধ্যা হ'য়ে গিয়েছে, 'বাসে' আমরা দু'জন মাত্র যাত্রী—চারিদিক নির্জন, অনেক কিছুই ঘটতে পারতো।

যাক্, কোন বিপদ অবশ্য ঘটেনি। আমি ফিরে গিয়েই স্থির করলাম— আর নয়। তখনই চুড়ি ক'গাছা খুলে তুলে রেখে দিলাম। কেমন ভাল করিনি?

অমিত ঘাড় নেড়ে সমর্থন জানাল। তারপরে একদিন সব অবসান হ'ল। তার হাতের শুভ্রশঙ্খের ক্ষীণ শশীকলা শুক্লা চতুর্থীর নবযৌবনের অকাল দিগন্তে কখন খসে পড়ে গেল। তার সিঁথির সিঁদুরের শেষ রেখাটির চিহ্নমাত্রও আর কোন দিক্‌প্রান্তে রাখলো না। এতদিনে শমিতার নব নব মিথ্যাভাষণের শেষ আনন্দের অবকাশও অন্তর্হিত হ'ল।

অমিতের মৃত্যুর পরে যক্ষ্মাবাসের কর্তৃপক্ষ তার একখানি চিঠি শমিতাকে পাঠিয়ে দিল।

অমিত লিখছে—

"শমি,

তোমার জন্যে কিছুই রেখে যেতে পারলাম না। শুধু রইল আমার ভালবাসা, আর তোমার অলঙ্কারগুলো। তুমি এম-এ পাশ করেছ, কোনরকমে তোমার চলে' যাবেই জেনে আমি নিশ্চিন্ত হ'য়ে চললাম।

অমি।"

মিথ্যা কথার প্রতিদান অমিত মিথ্যা কথায় দিয়ে গিয়েছে! শমিতা চিঠি প'ড়ে ভাবলো—তবে তো উনি আমার মিথ্যা ধরতে পারেন নি। বিধাতার আশীর্বাদে মিথ্যাই আমার সত্যের চেয়ে বড় হ'য়ে উঠলো। তবু কি তার সর্বত্যাগ অমিত জানতে পারলে শমিতা আরও বেশি সুখী হ'ত না! হয়তো হ'ত— নিশ্চয় করে কে পরের মনের কথা বলতে পারে!

বিপত্নীক

অবশেষে ঘুমের আশা ছাড়িয়া দিতে হইল, ভাবিলাম ঘুম যখন হইবে না অন্তত ঘুমের ভান করিয়া চোখ বুজিয়া পড়িয়া থাকি। একটু সুবিধাও ছিল, আগেকার মতো আলোর ব্যবস্থা নাই। কিন্তু চোখ বুজিতে গিয়া দেখিলাম অসুবিধা অনেক ; প্রথমত এদিক ওদিকে মানুষের ঠেলায় দেহটা তিন চার জায়গায় মোড় ফিরিতে বাধ্য হইয়াছে, তার উপরে আবার শরীরের তলায় গোটা চার পাঁচ ছোট বড় বোচকার গুঁতা। এরকম অবস্থা পঞ্চমুণ্ডীর শব সাধনার অনুকূল হইতে পারে—কিন্তু ঘুমের নয় ; চোখ খুলিলে ছোট বড় মাঝারি, নূতন পুরাতন, তোরং বাক্স, স্যুটকেস প্যাঁটরা, পুঁটলি পোঁটলার দুঃস্বপ্ন ; চোখ বন্ধ করিলে তামাক বিড়ি চুরুট সিগারেট, গাঁজাও আছে বোধ হয়—প্রভৃতির কুজ্ঝটিকা। এর উপরে আবার গাড়িটা অতর্কিতে থামিয়া গিয়া সর্বাঙ্গে মস্ত একটা করিয়া কনুইয়ের গুঁতা মারে। অর্থাৎ তৃতীয় শ্রেণীর ট্রেনের এক কামরায় বাঙ্কের উপরে আমি ত্রিশঙ্কুর মতো ঝুলিয়া আছি। গাড়ি বেলা আট-টায় কলিকাতা পৌঁছিবার কথা—কিন্তু গাড়িখানা যেখানে সেখানে যেমন খুসি থামিতে থামিতে চলিয়াছে, সময়মতো পৌঁছানর আশা সবাই ছাড়িয়া দিয়াছে—সবারই বেশ নির্বিকল্প অবস্থা। দেশলাই-এর স্ফুরিত আলোকে গাড়ির ওই প্রান্তের জনপিণ্ডটাকে চোখে পড়িতেছে—এর মাথা, ওর পা, তার কোমর কারো বা ঘাড়ে মিলিয়া একটা নিহত কীচকের মর্দিত দেহ। ওরা ঘুমাইতেছে। আর ঠিক আমার নীচেই একটা দল ঘুমের আশা ছাড়িয়া বিড়ি সিগারেট টানিতেছে। কাহারো চেহারা দেখিতে পাইতেছি না, তবে মাঝে মাঝে নূতন বিড়ি ধরাইবার সময়ে দেশ্‌লাই-এর ক্ষিপ্রালোকে নাকের ডগা, গোঁফ থাকিলে গোঁফ, কাহারো চশমার ঝলমলানি চোখে পড়ে। তবে অন্ধকারে প্রত্যেকের গলার স্বরের বৈশিষ্ট্য এতক্ষণে চিনিয়া গিয়াছি। স্ফুরিত আলোকে কোন কোন ক্ষেত্রে স্বরে ও চেহারাতেও মিলাইয়া লইতে পারিয়াছি—ওই যার বোঁচা নাক, গলার আওয়াজ তার বেজায় মোটা ; চশমা ও গোঁফওয়ালার স্বর ভাঙা ভাঙা ; মোটা লোকটার, ক্ষণিক দীপ্তিতেও তাহার আয়তন না বুঝিয়া উপায় নাই, গলার স্বর সরু, স্বরে আর চেহারায় সামঞ্জস্য করাই কঠিন। তিনজনেই বোধ হয় এক স্টেশনে উঠিয়াছে, একই জায়গার যাত্রী, হয়তো আত্মীয়স্বজনও হইতে পারে। এ-সবই তাহাদের আলাপ হইতে সংগ্রহ করিয়াছি।

সরু আওয়াজ বলিল—ভাগ্যিস নিবারণকে সেকেণ্ড ক্লাসে দিয়েছিলাম। ওর এখন ঘুম দরকার।

মোটা আওয়াজ বলিল—আর ঘুম! জীবনের এক পর্ব শেষ হ'য়ে গেল। আর ঘুম—

সরু আওয়াজ বলিল—ঘুম না হোক্, বিশ্রাম তো চাই।

মোটা আওয়াজ বলিল—ক'বছর হ'ল হে, পাঁচ নয়?

কিছুক্ষণ পরে সরু বলিল—ছয় বছর। বোধ করি, সে মনে মনে মানসাঙ্ক কষিয়া লইয়াছে।

কিন্তু সরু মোটা কেহই নিজের কোট ছাড়িবার নয়। ছয় আর পাঁচে যখন রীতিমত কুরুক্ষেত্র বাধিয়া উঠিবার উপক্রম, তখন সেই ভাঙাগলার ভাঙা কাঁসা খন্‌খন্‌ করিয়া বাজিয়া উঠিল—নাও বাপু, একটু ঘুমোও তো! ছয়ও নয়, পাঁচও নয়—সাড়ে পাঁচ; হ'ল তো!

একটু চুপ। বিড়ির আলোটা স্থান পরিবর্তন করিল। বুঝিলাম, ভাঙাগলা মোটাগলার মুখ হইতে বিড়িটা টানিয়া লইল। ও গোটা-দুই খুব জোর টান মারিয়াছে—অনেকটা ধোঁয়া বিড়ির আলোয় দেখা গেল। তারপরে ভাঙা কাঁসা সুরু করিল—তোমরা যার হ'য়ে দুঃখ করছ, দেখগে সে এতক্ষণ সুখস্বপ্নে ভোর হ'য়ে ঘুমোচ্ছে!

এবারে সরু মোটা যুগপৎ ভাঙাগলার প্রতি সাঁড়াশি আক্রমণ করিল।

—কি যে বল্‌ছ, সবাই তোমার মতো নয়!

—নিবারণ কত ভালোবাসতো আমি তো জানি।

ভাঙা বলিল—ভালবাসা তো আমি অস্বীকার করছি না। স্ত্রীকে সবাই ভালবাসে, তাই ব'লে সে মারা গেলে আর বিয়ে করতে হবে না, এমন কোন্ শাস্ত্রে আছে শুনি?

—বিয়ে করবে না কেন? তবে তোমার কথা শুনে মনে হয় আজই বিয়ের কথা ভাবতে সুরু করেছে।

—শাস্ত্রের কথা নয় ভাই মনের কথা। পাঁচ বছরের ঘরকন্না, তার উপরে…

…তার উপরে দুটি ছেলেমেয়ে? আরে সেই জন্যই তো আরো বেশি বিয়ে করা দরকার।

মোটাগলা এবারে হাসিল—

এ যে ব্যাধির চেয়ে ওষুধ অনেক বেশী উৎকট। ছোট ছেলেমেয়ে মা মারা

গেলে অবশ্যই কষ্ট পাবে, কিন্তু কতদিন? একটু বয়স হ'লেই আর কষ্ট পাবে না। কিন্তু দু-বছরের কষ্ট দূর করবার জন্তে এক সৎমা জুটিয়ে দিলে সারাজীবন যে কষ্ট পেতে হবে।

সরুগলা আর একদিক হইতে আক্রমণ করিল—কিন্তু নূতন যাকে বিয়ে করবে সে মেয়ে কেন পরের ছেলের দায়িত্ব নিতে রাজি হবে? অবশ্য দায়ে পড়ে সবাই রাজি হয়—কিন্তু তাকে দিয়ে পরের ছেলে মানুষ করিয়ে নেবার অধিকার কারু নেই! সমাজ তার উপরে অন্যায় করে—সেই অন্যায়ের প্রায়শ্চিত্ত করে আগের পক্ষের ছেলেমেয়েগুলো, সারাজীবনের দুঃখকষ্টে!

সরুগলা নিজের বাগ্মিতায় নিজেই বিস্মিত হইয়া স্তব্ধ হইয়া রহিল, খুব সম্ভব ওটা দম লইবার অবসর।

মানুষের সুখদুঃখের কথা নাকি উপর হইতে বিধাতা শোনেন। সত্য কিনা জানি না, তবে আমি তাহাদের এই আলাপ বাঙ্কের উপর হইতে শুনিলাম। না শুনিলেও ক্ষতি ছিল না। বিধাতার শুনিয়াও মানুষের লাভ হয় না। পরের গুহ্য বিষয় পারৎপক্ষে না শোনাই উচিত, কিন্তু সে বিষয়ে পরের সহযোগিতা প্রয়োজন। ইহারা যেমন নিরঙ্কুশ—না শুনিয়া উপায় কি? মোটের উপরে বুঝিলাম, নিবারণ নামধেয় এক ব্যক্তির সদ্য স্ত্রী-বিয়োগ হইয়াছে, তাহার দুটি নাবালক ছেলেমেয়ে আছে। তাহারা কোথায় বুঝিতে পারিলাম না। তবে স্বয়ং নিবারণ পাশের এক সেকেণ্ড ক্লাস কামরায় বিরাজমান। সে নিদ্রিত কি জাগরিত এ বিষয়ে মতভেদ রহিয়াছে। নিবারণকে একবার দেখিতে পাইলে হইত।

সরুগলা পুছিল—আচ্ছা, তুমি নিবারণের বিয়ের জন্য এত ক্ষেপে উঠলে কেন শুনি?

এই প্রশ্নের উত্তর দিবার অবকাশ না দিয়া মোটাগলা পুছিল—হাতে পাত্রী আছে নাকি হে?

ভাঙাগলা সুরু করিল—নাঃ, ঘুমোতে, দেবে না দেখছি! পাত্রী থাকাথাকি আবার কি? কুলীনের ছেলে বুড়ো হ'লেও তার পাত্রীর অভাব হয় না—আর নিবারণ তো ছেলেমানুষ। কল্‌কাতায় পৌঁছে দেখো ঘটকের যাতায়াতে বাড়িতে তিষ্ঠোতে পারবে না।

মোটাগলা বলিল—বাইরের ঘটকের চেয়ে ভিতরের ঘটককে করে বেশি ভয়।

—সে ভয় নেই।

—তবে তোমার এত উৎসাহ কেন?

ভাঙাগলা বলিল—আমি নিবারণের জন্যই বলছি। যদি বিয়ে করে তবে এখনি ক'রে ফেলুক। নতুবা—

—তবে শোনো—সে এক গল্প, মানে গল্প নয়, এক ট্রাজিক কাণ্ড। সে অনেক দিনের কথা। আজো ভুলিনি—কখনো ভুলবো না। সেই জন্যেই তো আমি বিপত্নীককে সর্বদা বিয়ে করতে উপদেশ দিই। বিপত্নীকে বিয়ে করলে অনেকে হাসাহাসি করে—আমি চুপ ক'রে থাকি—আমার মনে অনেক দিন আগের সেই ঘটনা মনে পড়ে যায়।

—একটু দম লইয়া আবার সে সুরু করিল:

অনেক দিন আগে পশ্চিমের এক শহরে থাকতাম। তখন আমার বয়স অল্প। কত হবে?—বোধ করি দশ-বারোর বেশি নয়। একদিন হঠাৎ নেপালের তরাই অঞ্চল থেকে একদল লোক শহরে এসে উপস্থিত হ'ল। তারা অনেক দূর থেকে আসছে—সারাটা পথ হেঁটেই এসেছে; সঙ্গে কারো পয়সা-কড়ি ছিল না, তীর্থদর্শনে চলেছে দেওঘরে। বেচারাদের অনেক কয়দিন খাওয়া হয়নি। এতগুলো লোককে কে আর খেতে দেবে? ও-দেশটাই যে গরীবের দেশ। কোনো কোনো দিন এক মুঠো ভুট্টা জুটেছে, কোনদিন তা-ও জোটে নি। যখন তারা শহরে এসে উপস্থিত হ'ল, যেন একদল কঙ্কাল! বাজারের কাছে এসে সব বসে পড়লো। তখন না আছে তাদের উঠ্‌বার শক্তি, না পারে ভালো ক'রে কথা বলতে। বাজারের লোক তাদের গিয়ে ঘিরে ফেল্‌ল। কি ব্যাপার? কোত্থেকে আস্‌ছ? কোথায় যাবে? সব ব্যাপার শুনে তখনি একজন লোক গেল মুস্তফি-ডাক্তারের কাছে। তিনি শহরের সব বিষয়ের নেতা। মুস্তফি বললেন—ওদের ওষুধের চেয়ে পথ্যের দরকার বেশি। তখনি টাকা নিয়ে বাজারে এসে উপস্থিত হ'লেন। বাজার থেকে খাবার কিনে তাদের খেতে দিলেন। ক্ষুধার সে কি লোলুপ মূর্তি! কোনো দিন সে খাওয়ার ছবি ভুলবো না। তারপরে চালডাল যোগাড় ক'রে তাদের রান্নার যোগাড় ক'রে দিলেন। পয়সা দিয়ে চাল-ডাল কিনতে হ'ল না। দোকানদারেরা ক্ষুধিত তীর্থযাত্রীর নাম শুনেই বিনা পয়সায় সব দিল। বিশেষ মুস্তফিবাবু এসেছেন—তাঁর কাছে সবাই জীবন্মৃত্যুর ঋণে বাঁধা।

আমরা ছোট ছেলেরা আশেপাশে ঘুরচি, ফাই-ফরমাস খাটছি, জলটা পাত্রটা

এগিয়ে দিচ্ছি। তারপরে তারা সবাই যখন খেতে বসলো—শহরের লোক এসে ঘিরে দাঁড়ালো। কাঙালীভোজন দর্শনেও নাকি পুণ্য আছে। এমন সময়ে এক কাণ্ড ঘটলো—সেই কথাই বলতে যাচ্ছি—এটা শুধু তারই ভূমিকা। বাজারের মধ্যে ছোট্ট একটা গলি ছিল। হঠাৎ তার মধ্যে এক সোরগোল। ব্যাপার কি? খাওয়ার জায়গা থেকে সবাই ছুটলো সেইদিকে। ছোট্ট গলিটা ভিড়ে নিরেট হ'য়ে গেল। আর ভিড়ের মধ্যে আমাদের মাথা তলিয়ে গেল—কিছুই দেখতে পেলাম না। পরে শুনলাম—সাব্-জজ নাকি কলমি গোয়ালিনীর হাত চেপে ধরেছিলেন।

শহরে একজন পেন্সনপ্রাপ্ত সাব্-জজ থাকতেন, বয়স সত্তরের ধারে-কাছে,—সম্ভ্রান্ত, বিশিষ্ট লোক। ঘরে নাতিনাতনি আছে—তবে স্ত্রী অনেক কাল হ'ল গত হয়েছেন। কলমি গোয়ালিনি আধা-বয়সের একটি মেয়ে। সে এই গলির ভিতর দিয়ে যাচ্ছিল—সাব্-জজবাবু তাকে অনুসরণ ক'রে গলিতে ঢুকে পড়েন—আর হঠাৎ এসে তার হাত ধরেন। সে ভয়ে চীৎকার ক'রে ওঠে—আর তখনি লোকজন জুটে গেল। এ সব তো পরে শুনেছি। তখন সেই জনতার যে অবস্থা! কেউ রাগ করলো, বললো—মারো ওঁকে! বেটা বেড়ালতপস্বী। কেউ কেউ বিদ্রূপ করতে লাগলো—সে কি অশ্রদ্ধার হাসি! এতদিন যাকে বড় বলে না মেনে উপায় ছিল না—তাকে হঠাৎ নীচের ধাপে দেখে মানুষের সে কি আত্ম-প্রসাদের হাসি! সব্বাই ছি ছি করতে করতে চলে গেল। মুস্তফীবাবুর চেষ্টায় ব্যাপারটা ওখানেই মিটে গেল। সাব্-জজবাবু লজ্জায় শহর ছেড়ে অন্যত্র চলে গেলেন।

মোটা ও সরু যুগপৎ বলিল—এ কেচ্ছা এখানে ফাঁদবার অর্থ কি।

—অর্থ সেদিনকার জনতাও বুঝতে পারেনি—আর তোমরাও বুঝতে পারলে না দেখছি।

মোটাগলা একটু রাগতভাবেই যেন বলিল—এর মধ্যে বুঝবার আবার কি আছে? একটা বুড়ো লম্পটের কাহিনী। পৃথিবীতে সত্যই ঘৃণার যদি কিছু থাকে তবে তা বৃদ্ধ লম্পট। ছি ছি! এই বলিয়া নিজের নৈতিক তাপে নিজেই হাত-পা সেঁকিতে লাগিল।

সরুগলা আবার সূক্ষ্ম সমালোচক। সে বলিল—বুড়ো শালিকের ঘাড়ে রোঁয়াতে তোমার ঐ সাব্-জজ বাবুকেই দেখেছি এবং দেখে হেসেছি।

—তার কারণ ওই প্রহসন তাকে নিয়ে হাসবার জন্যেই লিখিত। নাট্যকার

শুধু কার্যটা দেখিয়েছেন তাই সেটা হয়েছে প্রহসন। শিল্পরীতি বদলে ওর কারণটা নিয়ে যদি নাটক লিখতেন, তবে হ'ত সেটা ট্রাজেডি। তখন হাসি না পেয়ে—

—কান্না পেতো?

—ট্রাজেডির উদ্দেশ্য কাঁদানো নয়—ভাবানো—আত্মদর্শনে সাহায্য করা বলতে পারো।

সরুগলা বলিল—আচ্ছা আমরা যেন কিছু বুঝিনি, তুমি কি বুঝেছ তাই শুনি না।

ভাঙাগলা বলিল—আমিও গোড়াতে তোমাদের মতই ভুল করেছিলাম, হেসেছিলাম, ধিক্কার টিট্‌কারিতে যোগ দিয়েছিলাম। বিশেষ তখন তো আমার বুঝবার বয়স নয়। কিন্তু বুঝি আর নাই বুঝি, ঘটনাটা মনের মধ্যে রয়ে গিয়েছিল। তারপরে কালক্রমে নিজের দুঃখের সঙ্গে ওই সাব্‌-জজবাবুর দুঃখ জড়িয়ে, নিজের অভিজ্ঞতার পরিপূরক সাব্‌-জজবাবুর ওই অভিজ্ঞতাকে ক'রে নিয়ে, এতদিনে ব্যাপারটার রহস্য যেন বুঝেছি।

দুই গলাই নীরব। সে বলিয়া চলিল—ওই যে ক্ষুধিত লোকগুলিকে খাওয়াবার জন্যে শহরের লোক আগ্রহ প্রকাশ করেছিল—সংসারে ক্ষুধার ওই এক মূর্তি। তার আরএক মূর্তি সাব্‌-জজবাবুর কলমির হাত ধরে টান দেওয়াতে। মানুষে শুধু কার্যটাই দেখে, কিন্তু যে দীর্ঘ কারণ পরম্পরার ঠেলায় কার্যটা অনিবার্য হ'য়ে ওঠে, তা তাদের চোখে পড়ে না। ক্ষুধার এক মূর্তিকে তৃপ্ত করা ধর্মকার্য ব'লে মনে করি—অথচ ক্ষুধার আর মূর্তিকে…কি বলবো….এই অন্ধকারেও বলতে সঙ্কোচ বোধ হচ্ছে! কিন্তু যা সত্য তা অন্ধকারেও সত্য! অতি পবিত্র চন্দন কাঠের আগুনেও তো হাত পোড়ে! একে তোমরা দুর্নীতি বলে সমর্থন না করতে পারো—অন্তত সত্য বলে স্বীকার করে নেবার সাহস যেন থাকে। সত্য যদি মুখনিবাসী হ'ত, তবে মুখ চাপা দিয়ে সত্যকে থামানো যেতো। কিন্তু যার বাস মানুষের স্বভাবের মধ্যে, তাকে থামাবে কি ক'রে? হিতোপদেশ, চাণক্যশ্লোক, বোধোদয় দিয়ে স্বভাবের সেতুবন্ধ সম্ভব নয়।

—তাই তুমি নিবারণকে—

…হ্যাঁ, তাই আমি তাকে অতি শীঘ্র বিয়ে করে ফেলতে বলি। স্ত্রীর মৃত্যুতে অবশ্যই তার দুঃখ হ'য়েছে, কিন্তু সেটা মনের ধর্ম। মন দুঃখিত ব'লে কি দেহ তার ধর্ম ভুলবে? কেন ভুলবে? আর মানুষ মাত্রেই দেহধর্মের বশীভূত। স্বয়ং শ্রীকৃষ্ণকেও দেহধর্মের নিয়মে প্রাণত্যাগ করতে হয়েছিল।

"...বেরিলি কি বাজার মে পানি গিরারে—আউর লাঠি গিরা রে।"

গাড়ির অপর প্রান্তের পিণ্ডীভূত জনতার কণ্ঠ হইতে গান উঠিল— 'বেরিলি কি বাজার মে....।' বেরিলির বাজারের এই অভূতপূর্ব পতনের শব্দে এতক্ষণের চটকা ভাঙিয়া পার্শ্ববর্তী বাস্তবে ফিরিয়া আসিলাম।

বেরিলির সঙ্গীতে মনে হইল রাত্রি ভোর হইয়া আসিয়াছে, নিদ্রিত জনপিণ্ড সহজাত শক্তির বলে তাহা যেন বুঝিতে পারিয়াছে। ওঃ, গাড়ির মধ্যে এত ধোঁয়া জমিয়াছে যে কামরাখানা শিকলে বাঁধা না থাকিলে এতক্ষণে বেলুনের মতো আকাশপথে উড়িতে সুরু করিত! কাঁচের শার্সির দিকে তাকাইয়া মনে হইল বাহিরের গাছপালার একটা ঝাপসা রেখা যেন দৃশ্যমান; যেন রবার দিয়া ঘষিয়া মোছা পেন্সিলের অস্পষ্ট দাগ—আর তার উপরে গোটা কয়েক তারা। একবার জানালাটা খুলিয়া দিলে মন্দ হইত না। কিন্তু অনুরোধ করিলে কেহ উঠিবে না, নিজে উঠিয়া খুলিতে গেলে পার্শ্ববর্তী নিদ্রাতুরাতুর দেহটাকে আরও একটু এলাইয়া দিয়া আমাকে স্থানচ্যুত করিবে। রাত্রিশেষের শেষ মুহূর্তে সকলেই সারা রাত্রির বিঘ্নিত নিদ্রার শোধ তুলিয়া লইতে ব্যস্ত। অতএব পূর্ববৎ পড়িয়া থাকিয়া কাঁচের শার্সির ঘষা রেখাটার দিকে তাকাইয়া রহিলাম। তিন গলাই স্তব্ধ—বহুক্ষণের আলাপে ক্লান্ত কিম্বা হঠাৎ হয়তো ঘুমের দুরাশা তাহাদের পাইয়া বসিয়াছে। ওদিকে বেরিলি বাজার শ্রেণীর সঙ্গীত সত্ত্বেও গাড়িটা অস্বাভাবিকভাবে নিস্তব্ধ। হয়তো আমার কান তেমন সজাগ নয় বলিয়াই স্তব্ধ মনে হইতেছিল—মনের মধ্যে সাব্-জজবাবু ও নিবারণ সঞ্চরণ করিয়া ফিরিতেছিল। নিবারণবাবু কি কালক্রমে সাব্-জজবাবুতে পরিণত হইবে না? না, কুলীনের ছেলে ভাসিয়া ওঠামাত্র ঘটক বোয়ালে গ্রাস করিয়া ফেলিবে? দুটাই সমান দুঃখকর। সাব্-জজবাবুর পরিণাম দুঃখের, কিন্তু তাই বলিয়া সদ্য বিগতপত্নীক শানাই বাজাইয়া পুনরায় বিবাহে চলিয়াছে—এ চিত্রও কম মর্মান্তিক নয়। সংসারের পথ সুখদুঃখের মধ্যগামী হইলে সংসার এমন দুর্বিসহ হইত না; সংসারে পথের একদিকে এক রকম দুঃখ, আর একদিকে আর এক রকম দুঃখ; একদিকে তার অতলস্পর্শী খাদ, অপর দিকে আকাশস্পর্শী চূড়া—বড়ো বুদ্ধিমানই হও না কেন, এক সঙ্গে দুটা আশঙ্কা হইতে পরিত্রাণ কখনই পাইবে না। সংসারে সেই বুদ্ধিমান, সেই সৌভাগ্যবান্ তাহাকেই আমরা ঈর্ষা করি, যে দুটা মারের মধ্যে একটাকে বাঁচাইয়া যাইতে পারে। অধিকাংশ পথিকেই দুই হাতের মার খায়।

বাহিরে বনরেখার একটানা ঝাপসা ইতিমধ্যে স্বতন্ত্র হইয়া বৃক্ষত্ব পাইয়াছে। আকাশের তারা ছুটা নাই। গরমের দিন হইলে এতক্ষণে বেশ আলো হইত। গাড়িটা গোটা কয়েক বিষম ঝাঁকুনি দিয়া অনেকগুলা লাইন পার হইল। গতিও কমিয়া আসিয়াছে, বোধ হয় কোন স্টেশন আসন্ন।

এতক্ষণে সরুগলা, মোটাগলা, ভাঙাগলার চেহারা দিব্যি পরিস্ফুট হইয়া উঠিয়াছে; তাহাদের স্বরে, মতে, চেহারায় বেশ মিলাইয়া লইয়াছি। গাড়ির শূন্য আকাশ কালো মাথায় এবং ক্লান্ত চোখে ভরিয়া গিয়াছে, এতক্ষণ যাহারা নানা অপ্রত্যাশিত স্থানে, অসম্ভাবিত আকারে ঘুমাইতেছিল, এবারে তাহারা জাগিয়া উঠিয়া বসিয়া রাত্রের অভদ্রতা, পদাঘাত প্রভৃতির জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করিয়া আসন্ন স্টেশনের চায়ের অপেক্ষায় উৎসুক হইয়া আছে।

চায়ের আগ্রহ আমারও ছিল, তাই গুটি গুটি বাঙ্ক হইতে নামিয়া বেঞ্চির এক টেরে বসিলাম। কিন্তু মনে চায়ের আগ্রহের চেয়েও বেশি ছিল নিবারণকে দেখিবার ইচ্ছা। ভাঙাগলার ওকালতিতে মনঃস্থির হইয়া গিয়াছিল যে নিবারণের বিবাহ করা উচিত—কিন্তু তৎপূর্বে একবার নিবারণকে দেখিতে পাইলে হইত।

রানাঘাট। চা, খাবার, কাগজ, গরম দুধের বহুবিধ চিৎকারে যেন শব্দের মৌচাক ভাঙিয়া পড়িল। সব চেয়ে বেশি জটলা ধূমায়িত চায়ের স্টলের কাছে। প্রাতঃকালের কুয়াশা, উনুনের ধোঁয়া, পেয়ালার বাষ্প মিলিয়া বেশ একটা নীহারিকালোকের সৃষ্টি করিয়াছে।

তিন গলা একত্র হইয়া গলা ভিজাইবার জন্য জানলা দিয়া ঝুঁকিয়া পড়িয়া চা-করের উদ্দেশে ডাকাডাকি করিতেছে। এমন সময়ে সরুগলা হাঁকিয়া উঠিল —নিবারণ, নিবারণ রাতে ঘুম হ'য়েছিল তো? কেমন ছিলে?

চায়ের উমেদারদের মধ্যেই নিবারণ একজন। আমি নিবারণকে চিনিতাম না, কিন্তু চিনিবার প্রয়োজনও ছিল না—সহস্রের জনতার মধ্যেও তাকে বাছিয়া লইতে পারিতাম। মানুষের মুখে চোখে হাবেভাবে সর্বাঙ্গে যে এমন সূচীভেদ্য নৈরাশ্য থাকিতে পারে, তাহা না দেখিলে কখনই বিশ্বাস করিতে পারিতাম না। মেঘলা রাত্রের কুয়াশায় দিক্‌ভ্রান্ত নাবিকের মতো তার ভাব। চুল রুক্ষ, দাড়ি গজাইয়াছে, কাপড়জামা এলোমেলো—চোখের অনাসক্ত উদাস দৃষ্টি। চা-পান করিবার আশায় সে দোকানে গিয়াছিল, কিন্তু চাহিতে ভুলিয়া গিয়াছে। তিন গলার তাহার নাম ধরিয়া ডাকাডাকিতে একবার সে ফিরিয়া তাকাইল বটে, কিন্তু উত্তর দিল না। অর্থ বুঝিয়াছে বলিয়া মনে হইল না। সে যেন এক

জগতের লোক, এই সব আনাগোনা, ভালমন্দর সঙ্গে যেন তাহার কোন সম্বন্ধ নাই। দুঃখের মূর্তি দেখিয়াছি, কিন্তু পরিপূর্ণ নৈরাশ্যের মূর্তি এই প্রথম দেখিলাম। দুঃখ অন্ধকার, নৈরাশ্য কুয়াশা; দুঃখ বিশ্বকে ঢাকিতে গিয়া অন্তত নিজকে প্রকাশ করে, কুয়াশা বিশ্বকেও ঢাকে নিজকেও প্রকাশ করিতে পারে না; দুঃখ দুর্বিবহ, নৈরাশ্য অসহ্য। নিবারণের পত্নীবিয়োগের নৈরাশ্য। আমি চা-পান করিতে ভুলিয়া গিয়া চুপ করিয়া রহিলাম। ভাবিতেছিলাম কি? হয়তো রাত্রির তর্কের জের টানিয়া সত্যই কিছু ভাবিতেছিলাম; কিন্তু না, না, নিবারণের বিবাহের প্রশ্ন আর উঠিতেই পারে না। গাড়ি ছাড়িয়া দিল। তিনজনে নিবারণকে ডাকিতে লাগিল—সে একবার তাকাইল, কিন্তু গাড়ি ধরিবার জন্য কোনরূপ উদ্যম করিল না। সে একই স্থানে মূঢ়ের মতো দাঁড়াইয়া রহিল। শীতকালীন গাঢ় কুয়াশায় চারিদিক লুপ্ত, আজ সে কুয়াশা নিবারণের নৈরাশ্যের সঙ্গে মিলিত হইয়া যেন গাঢ়তর!

চারজন মানুষ ও একখানা তক্তপোষ

একদিন বিকাল-বেলা এক সরাইখানায় চারজন পথিক আসিয়া পৌঁছিল। সরাইখানার মালিক তাহাদের যথা সম্ভব আদর অভ্যর্থনা করিয়া বসাইল। পথিকরা অনেক দূর হইতে আসিতেছে, পথশ্রমে অত্যন্ত ক্লান্ত, গত রাত্রি তাহাদের সকলেরই বৃক্ষতলে কাটিয়াছে, আজ সরাইখানায় বিশ্রাম ও আহার করিতে পারিবে আশায় উৎফুল্ল হইয়া উঠিল। তাহারা একটি কক্ষে বসিয়া আহার করিয়া লইল এবং তারপরে পরস্পরের পরিচয় লইতে লাগিল। তাহাদের কেহ কাহাকেও চিনিত না—এই তাহাদের প্রথম সাক্ষাৎ।

প্রথম পথিক বলিল যে, সে একজন শিক্ষক। এখন বিদ্যালয়ের ছুটি, তাই সে তীর্থযাত্রায় বাহির হইয়াছিল। হিমালয়ের পাদদেশে পশুপতিনাথের পীঠস্থান। কয়েকজন সঙ্গীর সাথে সে সেখানে গিয়াছিল। দেবদর্শন সারিয়া ফিরিবার পথে তাহারা পথ হারাইয়া এক বনের মধ্যে ঢুকিয়া পড়ে। রাত্রে তাহারা এক গাছের তলায় আশ্রয় লইতে বাধ্য হয়। ভোর-বেলা যখন সে জাগিল, দেখিল যে তাহাদের সঙ্গীরা নাই, তৎপরিবর্তে তাহাদের কঙ্কাল কয়খানা পড়িয়া আছে। বোধ হয় কোন শ্বাপদে খাইয়া দিয়াছে। কিন্তু সে একা বাঁচিল কিরূপে? তখন তাহার মনে পড়িল সে যে শিক্ষক, সে যে জাতিগঠনের রাজমিস্ত্রি—শ্বাপদ বোধ হয় সেই খাতিরেই তাহাকে ছাড়িয়া দিয়াছে। যদি এ শ্বাপদটা তাহার ভূতপূর্ব্ব ছাত্র হইত, তবে কি আর তাহার রক্ষা ছিল? কিম্বা এমনও হইতে পারে যে, হাজার হাজার ছাত্র শাসাইয়া এমন শক্তি সে অর্জন করিয়াছে—সামান্য শ্বাপদে তাহার কি করিবে? যাই হোক, আর যে-কারণেই হোক, সে পুনরায়, চলিতে আরম্ভ করিল। সারা দিন চলিবার পরে সে এই সরাইখানায় আসিয়া পৌঁছিয়াছে। সংক্ষেপে ইহাই তাহার পরিচয়।

তখন দ্বিতীয় পথিক আরম্ভ করিল। সে বলিল যে, সে একজন সাহিত্যিক। গোরক্ষপুরে সাহিত্য সম্মেলনের অধিবেশনে সভাপতি নির্বাচিত হওয়ায় সেখানে সে গিয়াছিল। একটি বৃহৎ অট্টালিকায় যখন মহতী সভার অধিবেশন আরম্ভ হইয়াছে এমন সময়ে এক কালান্তক ভূমিকম্প সুরু হইল। ফলে অট্টালিকার ছাদখানি পড়িয়া সকলেই মারা গেল—কেবল সে অক্ষতদেহে রক্ষা পাইয়াছে।

তাহার শ্রোতারা বিস্ময়ে বলিল—তাহা কিরূপে সম্ভব?

সাহিত্যিক বলিল—আপনারা জানেন না, আর জানিবেনই বা কিরূপে, আপনারা তো সাহিত্যিক নহেন, সাহিত্যিকদের মাথা বড় শক্ত। হেন ছাদ নাই—খসিয়া পড়িয়া যাহা তাহাদের মাথা ফাটাইতে সমর্থ, হেন ভূমিকম্প নাই যাহাতে তাহারা টলে, হেন অগ্নিকাণ্ড নাই—যাহাতে তাহারা পোড়ে।

শিক্ষক বলিল—তবে অন্য সবাই মরিল কেন?

সাহিত্যিক বলিল—সে মহতী সাহিত্য সভায় আমিই ছিলাম একমাত্র সাহিত্যিক। ইহা শুনিয়া আপনারা বিস্মিত হইতেছেন—কিন্তু ইহা নিশ্চয় জানিয়া রাখুন সাহিত্য সভায় পারৎপক্ষে সাহিত্যিকরা কখনো যায় না—এক সভাপতি ব্যতীত। তাই তাহারা পিষিয়া মারা গেল—আর আমি যে শুধু বাঁচিয়া রহিলাম তা-ই নয়, আমার মাথায় লাগিয়া একখানা পাথরের টুক্‌রা চূর্ণবিচূর্ণ হইয়া ধূলি হইয়া গেল। এই সেই ধূলি।

এই বলিয়া সে পকেট হইতে এক কৌটা ধূলি বাহির করিয়া দেখাইল। তারপরে বলিল—সাহিত্যিকদের বেলায় শিরোধূলি কথাটাই অধিকতর প্রযোজ্য। তারপরে গোরক্ষপুর হইতে বাহির হইয়া পথ ভুলিয়া এখানে আসিয়াছি। ইহাই আমার পরিচয়।

তৃতীয় পথিক বলিল—মহাশয়, আমি একজন চিকিৎসক। হুজরতপুরে মহামারী দেখা দিয়াছে শুনিয়া সেখানে আমি গিয়াছিলাম। সেখানে কোন চিকিৎসক ছিল না। আমি সেখানে গিয়া নিজেকে বিজ্ঞাপিত করিবামাত্র হুজরতপুরের সমস্ত অধিবাসী নগর ছাড়িয়া পলায়ন করিল। তাহারা যাইবার সময়ে বলিয়া গেল যে মহামারীর হাতে যদি বা বাঁচি—মহাবৈদ্যের হাত হইতে রক্ষা করিবে কে?

নগরের মধ্যে ঘুরিতে ঘুরিতে এক অতি কুৎসিত ও বীভৎস বৃদ্ধকে দেখিতে পাইয়া বলিলাম—তুমি পালাও নাই কেন?

সে বলিল—আমার ভয়েই তো সকলে পালাইতেছে, আমি পালাইতে যাইব কেন? আমার নাম মহামারী। আমি তাহাকে বলিলাম যে তোমার গর্ব বৃথা, সকলে আমার ভয়েই পালাইয়াছে, আমার নাম মহাবৈদ্য। ইহা শুনিবামাত্র সে প্রাণভয়ে পলায়ন সুরু করিল। কিছুকাল পরে দেখি হুজরতপুরের নাগরিকগণ মহামারীর সঙ্গে সন্ধি করিয়া আমার বিরুদ্ধে অভিযান আরম্ভ করিয়াছে। তাহারা বলিল—মহামারী আমাদের শত্রু নয়, মিত্র; যেহেতু তাহার কৃপাতেই আমরা অক্ষয়স্বর্গ লাভ করিবার সৌভাগ্য পাইয়া থাকি। তাহাদের সম্মিলিত শক্তির

সম্মুখে আমি দাঁড়াইতে না পারিয়া পরম ভাগবত ইংরাজ সৈন্তের মতো দৃঢ়-পরিকল্পনানুযায়ী পশ্চাদপসরণ করিতে করিতে এখানে আসিয়া উপস্থিত হইয়াছি। বন্ধুগণ, ইহাই আমার ইতিহাস।

তখন চতুর্থ পথিকের পরিচয় দিবার পালা।

সে আরম্ভ করিল—মহাশয়, আমি গঙ্গাস্নানে গিয়াছিলাম। সারা দিন উপবাসী থাকিয়া সন্ধ্যায় যখন স্নান করিতে নামিব এমন সময়ে শুনিতে পাইলাম কে যেন বলিতেছে—বৎস, তুমি যথেষ্ট পুণ্য সঞ্চয় করিয়াছ—এখন স্নান করো, করিবামাত্র তোমার মুক্তি হইয়া যাইবে, আর তোমাকে পৃথিবীতে বাস করিতে হইবে না।

সে বলিল—মহাশয়, মুক্তি কাম্য ইহা জানিতাম, কিন্তু কখনো সত্ত মুক্তির সম্ভাবনা ঘটে নাই। আমি বিষম ভীত হইয়া পড়িলাম এবং গঙ্গাস্নান না করিয়াই পলায়ন করিলাম। রাত্রে পথ ভুলিয়া গেলাম, কোথা হইতে যে কোথায় গেলাম জানি না—তারপরে ঘুরিতে ঘুরিতে এখানে আসিয়া পৌঁছিয়াছি।

তাহার কাহিনী শুনিয়া অপর তিন পথিক বিস্মিত হইয়া জিজ্ঞাসা করিল—আপনার পরিচয় কি?

ইহা শুনিয়া চতুর্থ পথিক বলিল—আমি একজন চলচ্চিত্র অভিনেতা—যাহার বাংলা 'সিনেমা স্টার'।

তখন সকলে একবাক্যে স্বীকার করিল—তাহার অভিজ্ঞতাই সব চেয়ে বিস্ময়কর—তবে সিনেমা স্টারের পক্ষে বিস্ময়ের কিছুই নাই।

এই ভাবে পরস্পরের পরিচয় সাধনের পালা উদ্‌যাপিত হইলে চার জনে মিলিয়া গল্পগুজব আরম্ভ করিল; চারজনেই আশা করিল যে, রাতটা আমোদ-আহ্লাদে ও আরামে কাটাইতে পারিবে। এমন সময়ে সরাইখানার মালিক প্রবেশ করিল। সে অতিথিদিগকে বিশেষ আপ্যায়ন করিয়া সেখানে যতদিন খুসী কাটাইতে অনুরোধ করিল, বলিল—তাহাদের যাহাতে কোন অসুবিধা না হয় সেদিকে সে দৃষ্টি রাখিবে। তারপরে কি যেন মনে পড়াতে সে একটু হাসিয়া বলিল—এই সরাইখানার সমস্ত ঘরই অধিকৃত—কেবল একটিমাত্র ঘর খালি আছে।

পথিকরা বলিল—একটি ঘরেই আমাদের চলিবে।

সরাইখানার মালিক বলিল—ঘরটি নীচের তলাতে কাজেই একটু স্যাঁৎসেতে—

পথিকরা বলিল—তাহাতেই বা ক্ষতি কি? ঘরে তক্তপোশ আছে তো?

মালিক বলিল—তক্তপোশ অবশ্যই আছে—কিন্তু একখানা মাত্র, কাজেই আপনাদের তিনজনকে মেঝেতে শুইতে হইবে, সেই জন্যই স্যাঁৎসেতে মেঝের উল্লেখ করিয়াছিলাম। ইহা ছাড়া আর কোন অসুবিধা নাই। আপনাদের মধ্যে কে তক্তপোশে শুইবেন তাহা আপনারা স্থির করিয়া ফেলুন, আমি আর কি বলিব? এই বলিয়া সে প্রস্থান করিল।

তখন পথিক চারজন বিব্রত হইয়া পড়িল। কে বা তক্তপোশে শুইবে আর কারা বা মেঝেতে শুইবে! তাহারা সেই ঘরটায় গিয়া দেখিল সরাইখানার মালিকের কথাই সত্য। ঘরের মেঝে বিষম ভেজা, তার উপরে আবার এখানে সেখানে গর্ত্ত, ইতস্ততঃ আরশুলা, ইঁদুর, ছুঁচো নির্ভয়ে পরিভ্রমণশীল, এক কোনে আবার একটা সাপের খোলসও পড়িয়া আছে। আর এক দিকে একজনের মাপের একখানা তক্তপোশ—সেটাও আবার অত্যন্ত জীর্ণ।

চারজনে গালে হাত দিয়া বসিয়া পড়িল—তাহাদের দুরবস্থা দেখিয়া ছুঁচো-গুলা চিক্ চিক্ শব্দে পলায়ন করিল—যেন ফিক্ ফিক্ করিয়া হাসিয়া উঠিল।

কে তক্তপোশে শুইবে? কাহার শরীর খারাপ? চারজনেরই শরীরের অবস্থা সমান।

তখন শিক্ষক বলিয়া উঠিল—এক কাজ করা যাক্। আমাদের মধ্যে যাহার জীবন সমাজের পক্ষে সবচেয়ে দরকারী—সে-ই তক্তপোশে শয়ন করিবে, অপর তিনজনকে মেঝেতে শুইতে হইবে।

ইহা শুনিয়া তিনজনে যুগপৎ বলিয়া উঠিল—ইহা অত্যন্ত সমীচীন—আর ইহা শিক্ষকের যোগ্য কথা বটে। কিন্তু কাহার জীবন সমাজের পক্ষে সবচেয়ে দরকারী তাহা কেমন করিয়া বোঝা যাইবে? পরীক্ষার উপায় কি?

তখন সাহিত্যিক বলিল—আমি একটা উপায় নির্দেশ করিতে পারি। আসিবার সময়ে দেখিয়া আসিয়াছি কাছেই একটা গ্রাম আছে। সেখানে আমাদের কেহ চেনে না। আমরা চারজন চার পথে সেই গ্রামে প্রবেশ করিব। নিজেদের অত্যন্ত বিপন্ন বলিয়া পরিচয় দিব—ইহার ফলে গ্রামের লোকদের কাছে যে সবচেয়ে বেশি সাহায্য ও সহানুভূতি পাইবে—বুঝিতে পারা যাইবে তাহারই জীবনের মূল্য সর্বাধিক। তক্তপোশে শয়ন করিবার অধিকার তাহারই।

সাহিত্যিকের উদ্ভাবনী শক্তি দেখিয়া তিনজনে স্তম্ভিত হইয়া গেল।

তখন চিকিৎসক বলিল—তবে আর বিলম্ব করিয়া কাজ কি? এখনো

অনেকটা বেলা আছে—এখনি বাহির হইয়া পড়া যাক, রাত্রি প্রথম প্রহরের মধ্যেই ফিরিতে হইবে।

সিনেমা স্টার বলিল—আশা করি, আমরা সকলেই নিজেদের অভিজ্ঞতা সম্বন্ধে ফিরিয়া আসিয়া সত্য কথা বলিব।

ইহা শুনিয়া শিক্ষক বলিয়া উঠিল—হায় হায় যদি মিথ্যা কথাই বলিতে পারিব তবে আজ কি আমার এমন দুর্দশা হইত!

তখন সকলে পরিকল্পনা অনুযায়ী গ্রামের দিকে বিভিন্ন পথে প্রস্থান করিল।

(২)

রাত্রি প্রথম প্রহর উত্তীর্ণ হইবার পূর্বেই চার বন্ধু ফিরিয়া আসিল। সকলে একটু বিশ্রাম করিয়া লইয়া সদ্যলব্ধ অভিজ্ঞতার ধাক্কা সামলাইয়া লইয়া নিজের নিজের পরিভ্রমণ কাহিনী বলিতে সুরু করিল।

প্রথমে শিক্ষক বলিতে আরম্ভ করিল। সে বলিল—আমি উত্তর দিকের পথ দিয়া গ্রামে প্রবেশ করিলাম। কিছুদুর গিয়া একটি সম্পন্ন গৃহস্থ-বাড়ি দেখিলাম—ভাবিলাম এখানেই আমার ভাগ্য পরীক্ষা করিব। বাড়ীর দরজায় উপস্থিত হইবামাত্র সেই দয়ালু গৃহস্থ আমাকে বসিবার জন্য একটি মোড়া আগাইয়া দিল। আমি তাহাকে নমস্কার করিয়া উপবেশন করিলাম। সদাশয় গৃহস্থ আমাকে আপ্যায়িত করিয়া আমার পরিচয় শুধাইল। আমি বলিলাম যে, আমি একজন বিদেশী শিক্ষক—পথ ভুলিয়া এখানে আসিয়া পড়িয়াছি।

ইহা শুনিবামাত্র গৃহস্থ চাকরকে ডাকিয়া বলিল—ওরে রামা, মোড়াটা ঘরে তুলিয়া রাখ্, বাহিরে থাকিলে নষ্ট হইয়া যাইবে। আমি পরিত্যক্ত মোড়া হইয়া দাঁড়াইয়া রহিলাম। বলিলাম—আজ আপনার বাড়ীতে রাত্রি কাটাইবার অনুমতি প্রার্থনা করি। ইহা শুনিয়া গৃহস্থ বলিল—তোমাকে যে আশ্রয় দিব তাহার স্থানাভাব। আমি বলিলাম যে, অন্য জায়গা যদি না থাকে, তবে অন্ততঃ আপনার গোয়াল ঘরে নিশ্চয় স্থান হইবে। ইহা শুনিয়া গৃহস্থ বলিল—গোয়াল ঘরেই বা স্থান কোথায়? দশ-বারোটা গোরু আছে। কোনটাকে বাহিরে রাখিতে সাহস হয় না—রাত্রে বড় বাঘের ভয়। আজকাল গোরুর যা দাম জানো তো?

আমি কহিলাম—গোরুর চেয়ে শিক্ষকের জীবনের মূল্য কম?

সে বলিল—কি যে বলো? একটা যেমন তেমন গোরুও আজকাল পাঁচশো

টাকার কম মেলে না? আর দশ টাকা হইলেই একটা শিক্ষক মেলে। এখন তুমিই বিচার করিয়া দেখো।

আমি বলিলাম—কিন্তু আমরা যে জাতিগঠন করি।

বৃদ্ধ হাসিয়া বলিল—তার মানে তোমরা গোরু চরাও। কিন্তু রাখালের চেয়ে গোরুর মূল্য অনেক বেশি।

আমি বলিলাম—আপনার ছেলে নিশ্চয় শিক্ষকের কাছে পড়ে।

সে বলিল—পড়িত, এখন পড়ে না। এক সময়ে তাহার জন্য একজন শিক্ষক রাখিয়াছিলাম। সে এখন আমার গোরুর রাখালী করে—কারণ সে দেখিয়াছে যে, শিক্ষকের চেয়ে রাখালের বেতন ও সম্মান অনেক বেশি। তবে তুমি যদি রাখালী করিতে চাও, আমি রাখিতে পারি—আমার আর একজন রাখালের আবশ্যক! আর তোমাকে একটা পরামর্শ দিই, গোরুই যদি চরাইবে তবে এমন গোরু চরাও যাহারা দুধ দেয়। দুধ দেয় না এমন মানুষ গোরু চরাইয়া কি লাভ? যাই হোক, তোমার ভালমন্দ তুমি বুঝিবে—তবে বাপু এখানে তোমার জায়গা হইবে না। ইহা শুনিয়া বুঝিতে পারিলাম যে শিক্ষকের জীবনের কি মূল্য। সেখান হইতে সোজা সরাইখানায় ফিরিয়া আসিলাম। এই বলিয়া সে নীরব হইল।

তখন চিকিৎসক তাহার কাহিনী আরম্ভ করিল। সে বলিল—দক্ষিণদিকের পথ দিয়া আমি গ্রামে প্রবেশ করিয়া একটি অট্টালিকা দেখিতে পাইলাম। অনুমানে বুঝিলাম বাড়ীটি কোন ধনীর—কিন্তু বাড়ীর মধ্যে ও আশেপাশে লোকজনের উদ্বিগ্ন চলাচল দেখিয়া কেমন যেন সন্দেহ উপস্থিত হইল। এমন সময়ে এক ব্যক্তি বাহিরে আসিতেছিল তাহাকে শুধাইলাম—মশায়, ব্যাপার কি? এ বাড়ীতে আজ কিসের উদ্বেগ?

সে বলিল—আপনি নিশ্চয় বিদেশী, নতুবা নিশ্চয় জানিতেন। তবে শুনুন, এই বলিয়া সে আরম্ভ করিল—এই বাড়ী গ্রামের জমিদারের। তাহার একমাত্র পুত্র মৃত্যুশয্যায়—এখন শেষ মুহূর্ত সমাগত—যাহাকে সাধারণ ভাষায় বলা হইয়া থাকে যমে মানুষে টানাটানি—তাহাই চলিতেছে। বোধকরি যমেরই জয় হইবে।

আমি বলিলাম—এ রকম ক্ষেত্রে যমেরই প্রায় জয় হইয়া থাকে—তার কারণ চিকিৎসক আসিয়া যোগ দিতেই যমের টান প্রবলতর হইয়া ওঠে; ইহার প্রমাণ দেখিতে পাইবেন যে চিকিৎসক আসিয়া না পৌঁছানো পর্যন্ত রোগী প্রায়ই মরে না। কিন্তু তারপরেই কঠিন।

সে লোকটি বিস্মিত হইয়া কহিল—এ তথ্য আপনি জানিলেন কি করিয়া?

আমি সগর্বে বলিলাম—আমি যে একজন চিকিৎসক।

তখন সে বলিল—আপনার ভাগ্য ভাল, এ গ্রামের চিকিৎসকেরা কেহই রোগীকে নিরাময় করিতে পারে নাই—আপনি গিয়া চেষ্টা করিয়া দেখুন। সফল হইলে প্রচুর ধনরত্ন লাভ করিবেন।

আমি ভাবলাম, সত্যই আমার ভাগ্য ভালো। একবার চেষ্টা করিয়া দেখা যাক। সফল হইলে আর সরাইখানার ভাঙা তক্তপোশে রাত্রি না কাটাইয়া জমিদার বাড়ীতেই আদরে রাত্রি যাপন করিতে পারিব।

তখন আমি ভিতরে গিয়া নিজেকে চিকিৎসক বলিয়া বিজ্ঞাপিত করিয়া রুগী দেখিতে চাহিলাম। আমাকে চিকিৎসক জানিতে পারিয়া জমিদারের নায়েব সসম্ভ্রমে বসিতে দিল। সম্যক্ পরিচয় পাইয়া বলিল—হাঁ, রুগীর অবস্থা খুবই উদ্বেগজনক। তবে আপনি যদি তাহাকে আরোগ্য করিতে পারেন তবে দশ হাজার মুদ্রা ও সরিফপুর পরগণা পাইবেন। আমি উৎফুল্ল লইয়া উঠিলাম। তখন নায়েবের আদেশে একজন ভৃত্য আমাকে ভিতর মহলে লইয়া চলিল। পথে অনেকগুলি ছোট বড় কক্ষ পার হইয়া যাইতে হয়—একটি প্রায়ান্ধকার কক্ষে পাশাপাশি তিন-চারটি লোক কাপড় মুড়ি দিয়া ঘুমাইতেছে দেখিতে পাইলাম। চাকরকে জিজ্ঞাসা করিলাম—ইহারা এমন অসময়ে ঘুমাইতেছে কেন?

চাকরটি বলিল—অসময় তাহাতে সন্দেহ নাই—কিন্তু তাহাদের এ ঘুম আর ভাঙিবে না।

—সে কি? ইহারা কে?

—ইহারা মৃত এবং মৃত চিকিৎসক।

—মরিল কেমন করিয়া?

—চিকিৎসা করিতে গিয়া।

—চিকিৎসায় তো রুগী মরে।

—কখনো কখনো চিকিৎসকও মরে—প্রমাণ সম্মুখেই।

এই সব বাক্য বিনিময়ে আমার চিত্ত উচাটন হইয়া উঠিল। আমি বলিলাম—ব্যাপার কি খুলিয়া বলো।

সে বলিল—বুঝাইবার বিশেষ আবশ্যক আছে কি? হয় তো জীবন দিয়াই আপনাকে বুঝিতে হইবে। জমিদারবাবু বড়ই প্রচণ্ডস্বভাবের লোক। চিকিৎসায়

আরোগ্য করিতে পারিলে তিনি চিকিৎসককে প্রচুর ধনরত্ন দিবেন ইহা যেমন সত্য, তেমনি চিকিৎসক ব্যর্থকাম হইলে তাহাকে মারিয়া ফেলিবেন ইহাও তেমনি সত্য—প্রমাণ তো নিজেই দেখিলেন।

—আগে আমাকে এ কথা বলা হয় নাই কেন?

—তাহা হইলে কি আর আপনি চেষ্টা করিতে অগ্রসর হইতেন?

—কিন্তু চিকিৎসক মারিয়া ফেলার ইতিহাস তো কখনো শুনি নাই।

—জমিদারবাবুর ধারণা আনাড়ি চিকিৎসক যমের দূত। তাহাদের মারিয়া ফেলিলে যমের পক্ষকে দুর্বল করিয়া রুগীর সুবিধা করিয়া দেওয়া হয়। কই আসুন—

আমি ততক্ষণে জানালার শিক ভাঙিয়া, পগার ডিঙাইয়া ছুটিয়াছি—আমাকে ধরিবে কে? যদিচ পিছনে আট-দশটি পাইক পেয়াদা দৌড়াইয়াছে দেখিতে পাইলাম। এক ছুটে সরাইখানায় আসিয়া পৌঁছিয়াছি। এই পর্যন্ত বলিয়া সে থামিল; তারপরে বলিল—আজ আমাকে এই স্যাঁতসেতে মেঝেতেই শুইতে হইবে, তা হোক। আমের কাঠের চেয়ে এই ভেজা মেঝে অনেক ভালো।

এবার সাহিত্যিক্যের পালা। সে বলিল—কি আর বলিব! খুব বাঁচিয়া গিয়াছি—বন্ধু চিকিৎসকের মতো আমিও মৃত্যুর খিড়কি দরজার কাছে গিয়া পড়িয়াছিলাম—নেহাৎ পরমায়ুর জোরেই এ যাত্রা রক্ষা পাইয়াছি।

সকলে উৎসুক হইয়া শুধাইল—ব্যাপার কি খুলিয়া বলুন।

সাহিত্যিক বলিয়া চলিল—পূর্বদিকের পথ দিয়া গ্রামে গিয়া তো প্রবেশ করিলাম। সে দিক্‌টায় রজকপল্লী। রজকপল্লী দেখিলেই আমার রজকিনী রামীকে মনে পড়িয়া যায়, কোন্ সাহিত্যিকের না যায়? রজক কিশোরীদের লক্ষ্য করিতে করিতে চলিয়াছি—হ্যাঁ—চণ্ডীদাস রসিক ছিল বটে, সজোরে পাথরের উপরে কাপড় আছড়াইবার ফলে দুই বাহু ও সংলগ্ন কোন কোন অঙ্গ প্রত্যঙ্গ এমন সুপুষ্ট হইয়া ওঠে যে, অপরের প্রশস্ত নীল শাড়িও তাহা আবৃত করিবার পক্ষে যথেষ্ট নয়। বিশেষ কাপড় আছড়াইবার সময়ে উক্ত প্রত্যঙ্গদ্বয় শরীরের তালে তালে শূন্যে বৃথা মাথা কুটিয়া মরিতে থাকে তাহা দেখিয়া কোন্ পুরুষের মন না ক্ষুব্ধ হইয়া উঠিবে—সাহিত্যিকদের তো কথাই নাই। এমন সময়ে একটি রজক কিশোরী আমাকে দেখিয়া চিৎকার করিয়া উঠিল—ফিরিয়াছে, ফিরিয়াছে।

ফিরিয়াছে? কে ফিরিয়াছে? হ্যাঁ, ফিরিয়াছে বই কি? আমার মধ্যে

দিয়া চিরদিনকার চণ্ডীদাস ফিরিয়া আসিয়াছে, রজকিনী রামীর শীতল পায়ে, বুঝিলাম জগতে দুটি মাত্র প্রাণী আছে—আমি চণ্ডীদাস। আর কিশোরী রজকিনী রামী। দেখিতে দেখিতে আমার চারিদিকে একদল কিশোরী জুটিয়া গেল—জগৎ রামীময়, আর তাহাদের ভাব দেখিয়া মনে হইল জগৎ আমিময়। এ রকম অবস্থায় কবিতা না লিখিয়া উপায় কি?

একজন বলিল—ফিরিয়াছে।

(ফিরিয়াছে বই কি! না ফিরিয়া কি উপায় আছে?)

আর একজন বলিল—অনেকদিন পরে।

(সত্যিই তো! চণ্ডীদাসের পরে আজ কত যুগ গিয়াছে!)

তৃতীয়া বলিল—ঠিক সেই চেহারা, ঠিক সেই হাবভাব।

(এমন তো হইবেই। মানুষ বদলায়, প্রেমিক কবে বদলিয়াছে?)

চতুর্থা বলিল—কেবল যেন একটু রোগা মনে হয়। (ওগো শুধু মনে হওয়া নয়—এযে অনিবার্য বিরহসঞ্জাত-কৃশতা।)

পঞ্চমী কিছু বলিল না—কেবল আমার গায়ে হাত বুলাইয়া দিল।

(ওগো বৈষ্ণব কবি, তুমি প্রশ্ন করিয়াছিলে অঙ্গের পরশে কিবা হয়। আজ আমারও ঠিক সেই প্রশ্ন।)

অপরা বলিল—কিন্তু লেজটা যেন কাটিয়া দিয়াছে?

লেজ? কার লেজ? এবার চণ্ডীদাস-থিওরিতে সন্দেহ জন্মিল।

এবারে আমি প্রথম কথা বলিলাম—আমি প্রেমিক চণ্ডীদাস।

তাহারা সমস্বরে বলিল—হাঁগো হাঁ, তাহার ঐ নামই ছিল বটে!

এই বলিয়া একজন একটা কাপড়ের মোট আনিয়া আমার ঘাড়ে চাপাইয়া দিতে চেষ্টা করিল।

আমি বলিলাম—আমি তো চাকর নই।

তাহারা বলিল—চাকর হইতে যাইবে কেন? তুমি যে গাধা।

আমি গাধা!

বলিলাম—সে কি? আমি যে মানুষের মতো কথা বলিতে পারি।

রসিকা বলিল—অনেক মানুষ গাধার মতো কথা বলে, একটা গাধা না হয় মানুষের মতো কথাই বলিল—আশ্চর্যটা কি?

আমি ব্যস্ত হইয়া বলিলাম—আরে, আরে, আমি যে সাহিত্যিক?

—তবে আর তোমার রাসভত্বে সন্দেহ নাই—কারণ যাহারা মধুর স্বাদ নিজে

গ্রহণ না করিয়া কবিতায় ব্যাখ্যা করিয়া মরে—তাহারা যদি গাধা না তবে গাধা কে?

তখন অপর এক কিশোরী বলিল—ও দিদি, এ যে বশ মানিতে চায় না—কি করি?

কিশোরীর দিদি যুবতী বলিল—প্রেমের ডুরি খানা আন তো?

প্রেমের ডুরি শুনিলেও দেহে রোমাঞ্চ হয়।

দেখিতে পাইলাম একজন মোটা একটি কাছি আনিতেছে।

তবে ওরই নাম প্রেমের ডুরি। ও ডোর ছিঁড়িবার সাধ্য তো আমার হইবেই না—এমন কি পাড়াশুদ্ধ লোকের হইবে না। তখনই ছুট। কিশোরীরা দৌড়ায় বেশ! প্রায় ধরিয়াছিল আর কি? উঃ, পথ বিপথ লক্ষ্য করি নাই—এই দেখুন হাঁটুর কাছে ছড়িয়া গিয়াছে, কাপড়টা ছিঁড়িয়া গিয়াছে! তবু ভালো যে প্রেমের ডুরিতে বদ্ধ হই নাই।

এই বলিয়া সে থামিল; তার পরে বলিল—তবু ভালো যে আজ ভিজা মেজেতে শুইতে পাইব, প্রেমের ডোরে বাঁধা পড়িলে গোয়ালে ঘুমাইতে হইত।

তাহার কাহিনী শেষ হইলে সকলে মিলিয়া সিনেমা স্টারের অভিজ্ঞতা শুনিবার জন্য উদ্‌গ্রীব হইয়া অপেক্ষা করিতে লাগিল।

চতুর্থ পথিক তাহার অভিজ্ঞতা বর্ণনা করিতে সুরু করিল।

বন্ধুগণ, আমি পশ্চিমদিকের পথ দিয়া গ্রামে প্রবেশ করিয়া দেখি একটি পুকুরের ধারে একটি মেলা বসিয়াছে। স্থান কাল পাত্র দেখিয়াই বুঝিতে পারিলাম যে আমার জীবনের মূল্য বিচারের ইহাই যথার্থ স্থান। আমি তখন পুকুরের জলে নামিয়া ডুবিয়া মরিতে চেষ্টা করিলাম। আপনারা ভয় পাইবেন না, সহস্রবার ডুবিয়াও কি করিয়া না মরিতে হয় তাহার কৌশল আমাদের আয়ত্ত। ডুবিয়া মরিবার চেষ্টা অভিনয় মাত্র। আমি সকলকে ডাকিয়া বলিলাম—আমি ডুবিয়া মরিতেছি, তোমরা আমাকে বাঁচাও! আমার আর্ত আহ্বান শুনিয়া সকলে পুকুরের ধারে আসিয়া দাঁড়াইল, কিন্তু কেহ জলে নামিল না।

আমি বলিলাম—আমি ডুবিলাম বলিয়া—শীঘ্র বাঁচাও।

তাহারা বলিল—আগে তোমার পরিচয় দাও তবে জলে নামিব।

আমি বলিলাম—আমি একজন মানুষ। বাঁচাইবার পক্ষে ইহাই কি যথেষ্ট নয়?

তাহারা বলিল—আমরা সবাই তো মানুষ। কেবল আইনে বাধে বলিয়া পরস্পরকে মারিয়া ফেলিতে পারিতেছি না—সদয় বিধাতা আইনের নিষেধ লঙ্ঘন করিয়া তোমাকে যখন মারিবার ব্যবস্থাই করিয়াছেন—তখন তোমাকে আমরা বাঁচাইতে যাইব কেন?

আমি তাহাদিগকে পরীক্ষা করিবার উদ্দেশ্যে বলিলাম—আমি শিক্ষক।

তাহারা এক বাক্যে বলিল—জীবন্মৃত হইয়া বাঁচিয়া থাকিবার চেয়ে তোমার ডুবিয়া মরাই ভালো।

আমি বলিলাম—আমি চিকিৎসক।

তাহারা বলিল—অনেক মারিয়াছ, এবারে মরো।

—আমি সাহিত্যিক।

—ডুবাইতে পারো আর ডুবিতে পারো না?

—আমি সাংবাদিক—শুনিয়া তাহারা ঢেলা মারিল।

—আমি সাধুপুরুষ—শুনিয়া তাহারা হাসিল।

—আমি বৈজ্ঞানিক—শুনিয়া তাহারা সাড়া শব্দ করিল না।

—আমি গায়ক—শুনিয়া কেহ কেহ চঞ্চল হইয়া উঠিল।

আমি খেলোয়াড়—শুনিয়া দু-একজন জলে নামিতে উদ্যত হইল।

—আমি চলচ্চিত্র অভিনেতা।

—তাহারা বুঝিতে পারিল না। তখন বলিলাম—যাহার বাংলা হইতেছে 'সিনেমা স্টার'।

ইহা শুনিবামাত্র মেলার সমস্ত জনতা একসঙ্গে ঝাঁপ দিয়া পড়িল। পুকুরের জল স্ফীত হইয়া উঠিয়া মেলার জিনিসপত্র ভাসাইয়া লইয়া গেল।

সকলেরই মুখে—হায় হায়! গেল গেল! দেশ ডোবে, জাতি ডোবে, সমাজ ডোবে, রাজ্য সাম্রাজ্য সভ্যতা আদর্শ ডোবে তাহাতে ক্ষতি নাই—কেবল সিনেমা স্টার ডুবিলে সমস্ত গেল! হায়, হায়! গেল, গেল!

সকলে মিলিয়া আমাকে টানিয়া তুলিয়া ফেলিল। সকলে অর্থাৎ আবাল বৃদ্ধ নর নারী যুবক যুবতী বালক বালিকা কিশোর এবং কিশোরী।

আমাকে মাটিতে ফেলিয়া দিয়া আমার দেহের অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের মাপ জোক লইতে আরম্ভ করিয়া দিল। পা হইতে মাথা পর্যন্ত—নানাস্থানের মাপ। তারপরে চুলের রং, ঠোটের রং, নখের রং, দাঁতের রং, চোখের রং। এ সব টোকা হইয়া গেলে আমার জীবনেতিহাসের খুঁটিনাটি লইয়া প্রশ্ন সুরু করিল।

আমাকে কিছুতেই ছাড়িতে চাহে না। আগামীকল্য তাহাদের সম্বর্দ্ধনা গ্রহণ করিব এই প্রতিশ্রুতি দিয়া তবে ছাড়া পাইয়া আসিয়াছি।

চতুর্থ পথিকের অভিজ্ঞতা শুনিয়া অপর তিনজনে বুঝিতে পারিল আজ রাত্রে তক্তপোষে শুইবার অধিকার কাহার।

চার বন্ধুতে আহারান্তে শয়ন করিল। সিনেমা স্টার তক্তপোশে শুইল—অপর তিনজনে সেই ভেজা মেঝের উপরে।

তক্তপোশশায়ী সিনেমা স্টারের নিদ্রার তালে তালে যখন নাসিকা গর্জন চলিতেছিল, তখন তিনজনে মশা, মাছি, ছুঁচো, ইঁদুর প্রভৃতি তাড়াইয়া বিনিদ্র-নিদ্রায় রাত্রি কাটাইতেছিল। সারারাত ছুঁচোগুলো চিক্ চিক্ করিয়া ঘরময় দৌড়িয়া বেড়াইল—তিনজনের কানে তাহা বিদ্রূপের ফিক ফিক হাসির মতো বোধ হইল। ঘরের একপ্রান্তে একটা সাপের খোলস পড়িয়া থাকা সত্ত্বেও তাহারা নির্বিঘ্নে রাত্রি অতিবাহিত করিল! কপালে যাহাদের দুঃখ সাপেও তাদের স্পর্শ করে না।

একটি ঠোঁটের ইতিহাস

বিশ্বকর্মা যে-ঘরটাতে বসিয়া মূর্তি তৈয়ারি করেন, সে-ঘরটা সর্বদা তালা চাবি বন্ধ থাকে। যখন তিনি শিল্প কার্য করিতে থাকেন, ভিতর হইতে বন্ধ করিয়া দেন। বাহিরে গেলে শক্ত তালা চাবি আঁটিয়া যান। এমন কি দু'চার দণ্ডের জন্যে বাহির হইলেও তালা চাবি আঁটিতে কখনো ভোলেন না। তাঁহার ছোট ছেলেটিকে বড়ো ভয়। নাবালক ছেলেটা সর্বদা গুল্‌তি তৈরি করিবার জন্যে নরম মাটি খুঁজিয়া বেড়ায়, আর পিতার শিল্প শালার মতো এমন তৈরি কাদার তাল আর কোথায় সুলভ। কিন্তু বিশ্বকর্মার বয়স হইয়াছে। একদিন ঘর বন্ধ না করিয়া বাহিরে গিয়াছিলেন, ঠিক সেই অবসরে ছোট ছেলেটা ঘরে ঢুকিয়া পড়িল। একটা সম্পূর্ণপ্রায় মূর্তি পড়িয়াছিল ; গুল্‌তির মাটির লোভে সে তার ঠোঁঠে যেমনি হাত দিয়াছে, অমনি বিশ্বকর্মার আওয়াজ কাণে গেল,—'ঘরে কে রে ? নন্তু বুঝি, দাঁড়া আসছি !' গুল্‌তি সংগ্রহ আর হইল না, নন্তু এক দৌড়ে পালাইল। বিশ্বকর্মা ঘরে ঢুকিয়া দেখিলেন সব ঠিক আছে। নন্তুর হাতের চাপে মূর্তির নীচের ঠোঁট-টা যে একটু বাঁকিয়া গিয়াছে—তাহা আর বুড়া বিশ্বকর্মার ক্ষীণ দৃষ্টিতে পড়িল না। তারপরে যথাসময়ে সেই মূর্তি জেলা মেদিনীপুরের গোবিন্দ মণ্ডলের ঘরে আকাট মণ্ডল রূপে ভূমিষ্ট হইল। এই গল্প সেই আকাট মণ্ডলের কাহিনী কিংবা আরও বিশিষ্টভাবে বলিতে গেলে বিশ্বকর্মার অসাবধানতায় এবং নন্তুর গুল্‌তির লোভে তাহার ঠোঁট যে ঈষৎ বাঁকিয়া গিয়াছিল—ইহা তারই ইতিহাস। একটি তরল মতি বালকের জন্যে সারা জীবন একটা মানুষকে কত দুর্ভোগ সহ্য করিতে হইয়াছিল—তাহা শুনিলে পাঠক মাত্রেই বুঝিতে পারিবেন, অপরাধ করিলেন বিশ্বকর্মা আর ফল ভোগ করিল নির্দোষ আকাট মণ্ডল। নন্তুকে দোষ দিয়া লাভ নাই—সে বালকমাত্র—ফলাফল বিচার তাহার স্বভাব নয়।

আকাট মণ্ডলের জন্মের কিছুক্ষণের মধ্যেই তাহার জননীর মৃত্যু হইল। রাগে দুঃখে গোবিন্দ মণ্ডল ঘর হইতে বাহিরে যাইবার সময়ে সদ্যোজাত শিশুর দিকে তাহার দৃষ্টি পড়িল। গোবিন্দ মণ্ডল বলিয়া উঠিল—'দখনা, বেটা মাকে মেরে ফেলেছে, আবার হাসছে !' সত্য সত্যই আকাটের দন্তহীন শিশু মুখে একটা হাসির আভা লাগিয়া ছিল। পার্শ্ববর্তীরা তাকাইয়া দেখিল এবং বিস্মিত হইল। সকলেই মনে মনে বুঝিল—এ ছেলে অপয়া।

বিচক্ষণ পাঠক অবশ্যই বুঝিতে পারিয়াছেন যে হাসিটি শিশুর স্বেচ্ছাকৃত নয়।

ওই যে নস্তর হাতে তাহার নীচের ঠোঁটে একটু চাপ লাগিয়াছিল, তার ফলে ঠোঁট-টা এমন ভাবে বাঁকিয়া গিয়াছে—যাহাতে বিদ্রূপ-সঞ্জাত একটা হাসির ছাপ ওখানে অঙ্কিত হইয়া গিয়াছে। এ হাসি যেমন তাহার স্বেচ্ছাকৃত নয়, তেমনি তাহা দূর করিবার শক্তিও তাহার নাই, বস্তুতঃ ওটা হাসিই নয়। কিন্তু সংসারের সকল মানুষতো আর আমার পাঠকের মতো বিচক্ষণ নয়, তাহারা এত তলাইয়া বুঝিতে চায় না ; সে শক্তি, সে ইচ্ছা তাহাদের নাই। তাহারা ওটাকে হাসি বলিয়াই মনে করিতে লাগিল—এবং তাহাদের ভুল বোঝার ফলাফল ভোগ করিতে করিতে আকাট মণ্ডল জীবন যাপন করিতে সুরু করিল।

গোবিন্দ মণ্ডল আকাটকে বেশিদিন বাড়ীতে রাখিল না। দ্বিতীয়বার বিবাহ করিবার কয়েকদিন আগে তাহাকে মাতুলালয়ে পাঠাইয়া দিল। আর আনিল না। মাতুলরা ধার্মিক, ধর্মের পুরস্কারস্বরূপ আকাটকে লাভ করিল। তাহাদের অনেকগুলি গোরু ছিল, রাখাল ছিল না, আকাট রাখালের কাজ করিতে লাগিল।

কিন্তু এমন করিয়া তো চলে না। পাড়ার লোকেরা নিতান্ত অধার্মিক—ভাগ্নেকে দিয়া রাখালের কাজ করানো তাহাদের ভাল লাগিল না ; তাহারা বলাবলি করিতে লাগিল। কাজেই ধার্মিক মাতুলগণ তাহাকে পাঠশালায় ভর্তি করিয়া দিল—বলিল, দেখো, ভাগ্নে ও ছেলের মধ্যে আমরা কোন ভেদ করি না। কিন্তু তাহার গোচারণের খ্যাতি গুরুমহাশয়ের কানে উঠিয়াছিল, তিনি আকাটকে বলিলেন—ওরে তুই মাঠে গিয়ে আমার গরুগুলো দেখ্। ওতেই হবে বাবা, গুরুর আশীর্বাদে ওতেই তোর বিদ্যা হবে। অতএব আকাট পুনরায় মাঠে গেল। পড়িবার সময়ে সে গোরু চরায়, এমনি করিয়া কয়েক বছর গোরু চরাইবার পরে গোরুর চড়া দাম দেখিয়া গুরুমহাশয় গোরুগুলি বেচিয়া দিলেন। তখন আর আকাটের প্রয়োজন নাই দেখিয়া গুরুমহাশয় মাতুলদের বলিলেন আকাটের পড়া শেষ হইয়াছে। মাতুলরা তাহাকে পাশের গ্রামের হাইস্কুলে ভর্তি করিয়া দিল।

সেই স্কুলে গিয়া প্রথম দিনেই তাহার বাকা ঠোঁট তাহাকে বিপদে ফেলিল। পণ্ডিতমহাশয় ক্লাসে ঢুকিয়াই তাহার দিকে তাকাইয়া বলিলেন—কিরে বড়ো যে হাসছিস্। সে বলিল—কই পণ্ডিতমশাই, হাসছি কই? তবে রে বেটা মিথ্যাবাদী। এই বলিয়া পণ্ডিতমহাশয় ঝুটি ধরিয়া তাহাকে প্রহার করিয়া

তাড়াইয়া দিলেন। যাইবার সময়ে বলিলেন—তোর কিছু হবে না, বেটা আকাট মুখ্যু। সেই হইতে পিতৃদত্ত নামটার পরিবর্তে গুরুদত্ত ওই বিশেষণটা তাহার গায়ে আটকাইয়া গেল। লোকে তাহাকে আকাট বলিয়াই ডাকিতে ডাকিতে ক্রমে মৌলিক নামটা ভুলিয়াই গেল। আমরাও তাহাকে ওই নামেই উল্লেখ করিয়া আসিতেছি।

এই ঘটনার পর হইতে তাহার উপরে পণ্ডিতমহাশয়ের কেমন যেন জাত-ক্রোধ হইয়া গেল। তিনি ক্লাসে ঢুকিয়াই তাহাকে লক্ষ্য করিয়া বলিতেন—'কিরে হাসছিস্ যে বড়ো।' আকাট বলিত—'কই হাসলাম পণ্ডিতমশাই!' পণ্ডিতমশাই ছাত্রদের সম্বোধন করিয়া বলিতেন—দেখ তোরা ও হাস্‌ছে কিনা। সহপাঠীগণ তাহার দিকে তাকাইয়া দেখিত আকাটের মুখে হাসিই বটে। একদিন ব্যাপারটা লইয়া একটু বাড়াবাড়ি হইয়া গেল। ফলে পণ্ডিতমহাশয় তাহাকে খুব এক চোট মারিলেন। আকাট কাঁদিতে লাগিল। তখন তিনি ছাত্রদের ডাকিয়া বলিলেন, দেখেছিস বেটার বজ্জাতি। চোখে জল কিন্তু মুখের হাসিটি যায়নি—এমন শয়তানকে ইস্কুলে রাখবো না। যা দূর হয়ে যা। আকাট সেদিনের মত ইস্কুল ত্যাগ করিল এবং পরেও আর ইস্কুলে গেল না। তাহার পড়াশোনা ওইখানেই শেষ হইল।

অতঃপর আকাট চাকুরির সন্ধানে কলিকাতায় আসিল। একটি সাহেবী অফিসে চাকুরি পাইল। Lift-এর দরজা খোলা ও বন্ধ করা তাহার কাজ। সারাদিন এক জায়গায় দাঁড়াইয়া থাকিয়া সে lift-এর দরজা খুলিয়া দেয়; আবার লোক উঠিলে দরজা বন্ধ করিয়া দেয়; lift হুস করিয়া পাতালপুরীতে নামিয়া যায়। এই ভাবে তাহার কাল যায়—হঠাৎ তাহার একদিন সৌভাগ্যোদয় হইল। একদিন lift হইতে বাহির হইয়া তাহার দিকে বড়ো সাহাবের চোখ পড়িল। তিনি বলিয়া উঠিলেন I like such a smiling face' এরকম Smiling face নাকি ইণ্ডিয়াতে সদাসর্বদা চোখে পড়ে না। বড়ো সাহেব তাহাকে তাঁহার খাস খানসামার কাজ দিলেন। মাহিনাও অবশ্য বাড়িল। আকাট ভাবিল বিধাতা এতদিনে প্রসন্ন হইয়াছেন কিম্বা বিধাতা বরাবরই প্রসন্ন কেবল মানুষের অন্যায় অত্যাচারের জন্যই তাহার যত কষ্ট। সে বিধাতাকে মনে মনে ধন্যবাদ দিয়া মানুষকে মনে মনে বাপান্ত করিয়া, নূতন কোট ও চাপরাশ পরিয়া বড়ো সাহেবের দরজায় দাঁড়াইয়া রহিল। কিন্তু বেশিদিন দাঁড়াইয়া রহিতে হইল না। সেদিন বড়ো সাহেব তাহার মেমের সঙ্গে ঝগড়া করিয়া আফিসে আসিতেছিলেন

দরজার কাছে আকাটকে দেখিয়া গর্জিয়া উঠিলেন—Grinning Idiot ! এবং গর্জনের পিছনে শিলাবর্ষণের মতো একটি প্রচণ্ড ঘুষি তাহার নাকে আসিয়া পড়িল।

এখন সাহেবী অফিসের একটি সুনিয়ম এই যে এরকম চড় ঘুষিটা খাইলে অন্যত্র তাহার ঔষধ সন্ধান করিতে হয় না। সরকারী খরচে ডাক্তার ও ঔষধের ব্যবস্থা হয়। অল্পক্ষণের মধ্যেই অফিসের ডাক্তার আকাটের নাকে একটি পটি বাঁধিয়া দিল। দেশী আফিসে এমন বিধান শৃঙ্খলা নাই। সেখানে চড়-চাপড় খাইলে নিজের খরচে ঔষধ সংগ্রহ করিতে হয়।

পটি বাঁধা নাক, আকাট অসুখের বাবদ তিনদিন ছুটি পাইল। সে বাসায় ফিরিয়া ভাবিতে লাগিল, কেন এমন হইল ? বিধাতাপুরুষ তো অবিবেচক নহেন, সাহেবও সদয়, তবে তাহার নাকটা বদ্ধপটি হইল কেন ? এমন সময়ে নাকে ঔষধ লাগাইবার প্রয়োজন হইলে সে ঔষধের তুলি লইয়া আয়নার সম্মুখে আসিয়া দাঁড়াইল। আয়নার ভিতরে হাসিতেছে কে ? সে চমকিয়া উঠিল ! তার নিজেরই তো ঠোঁট বটে ! এদিকে নাকটা জ্বলিয়া যাইতেছে ; ঠোঁটের হাসি সেই জ্বলুনিকে যেন চতুর্গুণ বাড়াইয়া দিল। আর একটু হলেই সে নিজের গালে এক চড় বসাইয়া দিয়াছিল আর কি ! সে রাগে দুঃখে আয়নার সুমুখ হইতে সরিয়া আসিল। সরিয়া আসিল বটে কিন্তু সেই বিদ্রূপের হাসিটা মন হইতে কিছুতেই সরিল না। সে নিজেকে ধিক্কার দিতে আরম্ভ করিল—এবং প্রতিদিনের স্তূপীকৃত ধিক্কার জমিয়া উঠিয়া এমন একটা দুর্লঙ্ঘ্য বাধার সৃষ্টি করিল যাহার আড়ালে ওই হাসিটা প্রচ্ছন্ন হওয়া দূরে থাকুক, তাহার ঊর্ধোৎক্ষিপ্ত শিখরে তুষারের শুভ্রতায় সেই বিদ্রূপের হাসির নির্জীব ছটা অনির্বাণ হইয়া জ্বলিতে লাগিল। এতদিন তাহার হাসি দেখিয়া অপরে রাগিত, এবার তাহার নিজের রাগিবার পালা, নিজের উপরে। সারাদিন ওই হাসি ! আবার ঘুমের মধ্যেও ওই হাসিটা নিঃশব্দ বিভীষিকা সঞ্চার করিয়া তাহার স্বপ্নকে পীড়িত করিতে থাকে। স্বপ্ন ও জাগরণের ভীতির সাঁড়াশি আক্রমণে আকাট পাগল হইয়া যাইবার মতো হইল।

কিন্তু সে পাগল হইল না। তার কারণ সংসারে পাগলামির একমাত্র ধন্বন্তরি ঔষধ সে পান করিয়া বসিল। আকাট বিবাহ করিল। বিবাহের পরে কিছুকাল ভালই চলিল। বিবাহের পরে কিছুকাল ভালই চলে। তখন তো স্বামী-স্ত্রী পরস্পরের বাস্তবরূপ দেখে না, পরস্পরের স্বপ্ন দেখে। যতদিন স্বপ্ন

চলে, কোন বালাই থাকে না, কারণ স্বপ্ন চালনায় কোন খরচ নাই। কিন্তু ক্রমে স্বপ্ন কাটিয়া আসিতে থাকে, আর বাস্তবরূপ ধীরে ধীরে চোখে পড়িতে আরম্ভ করে।

এতদিন আকাট তাহার পত্নীর স্বপ্ন দেখিতেছিল, সেদিন মোক্ষদাসুন্দরীকে চোখে পড়িল। মোক্ষদাসুন্দরী তাহার স্ত্রীর নাম বটে। মোক্ষদাকে চোখে পড়িবার সঙ্গে সঙ্গে আকাট দেখিল তাহার একটা নাক আছে, আর নাকে আছে একটা মস্ত নথ।

ওদিকে মোক্ষদারও চোখে পড়িল—তাহার স্বামীর ঠোঁটে একটা বিদ্রূপের হাসি। মোক্ষদা ভাবিল ওই হাসিটা নিশ্চয় তাহার নথটা লক্ষ্য করিয়া। কারণ অনেক স্থানেই তাহার নথটা হাসি আকর্ষণ করিয়াছে। কিন্তু সে কখনো ভাবিতে পারে নাই তাহার স্বামীও এটা লইয়া বিদ্রূপ করিবে।

সে ঝঙ্কার দিয়া বলিল—বড় যে হাসছ! একটা দিতে তো পারো না।

স্বামী বলিল—হাসলাম আবার কই?

স্ত্রী বলিল—আমি যেন কিছু বুঝি না। বয়স কত অনুমান করো!

এখন মোক্ষদার বয়স লইয়া একটু গোলমাল ছিল। তাহার বয়স পিতৃপক্ষ কম বলিয়া চালাইয়া দিয়াছিল। এটা এমন নূতন কিছু নহে। পুরুষের বয়স চাকুরীর খাতায় কম করিয়া লিখানো হয় আর মেয়েদের বয়স বিবাহের বেলায়।

স্বামী-স্ত্রীতে এই ঝগড়া সুরু হইয়া গেল। কোন স্বামী-স্ত্রীতে না ঝগড়া হয়। এখনকার দিনে যমুনা পার হইয়া মথুরায় গিয়া বিরহ যাপনের সুবিধা নাই। দাম্পত্য ক্রোধের কুটিলা গতিই এখন যমুনার কাজ করে। কাজ করিবার ফলে উভয়ে কিছুদিন (কয়েক ঘণ্টাও হইতে পারে) মাথুর পালা উদ্‌যাপন করে—তারপরে আবার ভাব-সম্মিলন।

কিন্তু সাধারণ স্ত্রীর তুলনায় মোক্ষদাসুন্দরী কিছু বেশি অভিমানী, বিশেষ তার দুর্বল স্থান ওই নথটা। নথটা নাকি তাহার পরলোকগতা মাতার সম্পত্তি, তাই বিশেষ যত্নে সে নাকে ধারণ করিত, অবশ্য পাকা সোনার তৈরী—সেটাও অন্যতম কারণ।

একদিন গভীর রাত্রে মোক্ষদা ঘুম ভাঙিয়া দেখিল তাহার স্বামীর ঠোঁটে সেই বিদ্রূপের হাসি। ভাবিল স্বামী নিদ্রিতা পত্নীর নাকে নথটা দেখিয়া হাসিতেছিল—এখন ঘুমের ভান করিতেছে। আকাট সত্যই ঘুমাইতেছিল—হাসিটা তাহার

স্বাভাবিক—অর্থাৎ অস্বাভাবিক। স্ত্রী তাহাকে ডাকিয়া জাগাইল। বলিল—ঘুমিয়েও কি একটু শান্তি পাবো না ?

আকাট বলিল—অশান্তি কি ? ঘুমোও না।—ঘুমোও না !

তোমার কি হচ্ছিল ?

আকাট বলিল—ঘুম !

—বটে ! আর মিথ্যে বল্‌তে হবে না। আমি সব বুঝি !

সে যে কি বোঝে তাহা স্পষ্ট করিয়া বলিল না বটে, কিন্তু পরদিনই সে বাপেরবাড়ী চলিয়া গেল। যাইবার সময়ে শ্বশুরবাড়ীর যাবতীয় অস্থাবর লইয়া গেল। কেবল স্থাবর বলিয়া বাড়ীটি লইতে পারিল না।

আকাট বুঝিল যে তাহার দাম্পত্য-জীবন শেষ হইল। ওই বিদ্রূপের হাসিটাই ইহার মূল। তখন সে লোটা কম্বল লইয়া, গেরুয়া পরিয়া সংসার ত্যাগ করিয়া সন্ন্যাসী সাজিয়া সংসার ছাড়িল।

আকাট শুনিয়াছিল সন্ন্যাসীরা বনে যায় কিন্তু বন যে ঠিক কোথায় তাহা সে জানিত না। বাংলা দেশের লোকে সুন্দরবনের নাম জানে বটে, কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে রয়াল বেঙ্গল টাইগারের নামটাও জানে। সন্ন্যাসীর প্রতি বাঘের আচরণ কি রকম সে পরীক্ষা করিবার ইচ্ছা আকাটের হইল না। কাজেই সে হাওড়া স্টেশনে গিয়া বিন্ধ্যাচলের একখানা টিকিট করিয়া গাড়ীতে উঠিয়া বসিল।

গাড়ীখানা তৃতীয় শ্রেণীর। তার একান্তে দুইজন সাহেবী পোষাক পরিহিত যুবক সিগারেট টানিতে টানিতে ইহলোক, পরলোক, সন্ন্যাস, সংসার আশক্তি, 'ত্বয়া, হৃষীকেশ', 'মাফলেষু,' ইত্যাদি গভীর বিষয়ে আলোচনা করিতেছিল। এসব আলোচনার অধিকার তাহাদের আছে, কারণ তাহারা জীবন-বীমার দালাল। এখনি বর্ধমানে নামিয়া জীবন-বীমার শিকার সন্ধান সুরু করিবে।

যুবকদের মধ্যে কে বলিল—ভোগের দ্বারাও ত্যাগের ভূমিকা সৃষ্টি করতে হয়। ভোগ না করিলে ত্যাগ করা যায় না।

'খ' বলিল—ত্যাগই যদি করতে হয় তবে আবার ভোগের উৎপাত সৃষ্টি কেন ?

'ক' বলিল—মেঘ না হলে কি বৃষ্টি সম্ভব ? মেঘটা সঞ্চয়—বৃষ্টি ত্যাগ !

'খ' বলিল—আমাদের দেশে কত সাধু-সন্ন্যাসী আছেন—সবাই কি ভোগী ছিলেন ?

'ক' বলিল—যে-সব সাধু-সন্ন্যাসী এক সময়ে ভোগী ছিলেন—তাঁরাই ত্যাগে শান্তি পেয়েছেন। যাঁরা ভোগের বস্তুর অভাবে সংসার ত্যাগ করেছেন তাঁদের cynic বলা যেতে পারে।

এমন সময়ে 'ক'-র দৃষ্টি আকাটের দিকে পড়িল—এবং তাহার ঠোঁটের বিদ্রূপের হাসিটি সে দেখিতে পাইল।

তখন সে 'খ'কে ডাকিয়া বলিল—ওই দেখ এক গেরুয়াধারী। কিন্তু ওর ঠোঁটের বিদ্রূপের হাসিটা লক্ষ্য করেছ? ওর ভোগের মূল ক্ষয় হয়নি। ভোগের ইচ্ছা ওর ষোল আনা আছে, কিন্তু সংসার ওর সম্বন্ধে কৃপণ। ওই হাসি দিয়ে সে সংসারকে ধিক্কার দিচ্ছে।

'খ' সমস্তই দেখিল। এমন চাক্ষুষ প্রমাণের পরে আর তর্ক চলে না। তাই সে একটি সিগারেট ধরাইল।

আকাট দেখিল সে আবার ধরা পড়িয়া গিয়াছে। বিন্ধ্যাচল যাওয়া তার আর হইল না। সে 'থানা জংশনে' নামিয়া পড়িল। স্টেশনের পাশে এক বটগাছতলায় সে আস্তানা পাতিল। কিন্তু গেরুয়া একেবারে ব্যর্থ হইবার নয়। সন্ন্যাসী দেখিয়া ধীরে ধীরে তাহার শিষ্য জুটিতে সুরু করিল। তাহার শিষ্যরাও সেই হাসিটি লক্ষ্য করিল—তাহারা গুরুর নাম দিল 'হাসিয়া বাবা'।

সারা জীবন সে হাসির কুফল ভোগ করিয়া আসিয়াছে—এইবারে হাসির সুফল ভোগ করিবার তাহার পালা। শুধু সুফল নয় সঙ্গে প্রচুর পরিমাণে ঘৃত, দুগ্ধ, দধি, সন্দেশও ছিল। বিধাতাপুরুষকে একেবারে নির্দয় বলা যায় না—ওই অনিচ্ছাকৃত হাসিটি যদি তিনি দিয়া থাকেন, তবে তাহার বাবদ এবার অমৃত-বণ্টনও তিনিই করিলেন। সুখে দুঃখে, শীতে গ্রীষ্মে, দিনে রাত্রে তাহার মুখে হাসি লাগিয়া আছে—ইহাই হইল তাহার সব চেয়ে বড় মাহাত্ম্য। হাজার হাজার বছরের দুঃখে কষ্টে যে দেশের লোক হাসিতে ভুলিয়া গিয়াছে—তাহারা ওই হাসির ছটায় আধ্যাত্মিক স্বর্গের চরম দীপ্তি দেখিতে পাইল। এবং তাহার ফল স্বরূপ আকাটের বৃক্ষতলাশ্রিত আস্তানা অচিরকালের মধ্যে সুবৃহৎ মন্দিরে পরিণত হইল। ইহাতে বিধাতাপুরুষ বিস্মিত হইলেন কিনা জানি না, তবে আকাট হইল। কিন্তু অনেক ঠেকিয়া তাহার শিক্ষা হইয়া গিয়াছিল—তাই সে কিছু প্রকাশ না করিয়া গম্ভীর হইয়া চাপিয়া বসিয়া রহিল। এইভাবে দীর্ঘকাল 'থানা জংশনে' সে কাটাইল। তাহার নাম ও খ্যাতি দেশের সর্বত্র ছড়াইয়া

পড়িয়াছিল—কাজেই বহু লোকের মোহ মুক্তির দলস্বরূপ বহুতর ভূসম্পত্তি ও অস্থাবর সঞ্চয় করিয়া অবশেষে একদিন 'হাসিয়া বাবা' দেহরক্ষা করিল।

এইরূপে আকাট মণ্ডলের জীবন শেষ হইল। কিন্তু একেবারে শেষ হইল না। শিষ্যরা গুরুর দেহ সমাধিস্থ করিয়া তাহার উপরে প্রকাণ্ড এক মঠ তৈয়ারী করিয়া দিল—তাহার নাম দিল 'হাসিয়া বাবার মঠ।'

হাসিয়া বাবা স্বর্গে গেল। নন্তুর বালকসুলভ অনবধানতায় সারা জীবন যে দুর্ভোগে ভুগিয়াছে—তাহাই সে বিধাতার কাছে নালিশ করিল। বিধাতা নথীপত্র দেখিয়া ন্যায়বিচার করিলেন। আকাটের পুণ্যফল নন্তুর হিসাবে জমা করিয়া দিলেন—কারণ নন্তু-ই তাহার পুণ্যের কারণ। আর আকাটের মাটির পিণ্ডটাকে চটকাইয়া শিল্প শাখার একান্তে ফেলিয়া রাখিলেন—নূতন মূর্তি তৈরি করিবার উদ্দেশ্যে! ইহার পরেও কে বলিবে যে বিধাতাপুরুষ নিরপেক্ষ নহেন।

শকুন্তলা

অতীশ ও মালতী এইমাত্র হিন্দু বিবাহপদ্ধতি অনুসারে বিবাহ-পর্ব সমাধা করিয়া বাসর-ঘরে আসীন হইয়াছে। বন্ধুরা ফুলের মালা, ফুলের তোড়া দিয়া তাহাদিগকে অভ্যর্থনা করিল। অতীশ হাসিতেছে, মালতী নতমুখী। এইখানে আমাদের গল্পের শেষ, আরম্ভটা অনেক আগে—আর অন্যত্রও বটে। বঙ্গোপসাগরে আসিয়া যে-জলধারার সমাপ্তি, তাহার সূত্রপাত হিমালয়ের দুর্গম শিখর-মালার অরণ্যে। আমাদের এবার সেই তুষারিক নির্জনতায় ফিরিয়া যাইতে হইবে।

সাঁওতাল পরগণার পরিজ্ঞাত সহরগুলি রুগ্ন স্বাস্থ্যান্বেষীদের নিশ্বাসবিষে কলুষিতপ্রায় হইয়া উঠিলেও, এখনও অম্লানবায়ু স্থানের সেখানে অভাব নাই। এই স্থানগুলি রেলস্টেশনের পরিধির মধ্যে পড়ে না—তাই জনসমাগম নাই বলিলেই হয়। বিশুদ্ধ বাতাহারী বায়ুগ্রস্তদের কেহ কেহ দু'চারখানা বাড়ী-ঘর তৈয়ারি করিয়াছে এইমাত্র। বায়ু এখানে নিষ্কলুষ হইলেও শুধু বায়ুতে মানুষের জীবন চলে না। দূরবর্ত্তী সহর হইতে প্রাণধারণের অন্য সব সামগ্রী সংগ্রহ করিতে হয় বলিয়া নিতান্ত বাতাশ্রয়ী ব্যক্তি ছাড়া কেহ এখানে ইচ্ছা-সুখে বড় আসে না। অতীশ সেই বায়ুমার্গীয় লোকেদের অন্যতম। সে তাহার পরিচিত এক ব্যক্তির বাড়ীতে আসিয়া আশ্রয় লইয়াছে। স্থানটির নাম জোড়া-মউ।

বন্ধুরা শুধায়—মানচিত্রে এত স্থান থাকিতে এমন তেপান্তরের মাঠে কেন?

অতীশ বলে—কলিকাতার বহুজনীয়তার প্রতিষেধক এই স্বল্পজনীয় তেপান্তরের মাঠ।

বন্ধুরা আবার বলে—তবে তেপান্তরের উপমাটা পূর্ণাঙ্গ করিয়া তোল না কেন? রাজকন্যা কি জুটিল?

অতীশ হাসিয়া বলে—এখনও জোটে নাই বটে, তবে জুটিতে কতক্ষণ?

এপারের উচ্চ ভূখণ্ডে জোড়া-মউ। ওপারের উচ্চতর ভূখণ্ডে মদন-কোঠা, মাঝখানে স্ফটিক জলের জয়ন্তী নদী। নদীর ধারে অনেকটা স্থান জুড়িয়া শাল, হর্ত্তুকি, মহুয়ার বন।

অতীশ নিত্যকার মতো প্রাতর্ভ্রমণে বাহির হইয়াছে। শরৎ কালের মাঝামাঝি। বৃষ্টি-বাদল কাটিয়া গিয়াছে—অথচ শীতের প্রভাব এখনো পড়ে নাই—ঘাসের ডগায় ডগায় শিশিরবিন্দু ঝলমল-করা সকাল বেলা; দিগন্তে কুয়াশার ছোপ লাগিয়াছে—অথচ আকাশের নির্মল নীলে স্বচ্ছতম মেঘের

অন্যতম চিহ্নও নাই! নিখিল প্রকৃতি সদ্য-খনিত কুমারী সরসীর মতো কূলে কূলে পূর্ণ—এখনও তাহাতে প্রথম কলসটিও ডুবানো হয় নাই। অতীশ এই পূর্ণতার মধ্যে নিজেকে প্রতিদিন প্রভাতে একবার নিমজ্জিত করিয়া লয়।

এমন সময়ে সে চমকিয়া উঠিল—কে যেন খিল-খিল করিয়া হাসিতেছে? এখানে এই নির্জনতায় হাসিতেছে কে? না গৃহকার্য্যে নিরত দিগ্বালার হাতের রেশমী চুড়ি নাড়া খাইয়া বাজিয়া উঠিল? অতীশ উৎকর্ণ হইয়া রহিল। ক্রমে তাহার কাণে মানবকণ্ঠ—মানবী-কণ্ঠ বলিলেই যথোচিত হয়, প্রবেশ করিল।

একটি কণ্ঠ বলিল—ভাই, আমার গায়ের চাদরখানা একটু জড়িয়ে দাও না।

অপর কণ্ঠ বলিল—মালতী দি, তোমার চাদরখানা না হয় খুলেই রাখো।

অতীশ বুঝিল কণ্ঠাধিকারিণীদের অন্যতমার নাম মালতী। কিন্তু কোথায় তাহারা? সে আর একটু অগ্রসর হইতেই রহস্য ভেদ হইল। বন্ধুর তরঙ্গায়িত ভূমির দুই তরঙ্গের মধ্যস্থিত উপত্যকায়, নদীর তীরে, শাল-মহুয়া বনের পাশে কয়েকটি মেয়ে চড়িভাতির আয়োজনে ব্যস্ত। অতীশ উচ্চভূমি হইতে তাহাদের দেখিল—তাহারা নীচু হইতে তাহাকে দেখিতে পাইল না। অতীশ ভাবিল—এযে মহুয়া বনের শকুন্তলা। যদিচ নদীটার নাম মালিনী নয়—তবু সখীচারিণী শকুন্তলার সঙ্গে ইহাদের তেমন প্রভেদ নাই। সে এমন একস্থানে বসিল, যাহাতে তাহাদের দেখিতে পাওয়া যায়—অথচ তাহারা অতীশকে দেখিতে না পায়।

একটি নারী-কণ্ঠ বলিল—ভাই এ যে তেপান্তরের মাঠ, তার উপরে কাছেই বন, হঠাৎ একটা বুনো ভালুক এসে পড়লে কে রক্ষা করবে?

অপর কণ্ঠ তাহার উত্তরে বলিল—তেপান্তরের মাঠ হ'লে তেপান্তরের রাজপুত্রও নিশ্চয় আছেন—রক্ষা করবার ভার তাঁরই উপরে—'কেন না রাজারাই আশ্রমের রক্ষক।'

অতীশ বুঝিল ইহাদের পরিচয় যাহাই হোক, শকুন্তলা নাটকখানা ইহারা ভালো করিয়াই পড়িয়াছেন। মেয়েগুলি শিক্ষিতা। অতীশ বসিয়া রহিল—দেখা যাক, নাটক আর কত দূর গড়ায়।

এমন সময় নারী-কণ্ঠসমূহ ভীত কোলাহল করিয়া উঠিল। অতীশ ভাবিল এতগুলি কণ্ঠ আসিল কোথা হইতে? মেয়ে তো ছিল গুটিতিনেক। কণ্ঠস্বর শুনিয়া মেয়েদের কণ্ঠসংখ্যা নির্ধারণ করা সম্ভব নহে।

কোন কণ্ঠ বলিল—ভালুক।

কেহ বলিল—বাঘ।

কেহ বলিল—বুনো শূওর।

সকলেই বলিল—কে আছগো—বাঁচাও।

অতীশ তাড়াতাড়ি উঠিয়া পড়িল—ব্যাপার কি? সমস্ত দেখিয়া শুনিয়া সে হাসিবে কি কাঁদিবে ভাবিয়া পাইল না। সাঁওতালদের গোটা কয়েক পোষা শূওর মেয়েদের দিকে আসিতেছিল—মেয়েদের কোলাহলে ভীত হইয়া এক্ষণে পলাইতেছে—বাঘও নয়, ভালুকও নয়, তবে শূওর বটে, কিন্তু বন্য নয়।

মেয়েদের কোলাহল তবু থামে না। তখন অতীশের মনে হইল—একবার অগ্রসর হইয়া গিয়া তাহাদের অভয় দেওয়া উচিত।

সে চীৎকার করিয়া উঠিল—ভয় নাই আমি আছি—এবং তখনই নীচের দিকে ছুটিয়া চলিল।

নিকটেই রক্ষককে দেখিয়া মেয়েদের সাহস ফিরিয়া আসিল। তাহারা বলিল—আমরা একটু ঠাট্টা করছিলাম—ভয় পাবো কেন?

কিন্তু তাহাদের কম্পমান শরীর ও ভূলুণ্ঠিত চাদর অন্যরূপ সাক্ষ্য দিতেছিল।

অতীশ পুনরায় বলিল—ভয় নাই, আমি আছি।

রাজা। ভয় নাই, ভয় নাই......

শকুন্তলা। আঃ, এই দুষ্ট মধুকর এখনও নিবৃত্ত হইতেছে না, আমি এখান হইতে অন্যত্র যাই।

রাজা। দুর্বিনীতের শাসনকর্তা পুরুবংশীয় রাজার শাসনকালে সরলহৃদয়া তাপসবালাদিগের প্রতি এইরূপ অসদ্ব্যবহার করে, এমন সাধ্য কাহার?

অনসূয়া। আর্য! কোনরূপ বিপদ ঘটে নাই। আমাদের এই প্রিয়সখী মধুকর কর্তৃক আকুল হইয়া কাতর হইয়াছেন।

রাজা। অয়ি, আপনার তপস্যা বৃদ্ধি পাইতেছে তো?

অনসূয়া। এখন বিশিষ্ট অতিথি লাভে তপস্যা বর্ধিত হইল। শকুন্তলে! তুমি শীঘ্র কুটীর হইতে ফল ও অর্ঘপাত্র আনো এই ঘটের জল পাদোদক হইবে।

রাজা। আপনাদের মিষ্ট সম্ভাষণেই আমার আতিথ্য হইয়াছে।

প্রিয়ম্বদা। তবে এই ছায়া-শীতল সপ্তপর্ণ-বেদিকায় মুহূর্তকাল উপবেশন করিয়া পরিশ্রান্তি দূর করুন।

রাজা। তোমরাও এই জল-সেচন কর্মে নিযুক্ত থাকিয়া নিশ্চয়ই পরিশ্রান্ত হইয়াছ।

অনসূয়া। শকুন্তলে! অতিথির অভিপ্রায় মতো কার্য করা আমাদের কর্তব্য। অতএব এসো, আমরাও উপবেশন করি।

শকুন্তলা। (স্বগত) এই ব্যক্তিকে দেখিয়া আমার হৃদয়ে আশ্রমবিরুদ্ধ ভাবের উদয় হইতেছে কেন?

অতীশ বলিল—আপনারা খুব ভয় পেয়েছিলেন না?

একটি মেয়ে বলিল—না, না, আমরা ঠাট্টা করছিলাম।

অতীশ শুধাইতে পারিত—কাহার সঙ্গে! কিন্তু তৎপরিবর্তে শুধাইল—তা হবে—কিন্তু লোকে শুনলে ভয় পেয়েছিলেন বলেই মনে করবে।

অতীশ দেখিল মেয়েরা চড়িভাতি করিতে আসিয়াছে—হাঁড়ি-কুড়ি, চাল-ডাল রহিয়াছে। সে বলিল—যাই হোক, এত সকালে একলা আপনাদের এমন নির্জন স্থানে আসা উচিত হয়নি।

একতমা বলিল—ঠাকুর, চাকর আমাদের সঙ্গে আছে—তারা এখনো এসে পৌঁছয়নি।

ইহা শুনিয়া সে বলিল—তবে তো রক্ষক আপনাদের সঙ্গেই আছে। আর যদিই বা না থাক্‌তো তবু ভয়ের কারণ নেই—যেহেতু এখানকার বনে বাঘ-ভাল্লুক তো দূরের কথা একটা শিয়াল পর্যন্ত নেই। ইতস্ততঃ পোষা শূওর থাকা বিচিত্র নয়। তবে কারো কারো ভয় পাবার পক্ষে তাই যথেষ্ট।

কথাটা বলিয়াই সে বুঝিল—মন্তব্যটা একটু রূঢ় হইয়া গিয়াছে। নিজের ত্রুটি সারিয়া লইবার উদ্দেশ্যে সে বলিল—তবে আমি এখন আসি।

এবারে যে মেয়েটি কথা বলিল—তাহার নাম মালতী। মালতী বলিল—কিন্তু আপনাকে না খেয়ে যেতে দিচ্ছে কে?

অতীশ মৃদু আপত্তি করিল। কিন্তু তাহার স্বরে বুঝিতে পারা গেল, না খাইয়া খুব সম্ভব খাওয়ার পরেও তাহার যাইবার ইচ্ছা আদৌ নাই।

অপরাহ্ণে আহারাদি শেষ হইলে মেয়েরা বিদায় লইবার আগে অতীশের

নিকট হইতে প্রতিশ্রুতি আদায় করিয়া লইল যে, সে তাহাদের আশ্রমে একবার গিয়া দেখা দিয়া আসিবে।

অতীশ তার পরদিনই সেখানে গেল এবং তার পরদিন এবং তার পরদিন এবং জোড়া-মউতে সে যতদিন ছিল প্রতিদিন একবার করিয়া গেল। সেবারে জোড়া-মউ হইতে কলিকাতায় ফিরিতে তাহার অনেক দেরী হইল।

অতীশের প্রমুখাৎ মেয়ে তিনটির যে ইতিহাস আমরা সংগ্রহ করিয়াছি—তাহাই বলিব—আমাদের নিজেদের প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতার একান্ত অভাব।

আমরা আগেই বলিয়াছি যে, জোড়া-মউর অপর পারে, জয়ন্তী নদীর ধারে মদন-কোঠা। সেখানে মিশনারিদের একটি বালিকা-বিদ্যালয় আছে। আশে-পাশের সাঁওতাল ছেলেমেয়েদের শিক্ষা দিবার জন্যই ইস্কুলটি স্থাপিত। মেয়ে তিনটি সেই স্কুলের শিক্ষয়িত্রী—মালতী হেড-মিসট্রেস্। এখন পূজার ছুটি উপলক্ষে ইস্কুলটি কয়েকদিনের জন্য বন্ধ। সামান্য কয়েক দিনের ছুটি বলিয়া তাহারা বাড়ী যায় নাই। সেদিন সকালে তাহারা পূর্বোক্ত স্থানে চড়িভাতি করিতে আসিয়াছিল।

মেয়ে তিনটির একতমার নাম মালতী, অপর দু'জনের নাম রমা ও বিনতা। কাল তাহাদের ইস্কুল খুলিবে, অতীশেরও কাল কলিকাতা রওনা হইবার কথা। আজ মালতীর নিমন্ত্রণে সে চা খাইতে আসিয়াছে।

ইস্কুলটি ছোট, একপাশে শিক্ষয়িত্রীদের বাসের স্থান, চার দিকে ফুলের বাগান আর শাল, মহুয়া, অর্জুন ও সেগুনের গাছ। এই গাছগুলির জন্যই জোড়া-মউ হইতে ইস্কুলটি দেখা যায় না—নতুবা মাঠের মধ্যে দেখা যাইবার কথা নয়।

মালতীর ঘরের বারান্দায় চৌকি ও টেবিল পাতা। টেবিলে চায়ের সরঞ্জাম ও খাদ্য। মালতীরা তিনজন ও অতীশ ছাড়া আর কেহ নাই। চারজনের মধ্যে আজ গল্প-গুজব খুব জমিয়া উঠিয়াছে—তার মধ্যে অতীশ ও মালতীই বেশী মুখর। সে কি কাল বিদায়ের দিন বলিয়া, না বিদায়ের ব্যথাকে চাপা দিবার জন্যই? মধ্য-সমুদ্রে ঢেউ নাই—উপকূলের কাছেই তরঙ্গের বিক্ষোভ।

চা-পান শেষ হইলে অতীশ বলিল—চলুন, সকলে মিলে একটু বেড়িয়ে আসা যাক্। 'সকলে মিলে' বলিলেও সে মনে মনে আশা করিতেছিল 'সকলে' তাহার অনুগমন করিবে না। প্রেমের ব্যাকরণে 'দ্বিবচনেই' চরম, বহুবচন বলিয়া কিছু নাই।

তাহারা চারজনেই বাহির হইল বটে—কিন্তু দেখা গেল কিছুক্ষণের মধ্যেই রমা ও বিনতা পিছাইয়া পড়িয়াছে, অতীশ ও মালতী একটি ভূ-তরঙ্গের আড়ালে অন্তর্হিত হইয়া গেল।

সমস্ত প্রান্তরখানা এক জায়গায় আসিয়া হঠাৎ ঢালু হইয়া নামিয়া গিয়াছে—তাহার নিম্নতম অংশে জয়ন্তী নদীর বালুশয্যা দেখা যায়, সেখান হইতে জমি আবার উঁচু হইতে হইতে দিগন্ত পর্যন্ত চলিয়া গিয়াছে—দিগন্তের ধারে ঝাপসা বনরেখা। অতীশ ও মালতী সেই উপত্যকার প্রান্তে বসিল।

মালতী শুধাইল—কাল তা'হলে নিশ্চয় যাচ্ছেন?

অতীশ বলিল—হাঁ। আপনিও একবার কল্‌কাতায় চলুন না কেন?

মালতী বলিল—ছুটি কোথায়? তার চেয়ে আপনার আসাই তো সহজ।

অতীশ বলিল—বড়দিনে আসবার চেষ্টা করবো।

অতি তুচ্ছ সব কথা। মহৎ কথার সূত্র তুচ্ছ কথা—সামান্য বনলতার সূত্রে যেমন বকুলের মালা গাঁথা। কিন্তু এক সময়ে এই তুচ্ছ কথাও থামিয়া গেল। বাতাস পড়িয়া গেলে বুঝিতে পারা যায় এইবার বৃষ্টি নামিবে।

কিছুক্ষণ দুইজনে নীরব। হঠাৎ অতীশ বলিয়া বসিল—মালতী, তোমাকে আমি ভালবাসি। মালতী কোন উত্তর না দিয়া আঙুল দিয়া আঁচলের প্রান্ত বারংবার জড়াইতে ও খুলিতে লাগিল।

—আঃ, কাপড়খানা নষ্ট করে ফেললেন যে! বলিয়া অতীশ মালতীর অপরাধী হাতখানাকে নিজের হাতে বন্দী করিল। সত্যই কাপড়খানার প্রতি তাহার গভীর দরদ।

শকুন্তলা। আমাকে একাকিনী ফেলিয়া সখীরা যে সত্য সত্যই প্রস্থান করিল।

রাজা। সুন্দরি! তোমার শুশ্রূষার জন্য আমিই তোমার সখীদের স্থান অধিকার করিলাম। এখন কি করিতে হইবে?

শকুন্তলা। সম্মানিত ব্যক্তির নিজেকে অপরাধী করিতে আমার বাসনা নাই। [প্রস্থানের উদ্যোগ]

রাজা। সুন্দরি! দিবাভাগের সন্তাপ এখনো সম্যক্‌ দূর হয় নাই—এখন তুমি কি প্রকারে গমন করিবে?

শকুন্তলা। ছাড়ুন, ছাড়ুন, আমাকে ধরিবেন না।

রাজা। ধিক্, বড়ই লজ্জা পাইলাম।

শকুন্তলা। আমি মহারাজকে কিছুই বলি নাই, আপনার দৈবকে নিন্দা করিতেছি মাত্র।

রাজা। নিজের ইষ্টসাধন কেন না করি? [নিকটে গিয়া শকুন্তলার অঞ্চল ধারণ করিলেন।]

শকুন্তলা। হে পৌরব! বাসনা পূর্ণ না করিলেও এই অভাগিনী' শকুন্তলাকে ভুলিবেন না।

নেপথ্যে। চক্রবাক্-বধূ! আপনার সহচর চক্রবাকের সহিত সম্ভাষণ কর; ঐ দেখ রাত্রি সমাগত।

শকুন্তলা। আর্যপুত্র! আর্যা গৌতমী এই দিকে আসিতেছেন।

এমন সময় রমা বিনতার গান অদূরে শ্রুত হইল এবং অল্পক্ষণের মধ্যেই তাহারা সেখানে আসিয়া উপস্থিত হইল। তখন তাহারা চারজনে ইস্কুল-বাড়ীর দিকে যাত্রা করিল। তখন পশ্চিম দিগন্তে সূর্য অস্ত গিয়াছে। অস্ত-সূর্যের রশ্মি-রসে সমস্ত দিঙ্মণ্ডল প্রভাবিত। চারজনে নীরবে অস্পষ্ট ছায়া ফেলিয়া অগ্রসর হইতে লাগিল।

তার পরে মাস দুইগত হইয়াছে। বড়দিনের ছুটিতে সন্ধ্যা বেলায় অতীশ ও মালতী ঠিক সেইখানেই আবার উপবিষ্ট। দুইজনেই নীরব। মাত্র কয়েক মিনিট আগে অতীশ মালতীর কাছে বিবাহের প্রস্তাব করিয়াছে। মালতী কোন উত্তর না দিয়া চুপ করিয়াছিল—কি ভাবিতেছিল জানি না। কিছুক্ষণ আগে বৃষ্টি হইয়া গিয়াছে—আকাশে ইন্দ্রধনু ফুটিয়াছে—তাহারই প্রান্তভাগ দিগন্তের যেখানে নামিয়া পড়িয়াছে—সেখানকার তরুরাজিতে অলৌকিক বর্ণের তুলি বুলানো। মালতী এই অপরূপ দৃশ্য দেখিতেছিল। হয়তো সে ভাবিতেছিল—ওই যে দিব্য জ্যোতি, কিছুক্ষণ পরেই তাহার আর কোন চিহ্ন থাকিবে না, মলিন তরুরাজি অধিকতর মলিন হইয়া দেখা দিবে। এই দৃশ্যের উদাহরণ সে নিজের জীবনেও সন্ধান করিতেছিল? প্রেমের পূর্বরাগের বিভা কি অমনি ক্ষণস্থায়ী নয়? বিবাহিত সংসারে কি তাহা দীর্ঘস্থায়ী হইবে? যদি না হয় তবে পূর্বরাগের জ্যোতির তুলনায় সংসার কি মলিন মনে হইবে না? সে মলিনতা বহন করিবার ক্ষমতা কি তাহার আছে? কোন মানুষেরই কি আছে?

বিবাহ সম্বন্ধে মালতীর একটি ধারণা ছিল। ভালবাসিয়া বিবাহ করিলে তাহার পরিণাম শুভ হয় না। বিবাহের পরে স্বামি-স্ত্রীর মধ্যে এক প্রকার দাম্পত্য-রস জাগ্রত হয়, সুখে দুঃখে দু'জনের জীবন এক রকম করিয়া চলিয়া যায়—কিন্তু তাহা ভালবাসা নয়। কিন্তু যে-হতভাগ্যেরা পূর্বরাগের ইন্দ্রধনুর সূত্র ধরিয়া বিবাহিত জীবনে প্রবেশ করে—আশাভঙ্গজনিত দুঃখ তাহাদের ভাগ্যে সুনিশ্চিত। সে স্থির করিয়াছিল যদি কখনো বিবাহ করে—তবে গতানুগতিক ভাবেই করিবে—ভালবাসিয়া করিবে না। কিন্তু অদৃষ্টের এ কি বিড়ম্বনা! অতীশ তাহাকে ভালবাসিয়াছে—সেই অতীশ আবার বিবাহের প্রস্তাব করিল। সে-ও অবশ্য অতীশকে ভালবাসে। এখন কিং কর্তব্য?

বিবাহ-বিষয়ক এই ধারণা কোন গ্রন্থ হইতে সংগ্রহ করে নাই। তাহার বিবাহিতা বন্ধুনীদের জীবনের অভিজ্ঞতা দেখিয়া সে সঞ্চয় করিয়াছে। ইহাকে যুক্তির দ্বারা প্রতিষ্ঠিত করিবার মতো বিদ্যাবুদ্ধি তাহার নাই—হয় তো ইহা অমূলক। কিন্তু ওই ইন্দ্রধনুখানাও তো অমূলক—তাই বলিয়া তাহা তো মিথ্যা নয়।

কিন্তু মানুষ এমনি দুর্বল যে, পরিণাম জানিয়াও তাহাকে নিজের বিরুদ্ধে যাইতে হয়। গুড ফ্রাইডের ছুটিতে আবার অতীশ আসিয়াছে। সেবারে নিজের প্রশ্নের উত্তর না পাইয়া সে ফিরিয়া গিয়াছিল। এবারে নূতন উদ্যমে আসিয়া সে উত্তর আদায় করিয়া লইয়াছে এবং বোধ করি উত্তরটা তাহার অপ্রীতিকর হয় নাই।

অতীশ এবার সঙ্গে একখানা মোটরকার আনিয়াছে। সেই গাড়ীতে করিয়া তাহারা দুইজনে দগ্ধ প্রান্তরের তাম্র পথ বাহিয়া দ্রুত ছুটিয়া চলিয়াছে। দুই দিকে পলাশের বন আপাদমস্তক পুষ্পিত।

অতীশ বলিতেছে—আমরা যেন ইস্কুলপলাতক, ছুটেছি আকাশ-প্রান্তরে প্রেমের পিকনিকে আর ওই পলাশের গাছ জ্বালিয়েছে রঙীণ ফুলের মশাল—

মালতী বলিল—কিন্তু মশাল তো একদিন নিববেই—

অতীশ বলিল—কোন্ মশাল না নেবে? আর আমাদের পিকনিকই কোন্ চিরস্থায়ী?

মালতী—সেই তো ভয়—

অতীশ বাধা দিয়া বলিল—মালতী, তোমার ওই ভয়ের কথা কিছুতেই বুঝতে পারি না। আজ যদি তোমাকে ভালবাসি—বিয়ের পরে পারবো না কেন?

মালতী—কেন তা জানি না। বোধ করি বিবাহেরই তা ধর্ম, বোধ করি ভালবাসারই তা প্রকৃতি—কিন্তু পারে না দেখছি—

অতীশ—কেউ যদি না পারে তাই বলে আমি পারবো না কেন?

মালতী চুপ করিয়া রহিল।

সেই দ্রুত ছুটন্ত গাড়ীর মধ্যে বসিয়া কেবল তাহার মনে হইতে লাগিল—এই পলাশের মায়া, এই বসন্তের জাদু যেমন চিরস্থায়ী নয়, ফাল্গুনের এই বনানীকে বৈশাখে যেমন অপরিচিতবৎ বলিয়া মনে হইবে, তেমনি প্রাক্-বিবাহ মালতীকে কি বিবাহোত্তর মালতী হইতে ভিন্ন মনে হইবে না? যদি হয়, তবে অতীশের কি আশাভঙ্গ হইবে না? আশাভঙ্গ হইলে তাহা পূরণ করিবার ক্ষমতা কি তাহার, মালতীর আছে? যদি না থাকে তবে দু'জনের জীবনই না কি বিষম দুর্বহ হইবে? অতীশ দেখিতেছে পলাশ বনের প্রলাপ! সে ভাবিতেছে ফুলের এত ছায়া-সুষমা, এত ছায়াতপও আছে—পলাশ ফুলের রঙ লাল, এ কথা কেবল অন্ধেই বলে। পলাশ ফুলের হাজার রকম রঙ—লাল তার মধ্যে অন্যতম। তাহার মনে হইল—কে বলিল হইা ক্ষণস্থায়ী—যখন সাক্ষাৎ দেখিতেছি, অন্যথা প্রমাণিত না হওয়া অবধি ইহাই একমাত্র সত্য।

মালতী ভাবিতেছে—এ জাদু তো অন্তর্হিত হইল বলিয়া? বৈশাখের শুষ্ক বনস্থলীর উদাসী নিশ্বাস ইতিমধ্যেই কি জীর্ণ পত্রের মর্মরে শ্রুত হইতেছে না? হায়! হায়! এমন ক্ষণিকের উপরে বিশ্বাস রাখিয়া কে ঘর বাঁধে? মরীচিকা নদীর তীরে স্ফটিকের ঘাট বাঁধিবার ক্ষতিপূরণ কোন কালে কি সম্ভব?

দু'জনের চিন্তা জীবন-কোদণ্ডের দুই কোটি আশ্রয়ী—ইহাদের মিলন কি করিয়া সম্ভব? আশাভঙ্গ অনিবার্য? তখন, তখন কি হইবে? তখন কি পরস্পরের বিরুদ্ধে তাহারা বিদ্রোহ করিয়া উঠিবে না? তখন কি তাহাদের মনে হইবে না—একে অপরের সহিত ছলনা করিয়াছে? আজ যাহারা সরসতম মিত্র, তখন কি তাহারাই চরমতম শত্রুতে পরিণত হইবে না?

বিবাহের হোমানলে পূর্বরাগের দেবতা কন্দর্প কি নিত্যনিয়ত ভস্মীভূত হইতেছেন না? তবে এ চেষ্টা কেন? তবু এ চেষ্টা কেন? পূর্বরাগের বিনি সুতায় বনফুল গাঁথা চলে কিন্তু বিবাহের যৌতুকের গুরুভার মণিমুক্তা গাঁথিবার এ বৃথা চেষ্টা কেন? মানুষে ইহা বুঝিয়াও বোঝে না। মালতী ভাবিতেছে—অতীশ বুঝিল না। অতীশ ভাবিতেছে—মালতী পাগল।

তারপর একদিন শুভ লগ্নে অতীশ ও মালতীর বিবাহ সমাধা হইয়া গেল।

এই সংবাদ গল্পের প্রারম্ভেই আমরা দিয়াছি। বন্ধুরা বিদায় লইলে বাসর ঘরের দরজা বন্ধ হইল। সকাল বেলার দীপ্ত আলোকে তাহারা পরস্পরকে দেখিল।

রাজা। ভাগবান্ কণ্ব কি আদেশ করিয়াছেন?

শার্ঙ্গরব। তিনি বলিয়াছেন, আপনি নির্জনে গান্ধর্ব-বিধানে তাঁহার এই কন্যাকে পত্নীত্বে গ্রহণ করিয়াছেন। অতএব ধর্মাচরণার্থ ইহাকে এখন গ্রহণ করুন।

রাজা। ইহা আমার নিকট উপন্যাস বলিয়া বোধ হইতেছে।

শার্ঙ্গরব। আপনি ইহাকে উপন্যাস বলিতেছেন কেন?

রাজা। আমার সহিত কি ইহার পরিণয় হইয়াছে?

শকুন্তলা। হৃদয়! তুমি যে আশঙ্কা করিয়াছিলে, তাহাই ঘটিল।

গৌতমী। বৎসে, একবার লজ্জা ত্যাগ কর, আমি তোমার অবগুণ্ঠন মোচন করিয়া দিতেছি।

রাজা। (শকুন্তলাকে দেখিয়া) এই অম্লানকান্তি সুন্দর রূপ যে পূর্বে পরিগ্রহ করিয়াছিলাম, চিত্তনিবেশপূর্বক চিন্তা করিয়াও তো তাহা স্মরণ করিতে পারিতেছি না।

শকুন্তলা। যদি প্রকৃত পক্ষেই আপনি পরদারা জ্ঞানে আশঙ্কা করেন, তবে কোনরূপ অভিজ্ঞান দেখাইয়া আপনার সে আশঙ্কা দূর করিতেছি।

রাজা। সেই কথাই ভালো।

শকুন্তলা। (অঙ্গুরীয় স্থান দেখিয়া) হা ধিক্! হা ধিক্! আমার অঙ্গুলীতে অঙ্গুরীয় নাই।

বিবাহিত জীবনের প্রথম আলোকে অতীশ ও মালতী পরস্পরকে দেখিল। অতীশ নিজের অগোচরে চমকিয়া উঠিল—একটি অতি-ক্ষুদ্র, অতি-গুপ্ত দীর্ঘনিশ্বাস অলক্ষ্যে তাহার বক্ষ হইতে নিঃসৃত হইল। তাহার কেন যেন মনে হইল—এই কি সেই মালতী? মালতী বিস্মিত হইল না। সে তো পূর্বাহ্নে সমস্তই কল্পনা করিতে পারিয়াছিল। অতীশের মুখে পূর্বগামিনী ছায়ার আভাস লক্ষ্য করিয়া সে নীরবে নিজের অনামিকার দিকে তাকাইয়া বসিয়া রহিল। সে কি শকুন্তলার মতোই ভাবিতেছিল না,—হা ধিক্! হা ধিক্! আমার অঙ্গুলীতে অঙ্গুরীয় নাই!

সুতপা

যে সব গুণ ও যে-পরিমাণ রূপ থাকলে বিয়ের বাজারে উচ্চ চাহিদা হয় তার সবগুলি থাকা সত্ত্বেও সুতপা যখন বুঝতে পারলো বিয়ে তার হবার নয়—সে আর দশজন মেয়ের মতো আশাতীতের পিছনে বৃথা ছুটোছুটি না করে জীবন-ক্যালেণ্ডারের সে পাতাখানাকে ছিঁড়ে ফেলে দিল। এবারে তার জীবনে এলো ইস্কুল-মাষ্টারির অধ্যায়। বাংলাদেশের বাইরে ছোট একটি সহরের মেয়ে-ইস্কুলের মাষ্টারি নিয়ে সে চলে গেলো। তার উপরে নির্ভর করে সংসারে এমন কেউ তার ছিল না—সে স্থির ক'রে ফেল্‌লো আর কারো উপরেও সে নিজের ভার চাপাবে না। তারপরে একদিন সে নিজের বিছানা বেঁধে, তোরঙ সাজিয়ে হাওড়া স্টেশনে গিয়ে গাড়ীতে চড়ে বস্‌লো। সে আজ অনেক দিনের কথা।

সুতপা আট বছর এই ইস্কুলে মাষ্টারি করছে বটে, কিন্তু কালের হিসাব আর মনের হিসাবে সব সময়ে খাপ খায় না—তার মনে হয় কত জন্ম ধ'রে যেন এখানে সে আছে—আরো কত জন্ম তাকে থাক্‌তে হবে। তার মনে পড়ে যায়, বাল্যকালে সে একবার তার পিতার সঙ্গে নৌকোয় ক'রে মস্ত এক নদী পাড়ি দিয়ে রেলস্টেশনে আসছিল—একদিকে সরু নীল পাড়ের মতো তীরের রেখা—আর একদিকে ঝাপসা আবছা দিগন্ত—আকাশ আর জল মিশেছে বলে মনে হয় না। সুতপার মনে হয়, এখনো যেন সেই নদীপথেই সে চলেছে—অতীতের দিকে অতি দূরে পূর্বজীবনের ক্ষীণতম একটুখানি আভাস—ভবিষ্যতের দিকে কেবলি অশ্রুর ঘনতর বাষ্প, তীরের লেশমাত্র নেই। সে স্থির ক'রে নিয়েছে এমনি ক'রেই ভাস্‌তে ভাস্‌তে অবশেষে একদিন জীবনের প্রান্তে এসে পৌঁছবে।

ইস্কুলের কাজের ছকের সঙ্গে তার জীবনটা এতদিনে খাপে খাপে মিলে যাওয়া উচিত ছিল, গিয়েছেও তাই। কিন্তু বিপদ হয় ছুটিগুলোকে নিয়ে। ইস্কুলের জীবন নিরেট কাজ নয়—লম্বা, এবং ছোটখাটো ছুটির টুক্‌রো সাজিয়ে তৈরী। ওই ছুটিগুলোকে নিয়ে সুতপা পড়ে বিপদে। হাতের প্রচুর অবসর আর মনের গভীর শূন্যতা দুইয়ে মিলিয়ে তার মনে আদিম একটা অরাজকতার সৃষ্টি করে। নিজের ছোট ঘরখানির শূন্য শয্যায় শুয়ে একখানা বই খুলে নেয়। মনোযোগ বইয়ের পাতার অক্ষরের কালো রেখা ধরে প্রথম প্রথম বেশ ছুটতে থাকে—কিন্তু হঠাৎ কখন নিজের অজ্ঞাতসারেই গাড়ী এক লাইন থেকে আর এক লাইনে যায় চলে—আর একদিন অনায়াসে জীবনক্যালেণ্ডারের যে-

পাতাখানাকে ছিঁড়ে ফেলে দিয়েছিল কোন্ সঞ্চিত দীর্ঘনিশ্বাসের ঘূর্ণিহাওয়ায়, সেখানা উড়তে উড়তে কোলের উপরে এসে পড়ে—সুতপা চমকে ওঠে!

মিহির বলে,—চলো বেড়িয়ে আসি।

সুতপা বলে,—চলো!

মিহির একখানা গাড়ী ডাকে।

সুতপা বলে,—আবার গাড়ী কেন?

মিহির বলে,—কল্‌কাতার পথে লোকজন ঠেলে আর অপঘাত বাঁচিয়ে চল্‌তে গিয়ে মনোযোগের পনেরো আনাই মাঠে মারা যায়—পরস্পরের জন্য আর বাকি থাকে না। গাড়ীর সুবিধে এই যে, গাড়োয়ানটাকে ভিড় ঠেলে চলবার ভার দিয়ে বেশ নিশ্চিন্ত মনে গল্পগাছা করা যায়।

দু'জনে গাড়ীতে উঠে বসে।

ক্যালেণ্ডারের তারিখের কালো খোপগুলোর মাঝে মাঝে এক একটা লাল তারিখ—কালোর ঘের-দেওয়া লাল অঙ্ক।

গাড়ী চল্‌ছে। মিহির কথা বলে না, মুখ ভারি ক'রে থাকে। একটুতেই মিহিরের রাগ করা অভ্যাস। নিরুপায় সুতপা হ্যাণ্ডব্যাগ খুলে ফেলে ছোট্ট একখানি রুমাল বের করে; ভাঁজ খুলে ফেল্‌তেই বেরিয়ে পড়ে কয়েকটি শুভ্র বেল ফুল। সুতপা বলে,—এই নাও, সন্ধি স্থাপন করলাম।

মিহির ফুলগুলোর সঙ্গে রুমালখানা টান দিয়ে নিয়ে পকেটে ভরে।

সুতপা বলে,—ও কি?

মিহির বলে,—কেন পতাকা।....আচ্ছা এ ফুল কি আমার জন্য এনেছিলে?

সুতপা গম্ভীরভাবে বলে,—না।

আবার ওর মুখ ভারি হয়। দু'জনেই জানে এ ফুল কার জন্যে আনা। তবে একজনেরই বা কেন জিজ্ঞেস করা এবং আর একজনেরই বা কেন অস্বীকৃতি? কিন্তু সংসারে নিরন্তর কি এমনি ঘট্‌ছে না? যে-চোর হাতে-নাতে ধরা পড়েছে সেও তো দোষ স্বীকার করে না!

এমন সময়ে গাড়ী ধাক্কা খায়। সুতপা চমকে ওঠে। নাঃ গাড়ীর ধাক্কা নয়—চন্দনী এসে দরজায় ধাক্কা মারে। চন্দনী ওর ঝি।

চন্দনী বাইরে থেকে বলে,—দিদিমণি চায়ের সময় হয়েছে।

সুতপা তাড়াতাড়ি শয্যা ছেড়ে ওঠে—ক্যালেণ্ডারের ছিন্ন পাতাখানা হঠাৎ

উড়ে চলে যায়—খুব দূরে নয়—কাছেই কোথাও লুকিয়ে থাকে পুনরাবির্ভাবের সুযোগে।

সুতপা ছোট্ট একখানি বাড়ী পেয়েছে—সরকারী পরিভাষায় যাকে বলে 'ফ্রি কোয়ার্টার'। একটি ছোট ড্রয়িংরুম, একটি বেড রুম। সমুখে একটি জাল দিয়ে ঘেরা বারান্দা, পিছন দিকে বাঁধানো উঠোন, রান্নাঘর, স্নানের ঘর—সবই আছে অল্পর মধ্যে। চন্দনী ওর ঝি—প্রথম থেকেই আছে সুতপার সঙ্গে। রাঁধে বাড়ে, সুতপাকে খাওয়ায়, নিজে খায়। চন্দনী ওইখানেরই লোক।

ইস্কুল খোলা থাক্‌লে সুতপা দশটার মধ্যে খাওয়া সেরে সেজে নিয়ে বেরুবার আগে একবার আয়নার সমুখে দাঁড়ায়। এলোমেলো চুলগুলোকে কপাল থেকে সরিয়ে দিয়ে, মুখের উপরে একবার রুমাল বুলিয়ে, দরজা বন্ধ ক'রে ইস্কুলে চলে যায়। চন্দনী বাড়ীতে থাকে। আবার ইস্কুল থেকে ফিরে দরজা খুলে আয়নার সমুখে দাঁড়ায়—ওটা একরকম তার মুদ্রাদোষ হয়ে গিয়েছে। রোদে আর পরিশ্রমে বিকালবেলায় স্থলপদ্মের মতো মুখ তার ঈষৎ মলিন, চুলগুলো কপালের উপরে এসে পড়েছে। স্থলপদ্মের কথা মনে পড়তেই তার হাসি পায়; উপমাটা মিহিরের। হাসির সঙ্গে সঙ্গেই চোখের কোণ উজ্জ্বল হ'য়ে ওঠে, বাতাসে নাড়া-খাওয়া পাতার নীচে রৌদ্র-চিক্কণ শিশিরের ফোঁটা।

এসব তার ইস্কুল-মাষ্টারির প্রথম জীবনের কথা। তখনো তার মন শক্ত হয়নি, শুক্তির মধ্যেকার কাঁচা মুক্তাবিন্দুর মতো একটুতেই চঞ্চল হ'য়ে উঠতো। রাত্রে বিছানায় শুয়ে বালিশে মুখ গুঁজে কত রাত্রি পর্যন্ত না সে কেঁদেছে, এখন আর সহজে চোখে জল আসে না! এখন চোখের জল দুঃখের তাপে একেবারে দীর্ঘনিশ্বাসের বাষ্পাকারে বের হয়। এক সময়ে মধ্যরাত্রির অদৃশ্য প্রহরের জন্য যা সঞ্চিত ছিল এখন তা নিরন্তর বাষ্পাকারে উচ্ছ্বসিত—সময় অসময় নেই! পরিমিত চোখের জলের চেয়ে অপরিমিত দীর্ঘশ্বাস কি শ্রেয়ঃ, সুতপা বুঝতে পারে না।

প্রথম যখন সে এখানে এসেছিল, তখন তাকে নিয়ে কানাকানি পড়ে গিয়েছিল, ছোট সহরে ছোট জলাশয়ের মতো একটু আঘাতেই তরঙ্গ-বলয় প্রসারিত হয়ে যায়। তাদের দোষ দিইনে। মাষ্টারণী নামে যে-সব মেয়ের সঙ্গে এরা পরিচিত তাদের চেহারা ও ধরণধারণই স্বতন্ত্র। কোণ-বহুল তাদের মুখমণ্ডল, শীর্ণ তাদের দেহ, তারা যেন সংসার-হর্তুকির শুষ্ক বীচি; কেউ বা আবার এমন স্থূল যেন গঙ্গাস্নানের যাত্রীর আল্‌গা ক'রে বাঁধা বিসদৃশ বোচকা।

তাদের কেউ বা প্রগল্‌ভ, আর যারা নীরব তাদের যেন সমাধির স্তব্ধতা। তাদেরি বা দোষ কি? সংসারের ঘাটে ঘাটে ঠোক্কর খেতে খেতে তাদের সুডোল আকৃতি তুব্‌ড়ে তাব্‌ড়ে ওই একরকম হ'য়ে গিয়েছে।

স্তুতপা তাদের থেকে কত আলাদা!

কাঁচা তার বয়স, কচি তার মুখ, সৌন্দর্যের শুভ্র-শ্রীর উপরে বুদ্ধির চিক্কণতা সত্তমথিত নবনীতের উপর রৌদ্রের মতো গড়িয়ে পড়ছে; চুলগুলি খোঁপায় বদ্ধ, শাড়ী জামা যত কম দামেরই হোক না কেন তার স্পর্শে যেন একটা আভিজাত্য লাভ করে, ছোট জুতো জোড়া দেখে ওর পায়ের লঘুসৌষ্ঠব অনুমান করতে দেরি হয় না। বেশি কথা কয় না অথচ লোকদেখানো নীরবতার ভাণও নেই, অত্যন্ত অপরিচিতের সঙ্গেও অনাড়ম্বর মহিমায় কথা বলতে পারে। আত্মসম্মান রক্ষার সপ্রয়াস বড়াই নেই—ও আপনিই রক্ষিত হয়। স্তুতপা যেন স্বচ্ছ স্ফটিক জলের উৎস—কত গভীর তা অনুমান করা সহজ নয়।

ইস্কুলের সেক্রেটারি বল্‌লেন,—তুমি একলা থাকবে?

স্তুতপা সহজভাবে বল্‌ল—আমি তো চিরকালই একলা, ও আমার অভ্যাস হ'য়ে গিয়েছে।

সেক্রেটারি তাকে বাসা দেখিয়ে দিলেন, চন্দনী নামে ঝি-ও তাঁর স্থির ক'রে দেওয়া।

প্রথম প্রথম মিহির মাঝে মাঝে আস্‌তো। এমন স্থলে একটু কানাঘুষা হ'য়েই থাকে। লোকে ভাব্‌তো এ আবার কে? কিন্তু অপরকে যা মানায় না স্তুতপার পক্ষে তা যেন অশোভন নয়। লোকের যে কানাকানি দাবাগ্নিতে পরিণত হ'তে পারতো স্তুতপার সযত্ন আঁচলের আড়াল তার নিয়ন্ত্রিত জ্যোতিকে গৃহদীপের পদবী দিল। লোকের রসনা ক্ষান্ত হ'ল—কিন্তু তার মনে কি শান্তি ছিল? স্তুতপা ভাব্‌তো মিহির কি চায়? সে কি ধরা দেবে না? মিহির মরীচিকার ফসল কেটে গোলা ভরতি করতে চায় নাকি? এমন ক'রে আর কতদিন চলবে? মিহির দু'একদিনের জন্যে আসে আবার চলে যায়—বহুদিন দেখা পাওয়া যায় না—আবার হঠাৎ একদিন এসে উপস্থিত।

আসলে স্তুতপা জানে না যে, পুরুষ দুই জাতের। এক জাতের পুরুষ আছে যারা মেয়েদের হৃদয়ে আগুনের জোয়ার জাগিয়ে দিয়ে চলে যায়, ধরা দেওয়া তাদের স্বভাব নয়; অন্য জাতের পুরুষ চাঁদের মতো পৃথিবীকে আবর্তন করে, ক্রমে তারা পৃথিবীরই এক দূরবিসর্পী অংশে পরিণত হয়, তাদের স্নিগ্ধ আলোক

পৃথিবীর অন্ধকার দূর করে। মিহির প্রথম জাতের পুরুষ। তার সঙ্কেতে নারীচিত্ত আলোড়িত হয়, মথিত হয়, কিন্তু না দেয় সে ধরা, না পারে সে ধরতে। এজন্য তাকে দোষ দেওয়া বৃথা। পূর্বরাগের দীপ্ত অসিকে বিবাহের বক্র খাপের ভিতরে ঢোকানো চলে না। কন্দর্প একবার মহাদেবের বিবাহের ঘটকালি করতে গিয়ে দগ্ধ হ'য়েছিলেন, সেই থেকে প্রজাপতির উপরে তাঁর চিরকালীন বিরক্তি! মিহির যে-দেবতার প্রজা তিনি প্রজাপতি নন, কন্দর্প।

সুতপার সবচেয়ে অসহ্য শীতের দীর্ঘ রাত্রিগুলো। ছোট সহরে রাত্রির নিষুতি শীঘ্র আবির্ভূত হয়। রাত্রি আটটার মধ্যে খাওয়া সেরে সে ঘরে ঢোকে—চন্দনী যায় তার বাড়ীতে চ'লে। তারপর থেকে তার সুদীর্ঘ নিশি উদ্‌যাপনের পালা। শীতের প্রহর বরফ-জমা নদীর মতো অচল; পাষাণের ভারে তা বুকের উপরে চেপে বসে। সুতপা আলোটা উস্কে দিয়ে মাথার কাছে টেনে নেয়—তার পরে লেপের ভিতরে ঢুকে পড়ে একখানা বই খোলে। ওই বই নিয়ে শোয়া তার এক মুদ্রাদোষ—বই সে পড়তে পারে না—তার মন অজানা চিন্তার ধারা বেয়ে ছুটে চল্‌তে থাকে। চিন্তার ফাঁকে ফাঁকে ঘড়ির দিকে তাকায় কাঁটা দুটো কি চল্‌ছে? এত ধীরে কেন? দেয়ালে টিকটিকি ওৎ পেতে আছে, মাঠের মধ্যে শিয়াল ডেকে ডেকে ওঠে—হঠাৎ জানালার ফাঁকে চোখে পড়ে, রেল লাইনের পাশের গাছগুলোর মাথা উজ্জ্বল হ'য়ে উঠ্‌ল—সাড়ে এগারোটার গাড়ীর সার্চলাইট। তারপরে কখন সে ঘুমিয়ে পড়ে—আলোটা জ্বলতে জ্বলতে নিভে যায়। পরদিন চন্দনী এসে বলে—দিদিমণি কেরোসিন যে মেলে না—রাতে অত নাই পড়লে। এমনি প্রতি রাত্রে। শূন্যতার ভার যে এত দুর্বহ তা কি সুতপা আগে জান্‌তো।

তার জীবনযাত্রা যখন এমনিভাবে চলছিল—তখন সে এক সঙ্গিনী পেলো। রমা নামে একটি মেয়ে ইস্কুলের সেকেণ্ড টীচার হ'য়ে এলো। সুতপা হেড মিস্‌ট্রেস। ছোট জায়গায় অতিরিক্ত বাড়ী পাওয়া সম্ভব নয়। সুতপা রমাকে বল্‌ল,—তুমি আমার সঙ্গে থাকো না কেন? রমা রাজি হ'ল। সুতপা তাকে নিজের ড্রয়িং রুমটা ছেড়ে দিল। মিহির দু'একদিনের জন্য এসে পড়্‌লে রমা সুতপার ঘরে রাত কাটাতো। রমার সঙ্গ পেয়ে সুতপার শূন্যতার বোঝা কিছু হাল্কা হ'ল।

রমা সদ্য বি-এ পাশ করে এসেছে—সুতপার চেয়ে প্রায় দশ বছরের

।

মিহির মাঝে এসে একদিন কাটিয়ে গেল।

রমা বলে—সুতপাদি, তুমি বিয়ে কর না কেন?

সুতপা শুধায়,—বিয়ে করবে কে আমাকে?

বর স্থির ক'রে তবে প্রস্তাব উত্থাপন করতে হবে এমন দায়িত্ব জানলে সে ওকথা কখনোই তুলতো না। তবু সে মনে মনে বলে,—কেন মিহিরবাবু তো আছেন। একবার দেখেই মিহির-সুতপার সম্বন্ধের একটা আঁচ রমা পেয়েছে। এসব জিনিস মেয়েদের চোখ প্রায়ই এড়ায় না।

সুতপা উল্টে প্রশ্ন করে,—তুমি বিয়ে না ক'রে চাকরি করতে এলে কেন?

রমা বলে,—চাকরি আর বিয়েতে তো আড়াআড়ি নেই। করবো।

তারপর একটু ঝোঁক দিয়ে বলে,—সুতপাদি, আমার বিলেতে যাবার ইচ্ছে।

এবারে সুতপা না হেসে পারে না।

—বিলেতে যাবার সোজা পথ কি হ'ল বিহারের এই ইস্কুলের মাষ্টারি।

সে বলে,—রমা সত্যি যদি বিলেত যাবার ইচ্ছে থাকে—তবে সে পথও হ'তে পারে বাসর ঘরের ভিতর দিয়ে, যদি তেমন তেমন বিয়ে হয়।

সুতপা বুঝতে পারে, রমা মেয়েটি মনে বয়সে অভিজ্ঞতায় একেবারেই কাঁচা। সংসারের পথ ঘাট সম্বন্ধে কোন ধারণাই তার নেই। এই জাতের মেয়েরাই বিপদে পড়ে। যে-কোন পুরুষ দুটো মিষ্টি কথা বলে' ওদের বিভ্রান্ত করতে পারে। সে নিজে দুঃখের আগুনে পোড় খেয়ে অনেকটা শক্ত হ'য়েছে—কিন্তু রমাকে আগ্‌লে রাখতে না পারলে বিপদ আছে। সুতপার ঘাড়ে এক নূতন দায়িত্ববোধ চাপে।

মিহির একমাসের মধ্যে দু'বার এলো। এত ঘন ঘন সে আসে না। সুতপা তাকে বল্‌ল,—তুমি এত ঘন ঘন এস না, লোকে নানারকম কথা বলতে সুরু করেছে।

কথাটা সত্য নয়। সুতপার সম্বন্ধে কেউ কখনো কিছু বলেনি, বলা যে চলে তাও কারো মনে হয়নি।

তিন দিন ধরে রমার অসুখ, সে স্কুলে যায়নি। ইস্কুল থেকে বাড়ী ফিরে সুতপা দেখ্‌লো,—মিহির বারান্দায় দাঁড়িয়ে আছে। তার মনের মধ্যে

বিদ্যুতের মতো খেলে গেলো—এই সুযোগ বুঝেই কি মিহির এসেছে? কিন্তু জান্‌লো কি ক'রে? তবে কি রমা মিহিরকে চিঠি লেখে নাকি?

সুতপা মিহিরকে বল্‌লো,—আজ তোমাকে রাতে থাক্‌তে বলতে পারলাম না।

মিহির বললো—কেন?

—রমার অসুখ, তাকে ড্রয়িং রুম থেকে নড়ানো চল্‌বে না। তোমাকে থাক্‌তে দেবো কোথায়?

মিহির সুতপাকে অবশ্যই চেনে—জানে তর্ক ক'রে তার মত পরিবর্তন সম্ভব নয়। মিহির বিদায় হ'য়ে গেলো। সুতপা লক্ষ্য করলো, মিহির চলে যাবার সঙ্গে সঙ্গেই রমার মুখ থেকে একটা আলো যেন নিভে গেলো।

রমা বল্‌ল,—সুতপাদি, তুমি মিহিরবাবুকে বিদায় করে দিলে কেন? আমি তোমার ঘরেই শুতাম।

সুতপা বল্‌ল,—না।

যুক্তিতর্কের শৃঙ্খলাহীন ওই মারাত্মক 'না' শব্দটিতে রমা বুঝ্‌তে পারলো মিহিরের ঘন ঘন যাওয়া-আসার সঙ্গে রমার উপস্থিতির একটা যোগ সুতপা যেন স্থাপন ক'রে নিয়েছে।

রমা মিহির-সচেতন হ'য়ে উঠল, তারপর থেকে তেমন অনায়াসে আর সে মিহিরের প্রসঙ্গ তুল্‌তে পারতো না।

সুতপার জীবনের শূন্যতার বসনের মধ্যে অতি সূক্ষ্ম ঈর্ষার, অতি সূক্ষ্ম আত্মগ্লানির দুটি সুতোর টানা-পোড়েন ক্রমে যুক্ত হ'য়ে যায়। এসব এমন কথা যার প্রমাণ নাই, অনুমানও বলা চলে না, এ যেন নিজের ছায়ায় নিজের ভীত হ'য়ে ওঠা। অপরের উপরে দোষ দিতে পারলে যে সান্ত্বনা পাওয়া যায়, সে সান্ত্বনা-টুকুও নেই এর মধ্যে। মিহির চিঠি লিখলো একবার আস্‌তে চায়। সুতপা লিখে দিল—এখন আসবার প্রয়োজন নেই।

মিহির যে তাকে বিবাহ করবে—এ আশা তার অনেক দিন চলে গিয়েছিল। সে হচ্ছে গিয়ে দুঃখ। আর মিহিরের সঙ্গে রমার যোগাযোগ—সত্যই কি তাই? খুব সম্ভব সেটা কেবল সুতপার অনুমান মাত্র, প্রমাণই হোক্ বা অনুমানই হোক্, সুতপার কাছে তা সত্য। ঈর্ষার সত্য, আত্মগ্লানির সত্য! সেই সত্য তাকে নিরন্তর পীড়িত করতে লাগ্‌লো। এ হচ্ছে দুশ্চিন্তা। দুঃখের অন্ত আছে, দুশ্চিন্তার অন্ত কোথায়? এই নূতন দুশ্চিন্তায় সুতপার শরীর ও

মন ধীরে ধীরে ক্ষয়ে যেতে লাগ্‌লো। দিনের কাজ বিস্বাদ, রাত্রের নিদ্রা বিষাক্ত, রমার সঙ্গ কাঁটার মতো সূচীমুখ। কিন্তু তার সব চেয়ে ভয়াবহ সময় রাত্রির নিস্তব্ধ প্রহরগুলো। শেষ পর্যন্ত বাধ্য হ'য়ে তাকে নিদ্রাকর ঔষধের সাহায্য নিতে হ'ল—আফিঙের আরক-দেওয়া ঘুমের ওষুধ।

একদিন গভীর রাত্রে হঠাৎ একটা কোলাহলে তার ঘুম ভেঙে গেল। জান্‌লা খুলে দেখ্‌ল—তুমুল রবে বাজনা বাজিয়ে, মশাল জ্বালিয়ে একটা শোভা-যাত্রা চলেছে, বিয়ের শোভাযাত্রা। একটা খোলা ঘোড়ার গাড়ীতে বর-কনে বিয়ে ক'রে বাড়ীতে ফিরছে। সে মূঢ়ের মতো সেই দিকে চেয়ে দাঁড়িয়ে রইলো। শোভাযাত্রা চলে যাওয়ার পরে সমস্ত জায়গাটা গভীরতর অন্ধকারে নিমজ্জিত হ'য়ে গেল। সুতপা জানালা বন্ধ ক'রে বিছানায় এসে শুয়ে পড়লো। তৃষ্ণার্ত পথিক নদীর স্বচ্ছ শীতলধারা দেখ্‌তে পেয়েছে!

সুতপা স্থির করলো সে বিবাহ করবে। মিহির যদি সম্মত না হয়—তবে অন্যত্র সে বিবাহ করে ফেল্‌বে। এমন ক'রে দুশ্চিন্তার জাল টেনে আর চলা যায় না। এই সঙ্কল্প করবামাত্র কেমন একটা স্বস্তি বোধ করলো, সে ঘুমিয়ে পড়লো—এমন আরামের নিদ্রা অনেক দিন তার ভাগ্যে জোটেনি।

এদিকে রমার মধ্যেও কেমন যেন একটা পরিবর্তন হ'য়েছে। কিছুদিন থেকে শরীর তার সুস্থ যাচ্ছে না—কিন্তু তাই বলে মনের আনন্দের কিছু অভাব নেই। শীতের রাতের সমস্ত শিশির বিন্দু গড়িয়ে এসে অশত্থ-পাতার আগটিতে যেমন দুল্‌তে থাকে তার সমগ্র মনটি যেন মুখমণ্ডলে এসে সঞ্চিত হ'য়েছে, প্রতি নিশ্বাসে তা কেঁপে ওঠে। সুতপা ও তার মধ্যে ব্যবহারের যে-আন্তরিকতা আগে ছিল এখন তা আর নেই—ভদ্রতাটুকু অবশ্য আছে। দুপুর বেলা চিঠির গোছা এলেই তার মন চঞ্চল হ'য়ে ওঠে—সুতপার চোখ তা এড়ায় না, সুতপার চোখ এড়ায়নি এই লজ্জা তাকে দ্বিগুণ লজ্জিত ক'রে তোলে। কিন্তু আশ্চর্যের এই যে, এই সমস্ত লজ্জা, উদ্বেগ, চঞ্চলতা সমস্তর সমষ্টি কিন্তু দুঃখ নয়—কেমন এক রকমের তীব্র উন্মাদনা! অভিজ্ঞতটা রমার মন্দ লাগে না।

গাড়ীর সময় হলেই রমা আর স্থির থাকতে পারে না—সুতপা লক্ষ্য করে। বাড়ীর বাহিরে কারো পায়ের শব্দ শুনলেই তার বুকের মধ্যে হৃৎপিণ্ডের মাথা-কোটা উগ্রতর হয়ে ওঠে—নিজের স্পন্দনে সুতপা রমার স্পন্দন বোঝে; সুতপার হৃৎপিণ্ড বলে, যেন সে না আসে, যেন সে না আসে, আর রমার তালে তালে বাজতে থাকে, আসুক, আসুক, আসুক। রাত্রে পাশাপাশি দুই ঘরে দুইজন

শুয়ে থাকে—দুইজনের চিন্তা একই নদীর দুই বিপরীত কূল বেয়ে দুই বিপরীত দিকে গুণ টেনে চলে। আজ দুইজনেই সমান দুঃখী—তবে রমার দুঃখের পাড় দু'খানা উজ্জ্বল, সুতপার দুঃখ নিশ্ছিদ্র।

মিহির অনেকদিন আসেনি। সে রাত্রের অভিজ্ঞতা অনুসারে কাজ করবার জন্যে তার একবার কল্‌কাতায় যাওয়া দরকার। সুতপা ছুটির দরখাস্ত করল। ছুটি অবশ্যই তার মিললো, কিন্তু সবাই বিস্মিত হ'য়ে গেলো—এ আবার কেমন? যে সুতপা ছুটিতে অবধি ছুটি নেয় না,—এখানেই থাকে, তার হঠাৎ এমন কি প্রয়োজন পড়লো!

রমা শুধালো—সুতপাদি, তুমি ছুটি নিচ্ছ?

সুতপা বল্‌ল—তোমরা পাড়া শুদ্ধ সবাই এমন অবাক হ'য়ে গেলে কেন? আমার কি কোন কাজ পড়তে নেই।

রমা বলল—তা কেন? তবে আমি এসে তোমাকে ছুটি নিতে দেখিনি—তাই একটু অবাক লাগছে।

রমার অবাক হওয়া উচিত নয়—তার আসার সঙ্গে সুতপার ছুটি নেওয়ার একটা প্রচ্ছন্ন যোগ আছে।

রমা আবার শুধালো—কবে যাবে?

সুতপা একটা শনিবারের উল্লেখ করলো—তখনো তার দশ দিন দেরী।

ইতিমধ্যে সুতপা মিহিরকে খান দুই তিন চিঠি লিখেছে, উত্তর পায়নি। মন দিয়ে লক্ষ্য করলে বুঝতে পারা যেতো—সুতপার মধ্যে কোথাও যেন একটা পরিবর্তন হ'য়ে গিয়েছে। মুখখানা তেমনি সুন্দর আছে—কিন্তু তার উপরে কেমন যেন একটা স্থির সঙ্কল্পের অস্বাভাবিক দীপ্তি, খোলা তলোয়ারের শাণিত উজ্জ্বলতার মতো!

আজ শনিবার। সুতপার ছুটির দিন। রাত্রের ট্রেণে তার কল্‌কাতা যাত্রার কথা। ইস্কুল থেকে সে একটু আগেই বাসায় ফিরে এল, গুছিয়ে গাছিয়ে নিতে হবে—রমাকে বাড়ী-ঘর বুঝিয়ে দিতে হবে—অনেক কাজ বাকি। টেবিলের উপর ছিল একখানা খামের চিঠি, অন্য দিনের মতো স্থিরতা তার থাকলে ঠিকানা দেখে তবে সে খুলতো। চিঠিখানা খুলে ফেলেও তার বিস্ময়ের কোন কারণ হ'ল না। মিহিরের চিঠি। তবে সে এতদিন পরে উত্তর দিয়েছে। মিহির লিখছে যে, সে শনিবার শেষ রাত্রে যাবে, সে যেন তৈরি থাকে, দু'জনে রওনা হবে

জব্বলপুরের দিকে। বিশেষ ক'রে শনিবার স্থির করবার কারণস্বরূপ লিখেছে যে, সেদিন মাঝরাতের ট্রেনে সুতপা কলকাতা চলে যাবে কাজেই এমন সুবিধে আর পাওয়া যাবে না। হঠাৎ নিজের নামটা পড়ে সে চমকে উঠ্‌ল—এ চিঠি তবে কা'কে লেখা? উপরে রমার নাম। তবে সে না জেনে রমার চিঠি খুলে ফেলেছে। কিন্তু ঠিকানাতো মিহিরের হস্তাক্ষর নয়! দুঃখের নূতন জগৎ আবিষ্কারের বিস্ময়ে বসে পড়লো! তবে যা অনুমান করেছিল তা মিথ্যা নয়। অনুমান? এইতো প্রমাণ তার হাতে। দেহের বীভৎস ক্ষতস্থানের দিকে চাইতে যেমন ভয় করে—অথচ না তাকিয়েও থাকতে পারা যায় না—চিঠিখানা নিয়ে সুতপার তেমনি অবস্থা! খানিকটা পড়ে আবার থামে। বটে! দু'জনে পালানোর ব্যবস্থা অনেকদিন থেকেই স্থির—"পাছে তুমি দিনক্ষণ ভুলে যাও, তাই আজ আবার মনে করিয়ে দিলাম।" তা'হলে রমাও তৈরি ওর সঙ্গে পালিয়ে যাবার জন্যে, কিন্তু কই তার মুখ-চোখ দেখে তো সুতপা বুঝতে পারেনি, বুঝতে পারা উচিত ছিল! রমাকে যেমন ভাবা গিয়েছিল তেমন নয় দেখ্‌ছি, বেশ চাপা মেয়ে। চিঠিখানা নিয়ে নিজের বিছানায় গিয়ে সে শুয়ে পড়লো, দরজা দিতে ভুললো না। চিঠিখানা পড়তে পড়তে সে এক রকম হিংস্র-উল্লাস অনুভব করতে লাগলো। এই একখানা চিঠির আঘাতে সে রমা ও মিহির দু'জনকেই ধরাশায়ী করতে পারে। মাত্র দু'জন? সব চেয়ে বেশী আঘাত যে পেয়েছে তার নাম কি সুতপা রায় নয়? "আমি পিছনের দিকের প্রাচীরের কাছে দাঁড়িয়ে থাকবো—তুমি তোমার ঘরের সম্মুখের দরজা দিয়ে না বেরিয়ে বেরুবে পিছনের দরজা দিয়ে—উঠোনের দিকে। ঘড়িতে চারটার এলার্ম দিয়ে রেখো।" ওঃ ক্যাম্পেনের প্ল্যানে কোথাও খুঁৎ নেই যে! মিহির লিখছে, তার পরে দু'জনে পালিয়ে যাবে জব্বলপুরে—সম্মুখে অনন্ত পৃথিবী, অবাধ আকাশ। সুতপার মনে হ'ল—ইস্—একেবারে রোমিও জুলিয়েট আর কি! তার মনের মধ্যে শত-সহস্র স্বতোবিরুদ্ধতার স্রোত প্রবল আবর্ত সৃষ্টি করে পাক খেতে লাগ্‌ল। কিন্তু রোমিওর আর একটু সাবধান হওয়া উচিত ছিল—এমন গোপনীয় কথা এরকমভাবে চিঠিতে লেখা উচিত হয়নি। এই দেখনা কেমন আমার হাতে পড়ে গেল! এখন যে ইচ্ছা করলে তোমাদের সব প্ল্যান মাটি করে দিতে পারি! তবে অনেকদিন থেকে দু'জনে চিঠি-পত্র চলছে। রমার ক্লাসে একটি ছোট ছেলে পড়তো তার নাম মিহির। এখন সুতপার মনে পড়লো সেই নামটি ধরে ডাকবার সময়ে রমার গলা এমন কাঁপতো কেন? নাঃ

মিহিরটা এমন নীচ? আর রমাই বা কি সাধু? যাই বলো এমন ডুবে-ডুবে জলখাওয়া মেয়ে দেখতে পারিনি। কিন্তু এমন লুকোচুরির কি প্রয়োজন ছিল? খোলাখুলি সকলকে বলে ক'য়ে কি তারা যেতে পারতো না? ঠেকাতো কে? তখনি আবার তার মনে পড়্‌ল—এমন গোপনীয়তার পথ বিচারের পথ নয়। সে স্পষ্ট রমার সর্বনাশ চোখের উপরে দেখতে পেলো। তখনি তার মনে হ'ল রমাকে এই সর্বনাশ থেকে বাঁচাতে হবে। আর মিহিরের প্রতিও কি তার কোন দায়িত্ব নেই? মিহির যে অন্যায় করতে যাচ্ছে—তার পথে বাধা রচনা করাই কি সুতপার কর্তব্য নয়? সুতপা যদি প্রকৃতিস্থ বুদ্ধিতে নিজের মনটাকে বিশ্লেষণ করতো তবে দেখতে পেতো রমা বা মিহির কারো প্রতি কর্তব্যেই সে উদ্বুদ্ধ হয়নি। দারুণ ঈর্ষায় তার মন আলোড়িত হচ্ছে। কিন্তু নিজের দুর্বলতা সে স্বীকার করবে কেন? তাই কর্তব্যবুদ্ধির খাতে নিজের ঈর্ষাকে প্রবাহিত ক'রে দিয়ে সে এক প্রকার আত্ম-প্রসাদের স্বাদ অনুভব করলো। নিজের ঈর্ষাকে স্বীকার করলে সে খাটো হয়ে পড়ত—অপরের প্রতি কর্তব্যের দায়িত্বে নিজেকে হঠাৎ মহৎ বলে মনে হ'ল। কিন্তু রমাকে বাঁচাবার উপায় কি? তাকে সব কথা খুলে বলবে? সুতপার তখনো এটুকু প্রকৃতিস্থতা ছিল যাতে সে বুঝতে পারলো এসব কথা এমন সময়ে এমন ভাবে খুলে বল্‌লে—কেউ বোঝে না, বুঝতে চায় না, বুঝতে পারে না! তাতে কোন ফল হবে না—বরঞ্চ উল্টো ফল হবে।

কিন্তু যেমন করেই হোক রমাকে বাঁচাতে হবে, তাতে মিহিরকেও বাঁচানো হবে। তখন অপর কেউ সুতপাকে দেখলে ভাবতো সে নিশ্চয় পাগল হবার মুখে। তার হাতের আঙুলগুলো বারম্বার চঞ্চল হ'য়ে উঠেছে—যেন অদৃশ্য কোন একটা বস্তুকে নিষ্পেষণ করছে, চোখ হ'য়ে উঠেছে লাল, কপালের শিরা প্রহৃত তন্ত্রীর মতো লাফাচ্ছে, চুল এলোমেলো, বক্ষের বিস্ফারণ-সঙ্কোচনে ব্লাউসটা কম্পিত। ভাগ্যিস বাড়ীতে তখন কেউ ছিল না—না চন্দনী, না রমা।

এমন সময়ে চন্দনী এসে ডাকলো, দিদিমণি ওঠো, জিনিস-পত্র গোছাতে হবেনি!

সুতপা তাড়াতাড়ি উঠে পড়ে চিঠিখানা বুকের ভিতর জামার ফাঁকে রাখলো এবং মুখে চোখে জল দিয়ে চেহারায় অনেকটা সুস্থভাব আনলো।

চন্দনী ঘরে ঢুকে অবাক্ হ'য়ে গেল—একি দিদিমনি এখনো তোমার জিনিসপত্র গোছানো হয়নি।

সুতপা বলল—আমি ঘুমিয়ে পড়েছিলাম, এখনি গুছিয়ে নিচ্ছি।

রমা ইস্কুল থেকে ফিরে এসে সুতপার জিনিসপত্র গোছানোতে সাহায্য করতে লেগে গেল। সুতপা স্থির করেছিল যে, এখন আর আলোড়নের পাকে নিজেকে ক্ষুব্ধ করবে না। তার সঙ্কল্প স্থির হ'য়ে গিয়েছে। সমস্ত সঙ্কল্পের মধ্যেই একটা শান্ত মহিমা আছে—সেই শান্তি তাকে ধৃতি দিয়েছে। জিনিসপত্র গুছিয়ে নিয়ে, হ্যাঁ, জিনিষপত্র সঙ্গে নিতেই হবে, সুতপা যাত্রার আয়োজন স্থির করে ফেল্‌ল। কিন্তু রওনা হ'বার এখনো অনেক দেরি—রাত দশটায় গাড়ি।

রমা শুধালো—সুতপাদি, কবে ফিরবে?

সুতপা বল্‌ল—বেশি দেরি হবে না। মনে মনে সে হাসলো—রমা জানে না যে, তার সমস্ত প্ল্যান সুতপার হাতের মুঠোর মধ্যে।

রাত্রের আহার সেরে নিয়ে, সুতপা আর একবার মনে মনে হাসলো, এত দুঃখের মধ্যেও তাকে আহারের ভান করতে হল! বিছানা সুটকেস একটা মুটের মাথায় চাপিয়ে সে স্টেশনে যাত্রা করলো। রমা সঙ্গে যেতে চেয়েছিল, সুতপা তাকে সঙ্গে নিল না! বাড়ির সমুখের দরজা বন্ধ ছিল। খিড়কি দরজা দিয়ে সে বেরিয়ে পড়ল। খিড়কির একটা চাবি চন্দনীর কাছে থাকে, সে আসে খুব ভোর বেলা, আর একটা চাবি থাকৃতো সুতপার কাছে।

সুতপা যখন স্টেশনে এসে উপস্থিত হ'ল—তখনো গাড়ির অনেক দেরি। সে সেকেণ্ড ক্লাস ওয়েটিং রুমে বিছানা রেখে একখানা আরাম কেদারায় গিয়ে বস্‌ল টিকিট কিনবার কোন তাগিদই অনুভব করল না। সেই নির্জন ওয়েটিং রুমে আবার সে নিজের অবস্থা ভাববার অবসর পেলো। বাইরে জনতার কোলাহল, গাড়ির শব্দ, লাল নীল আলো, সমস্তই যেন আর এক জগতের ব্যাপার। যে-নৌকো ডুবতে বসেছে তীরের চিহ্ন তার কাছে মরীচিকা ছাড়া আর কি! অনেকক্ষণ বসে থেকে সে বাইরে বেরিয়ে এলো। ম্লান জ্যোৎস্নার আলোয় আকাশ ও পৃথিবী রহস্যময়। সে প্ল্যাটফর্ম ছেড়ে নীচে নেমে রাস্তা ধরে চল্‌তে সুরু করল। কিছুক্ষণ চলবার পরে স্টেশনের সীমানা ছাড়িয়ে একটা শাল বনের মধ্যে এসে দাঁড়ালো। একদিকে এই শাল বন, ওপারে শহর, যে শহরের মধ্যে তার বাড়ি—মাঝখানে রেলপথ।

বনের মধ্যে একটা গাছের গুঁড়ি হেলান দিয়ে সুতপা বস্‌লো। মাটিতে গাছের ছায়া পড়েছে—কালো কালো ধ্বসে পড়া স্তম্ভশ্রেণীর মতো, কার কল্পনার ইন্দ্রপ্রস্থপুরী যেন ভূমিকম্পে ধ্বংস হ'য়ে গিয়ে ধূলোয় লুটোচ্ছে, সেই ধ্বংসাবশেষের

মায়ার মধ্যে বিমূঢ়ের মতো সুতপা বসে রইলো। শালের ফুল সবে ফুটতে সুরু করেছে—ক্ষীণ জ্যোৎস্নার সঙ্গে সেই ক্ষীণ সুগন্ধ অঙ্গাঙ্গিভাবে মিশ্রিত, চোখের জ্যোৎস্না আর ঘ্রাণের সৌরভ একেবারে এক হ'য়ে গিয়েছে; অবিরাম ঝিল্লির তালে তালে জোনাকিগুলো চমকাচ্ছে; হাওয়ায় শুকনো পাতা শিরশির করে নড়ছে, আর নিস্তব্ধতার আঁচলে বেষ্টিত সুতপা নিস্তব্ধ।

সুতপার মনে পড়লো ছেলেবেলায় তার মা সুতপা নামের ব্যাখ্যা করে বল্‌তেন—মেয়ে আমার আর জন্মে উমার মতো অনেক তপস্যা করেছিল, তাই নাম পেয়েছে সুতপা, এজন্মে বর পাবে মহাদেবের মতো। তার মনে হ'ল—মা থাকলে দেখতো তার কথাই সত্যি হ'তে চলেছে—সে মৃত্যুঞ্জয়কে ছাড়া আর কাউকে বরণ করবে না। একবার তার বিস্ময় বোধ হল—এই কি তার জীবনের শেষ রাত্রি! আর একটু পরেই কি তার অস্তিত্ব থাকবে না? তার জীবনের আশা আকাঙ্ক্ষা কি ছায়ার প্রাসাদের মতোই ধুলোয় লুটোবে না? যে প্রাণ-স্ফুলিঙ্গ মির্মিরিত হচ্ছে ওই জোনাকি-জালের মতো, কিছুক্ষণের মধ্যেই তা ওই জোনাকিগুলোর চেয়েও মিথ্যা হয়ে যাবে! জলমগ্নের অন্তিম দৃষ্টিতে পৃথিবী যেমন সুন্দর দেখায় তেমনি সুন্দর মনে হ'ল পৃথিবীকে। কিন্তু তৎসত্ত্বেও সে কেমন এক অনাস্বাদিতপূর্ব শান্তি অনুভব করলো। তখনি তার মনে হ'ল—মৃত্যুর উপকূলের এই শান্তি কি সেখানে আরও গভীর হয়নি।

হঠাৎ তার মনে হ'ল রাত্রি নিশ্চয় অনেক হয়েছে, বাতাস বেশ শীতল। সে একটা ঝাঁকুনি দিয়ে উঠে পড়লো। সে আর স্টেশনের দিকে গেল না—রেল লাইন পার হ'য়ে সোজা বাড়ির দিকে চল্‌ল। চারিদিক নির্জন, কল্‌কাতাগামী ট্রেণ অনেকক্ষণ চলে গিয়েছে। পথে লোক নেই, একটা কুকুর একবার ডেকে উঠে থেমে গেল, অদূরে রেলের ভারি আলো হাতে একটা লোক চলে গেল—আলোর গোলাকার দাগ পড়লো মাটিতে, বাতাসে টেলিগ্রাফের তারের শনশনানি, খটাৎ ক'রে শব্দ হ'য়ে সিগন্যালে আলোর রং বদলালো, অন্ধকারের লেবু ফুলের করুণ গন্ধ, চাঁদ প্রায় ডুবলো বলে'।

সুতপা এসে দাঁড়ালো তার বাড়ির খিড়কি দরজার সমুখে। কান পেতে শুনলো সাড়া শব্দ নেই। একবার পৃথিবী আর আকাশের দিকে তাকিয়ে নিয়ে খট্ করে তালা খুলে ভিতরে ঢুকলো, তারপরে দরজা দিল বন্ধ করে; তখন চাঁদ অস্ত গিয়েছে।

রমার এলার্ম ঘড়ি বেজে উঠল। রমা লাফিয়ে উঠে দেখে রাত্রি চারটা। হঠাৎ তার মনে পড়ল না, কেন এই জাগরণ। তারপরে ধীরে ধীরে যেন তার সব কথা মনে পড়তে লাগলো। সব তার গোছানোই ছিল—ছোটো একটা ব্যাগের ভিতরে টুকিটাকি পুরে নিয়ে উঠে দাঁড়ালো। একবার তপ্তশয্যা, বহুদিনের ঘরটির দিকে তাকিয়ে তার দীর্ঘ নিঃশ্বাস পড়লো। জানলার ফাঁক দিয়ে দেখলো—তখনো পূব আকাশে রঙ ধরেনি।

পা টিপে টিপে এসে সে দরজার খিল খুলে ফেলে ধাক্কা দিল, কিন্তু দরজা খুল্‌লো না। ঘুমের চোখে ছিটকিনি খুল্‌তে ভুলে গিয়েছে ভেবে খোলা ছিটকিনি আবার খুল্‌ল। আবার দরজায় ধাক্কা দিল—কিন্তু তবু দরজা খুল্‌ল না। এ আবার কি? ওদিক থেকে তবে কেউ কি দরজা বন্ধ করে দিয়েছে? তার মনে পড়লো কাল নিজে সে সুতপা ও চন্দনীকে বার ক'রে দিয়ে খিড়কি এঁটে দিয়েছে। তবে? আবার দরজায় ধাক্কা দিল। মনে হ'ল বাইরে থেকে কেউ যেন দরজা চেপে বসে রয়েছে। কে? তার শরীর কেঁপে উঠল। তার মিলনের অব্যবহিত এই মুহূর্তে বাধা এলো কোন্ সূত্র ধরে? নানা আশঙ্কায় তার মন চঞ্চল হ'য়ে উঠল। তার মনে পড়লো মিহির অপেক্ষা করছে স্টেশনের পথে—ভোরের আলো হবার আগেই ট্রেণে উঠতে হবে। এবারে সে প্রাণপণে ঠেলা দিল—দরজা ঈষৎ ফাঁক হ'ল। যাক্, তবে বাইরে থেকে কেউ দরজা বন্ধ করেনি, সে খানিকটা স্বস্তি অনুভব করলো। দরজা একটু ফাঁক হ'ল কিন্তু না খোলার কারণ বুঝতে পারা গেল না—বাইরে অন্ধকার। রমা টর্চের আলো ফেল্‌ল—কালো কালো ওকি? কোন রকমে আঙুল চালিয়ে অনুভব করলো—মানুষের চুল নাকি? না তা অসম্ভব। কিন্তু দরজা তো আর খোলে না! মনে হ'ল—কি যেন, কে যেন দরজা চেপে বসে রয়েছে। কি? কে? কেন? কিন্তু ভোর হ'বার আর বিলম্ব নেই—যেমন করেই হোক একটা ব্যবস্থা করতে হবে। সে মূঢ়ের মতো দরজা ঠেলাঠেলি করতে লাগলো—চুল খুলে গেল, কাপড় শিথিল হলো—কপাল থেকে তার ঘাম ঝর্‌তে আরম্ভ করল।

অনেক ঠেলাঠেলির পরে দরজা দু'চার ইঞ্চি ফাঁক হ'ল—তখন আকাশেও একটু আলো হয়েছে। রমার মনে হ'ল কে যেন প্রাণপণ শক্তিতে দরজা ঠেস দিয়ে বসে রয়েছে। তার কম্পিত কণ্ঠ থেকে প্রশ্ন হ'ল—কে? নিজের বিকৃত স্বরে সে নিজেই চম্‌কে উঠল। কে? উত্তর নেই। এবারে টর্চ ফেলতেই তার চোখে পড়লো শাড়ীর পাড়। পরিচিত শাড়ী। সুতপার শাড়ীর পাড়!—তবে

কি সুতপাদি সব জানতে পেরেছে? রমা সুতপার নাম ধরে ডাক্‌লো—কোন সাড়া নেই। এবারে ভালো ক'রে আলো ফেলতেই দেখতে পেলো সেই নারী মূর্তির ডান হাতে একখানা চিঠি, পাশে গড়াচ্ছে একটা ওষুধের শিশি। রমা মরিয়া হ'য়ে উঠেছে—এবারে ধাক্কা দিতে দরজার একখানা পাল্লা খুলে যেতেই একটি অসাড় নারীদেহ মাটিতে পড়ে গেল—রমা দেখল—সুতপার প্রাণহীন দেহ।

রমা একটা অর্ধস্ফুট শব্দ করে মূর্ছিত হ'য়ে পড়ে গেল। চৌকাঠের দু'দিকে দুই নারীদেহ লম্বিত, মৃতপ্রায় ও মৃত।

সুতপার সঙ্কল্প সার্থকতায় পৌঁছেছে, দুর্গতির হাত থেকে রমাকে রক্ষা করবার জন্যে সর্বনাশের দ্বার রুদ্ধ ক'রে সে আত্মবিসর্জন করেছে। রমা ও মিহিরকে সে বাঁচিয়েছে—কিন্তু নিজে বাঁচলো কি?

রত্নাকর

অতর্কিতে অকস্মাৎ সৌন্দর্য সরস্বতীর বাণাহত হইয়া নিরঞ্জন আবিষ্কার করিল প্রতিমা অপরূপ সুন্দরী। তাহার দৃষ্টিতে প্রতিমা অকস্মাৎ সৌন্দর্যের আদি-কবিতার মতো উদ্ভাসিত হইয়া উঠিল। হঠাৎ এমন হইতে গেল কেন? রত্নাকরের জীবনেই বা এমন হঠাৎ কাণ্ড কেন ঘটিয়াছিল? রত্নাকর কি তৎপূর্বে জীবহত্যা দেখে নাই? নিরঞ্জনও বহু নারী দেখিয়াছে, তাহাদের অনেকেই সুন্দরী, কিন্তু সে সৌন্দর্য তাহার চোখে ধরা পড়ে নাই। তবে আজ অকস্মাৎ কেন সে প্রতিমাকে সুন্দরী বলিয়া আবিষ্কার করিল জানি না। বোধ করি আবিষ্কারে ও অকস্মাতে কোথাও একটা নিগূঢ় যোগাযোগ আছে, বোধ করি আকস্মিকতাই আবিষ্কারের প্রাণ। বোধ করি সৌন্দর্য ও মানবহৃদয় একটা শুভদৃষ্টির অপেক্ষায় থাকে। রত্নাকরের শুভদৃষ্টি ঘটিয়াছিল তমসা নদীর তীরে, আর নিরঞ্জনের ঘটিল হাওড়া স্টেশনের সাত নং প্ল্যাটফর্মে। দুইয়ে কত প্রভেদ —তবু কত মিল।

নিরঞ্জন ও প্রতিমা পাশাপাশি বাড়ির ছেলেমেয়ে এবং দুইজনে সজ্ঞানে পরস্পরকে পনেরো বৎসরের বেশী দেখিয়াছে। এই দীর্ঘ সময়ের মধ্যে নিরঞ্জনের চোখে প্রতিমাকে কখনো সুন্দর বলিয়া মনে হয় নাই। সে প্রতিমাকে হাসিতে দেখিয়াছে, কাঁদিতে দেখিয়াছে, খেলিতে দেখিয়াছে, পড়িতে দেখিয়াছে, তাহাকে বাড়িতে দেখিয়াছে, ইস্কুলে দেখিয়াছে, সিনেমা এবং থিয়েটার অনেক স্থানেই দেখিয়াছে; কিন্তু কখনো তাহাকে সুন্দরী বলিয়া মনে হয় নাই। তাহাকে ফ্রক-পরা অবস্থায় এলিজাবেথীয় যুগ হইতে জর্জেট শাড়ী পরার জর্জীয় যুগ অবধি নানা অবস্থায় দেখিয়াছে কিন্তু প্রতিমা যে সুন্দরী তাহাতো কখনো তাহার মনে হয় নাই। বরঞ্চ তাহার ঈষৎ উন্নাসিক নাসা ও সিকি-ভগ্ন দাঁতটি লইয়া তাহাকে কতবার ঠাট্টা করিয়াছে। সে ঠাট্টায় প্রতিমা প্রথমে হাসিয়াছে, কিন্তু ঠাট্টার মাত্রা ছাড়াইয়া যাওয়াতে যখন তাহার চোখ দিয়া জল গড়াইতে সুরু করিয়াছে, তখন নিরঞ্জনের মনে হইয়াছে চোখ দু'টিও ত্রুটিশূন্য নয়—আর একটু টানা-টানা হইলে যেন দেখাইত ভালো। সেই প্রতিমা সুন্দরী। আর এই অপ্রত্যাশিত আবিষ্কারের স্থান কি না হাওড়া স্টেশন। হাওড়া স্টেশনের সাত নং প্ল্যাটফর্ম যে সৌন্দর্য লক্ষ্মীর পীঠস্থান এমন তো কোন শাস্ত্রে লেখে না। দিল্লী মেলের সেকেণ্ড

ক্লাস কামরা যে এমন করিয়া কালিদাসের তুলিবুলানো তাহা কে জানিত। এই প্রতিমাকে তো নিরঞ্জন সে বারে গিরিডির উশ্রী প্রপাতের পাথরছড়ানো তীরে চড়ি ভাতি রন্ধনে নিরত দেখিয়াছিল? কিন্তু তখন তো তাহাকে সুন্দরী মনে হয় নাই, বরঞ্চ আগুনের তাপে নাকের ডগাটি ঈষৎ রক্তিম হইয়া ওঠাতে উন্নাসিকতা আরও উগ্র হইয়া উঠিয়াছিল। আবার আর একদিন তাহাকে দেখিয়াছিল, আজও মনে পড়ে, কলিকাতার বাহিরে বিহারের আর একটি ছোট শহরে, কালবৈশাখীর বিদ্যুদ্দাম-বিশোভিত বর্ষণোন্মুখ আকাশের নীচে। সৌন্দর্য আবিষ্কারের সেইতো ছিল প্রশস্ত স্থান। শেষে কি না সৌন্দর্য ধরা পড়িল করোগেট টিনের ছাদের নীচে রেল গাড়ীর লোহার কামরায়? কিন্তু রত্নাকরের বাণী মূর্তিও তো আত্মপ্রকাশ করিয়াছিলেন কালো তমসার তীরে। তখনো তো সরস্বতী নদী মরুভূমিতে আত্মগোপন করে নাই। কুৎসিতের আসনেই সুন্দরের আবির্ভাব। লক্ষ্মীর বাহন পেচক।

নিরঞ্জনের এই অভিনব অনুষ্টুপমূর্তি দর্শনের পূর্ব ইতিহাস কি? রত্নাকরের পূর্ব জীবন না জানিলে তাহার ছন্দোলাভের গুরুত্ব বুঝিতে পারা সম্ভব নয়।

নিরঞ্জন ও প্রতিমাদের বাড়ি পাশাপাশি। দুই পরিবারের চেনা-শোনা তাহাদের দু'জনের জীবন ধারাতেও সংক্রামিত। প্রতিবেশী মাত্র বলিয়া তাহাদের পরিচয় দিলে মিথ্যা হয়, আবার আত্মীয় বলিলেও সত্য হয় না—সম্বন্ধটা এই রকমের। দু'জনকে খেলার সাথী বলা চলিত, যদি না নিরঞ্জন প্রতিমার কয়েক বছরের বড় হইত। প্রতিমা তাহাকে নিরঞ্জনদা বলে বটে, কিন্তু অদৃষ্টের পাশার আঘাতে ওই সম্বোধনটা উল্‌টিয়া যাওয়া কিছুমাত্র বিচিত্র নয়। কিন্তু অদৃষ্টের ও সম্বন্ধের এত সব সূক্ষ্ম রহস্য তাহাদের কখনো মনে উদিত হয় নাই, তাহাদের কাহিনী রচয়িতাকেই এই সব জটিল জাল এড়াইয়া পথ করিতে হইতেছে।

তাহারা দু'জনে দুই ইস্কুলের পথ বাহিয়া চলিতে লাগিল। তাহাদের পাঠ্যজীবনের মধ্যযুগের শেষে যখন পুনরায় যবনিকা উঠিল, দেখা গেল প্রতিমা সংস্কৃত শাস্ত্রে অনার্স লইয়া বি-এ পাশ করিয়াছে, আর তাহার কয়েক বছর আগে ফুটবল খেলার গৌরবে নিরঞ্জন মোটা মাহিনায় এক রেল কোম্পানীর চাকুরীতে অধিষ্ঠিত। বি-এ পাশ করিবার কিছুদিনের মধ্যেই প্রতিমা বিহারের একটি ইস্কুলের প্রধানা শিক্ষয়িত্রীর পদ পাইল।

আজ প্রতিমার কর্মস্থলে যাত্রার দিন। তাহার মাতা নিরঞ্জনকে বলিলেন—বাবা তুমি যদি গিয়ে মেয়েটাকে গাড়ীতে তুলে দিয়ে আসো।

নিরঞ্জন বলিল—মাসিমা, আজ যে আমার খেলা আছে। এ খেলা খেলা নয় মাসিমা, চাকুরী ; অনুপস্থিত হ'লে বড় সাহেব যা বল্‌বে তা মাসির সম্মুখে উচ্চারণ করবার মতো নয়।

তারপরে সে প্রতিমার দিকে চাহিয়া বলিল—শনিবারে রওনা হও না কেন, আমি সঙ্গে গিয়ে পৌঁছে দিয়ে আসবো।

মাতা একবার মেয়ের দিকে তাকাইলেন, মেয়ে বলিল—কাল join করবার তারিখ—আজই রওনা হ'তে হবে।

মাতা ঘুরিয়া নিরঞ্জনের দিকে তাকাইলেন। নিরঞ্জন অদৃশ্য বড় সাহেবের দিকে তাকাইয়া বলিল—বড়ই মুস্কিল।

প্রতিমা বলিল—মুস্কিল আবার কি। আমি একাই যেতে পারবো।

তাহাই স্থির হইল। সে পাড়ার অন্য কাহাকেও সহায় করিয়া স্টেশনে গিয়া গাড়ীতে উঠিবে। নিরঞ্জনের মুখ দেখিয়া মনে হইল যে, বিপক্ষ দলের গোলরক্ষককে বিপর্যস্ত করিয়া নিজের সুনাম রক্ষা করিবার আজ তাহার কিছুমাত্র সম্ভাবনা নাই।

বিখ্যাত খেলোয়াড় নিরঞ্জন তিনটা অফসাইড গোল ও দুইটি সেম-সাইড গোল দিয়া যখন বাসায় ফিরিল তখনো সন্ধ্যা হয় নাই। প্রতিমাদের বাড়িতে ঢুকিয়া সে শুধাইল—মাসিমা, প্রতিমা রওনা হ'য়ে গিয়েছে ?

প্রতিমার মা বলিলেন—এই যে বাবা এসেছ। বড় ভালো হ'য়েছে। মেয়েটা সাত তাড়াতাড়িতে এই ব্যাগটা ফেলে গিয়েছে—যদি স্টেশনে পৌঁছে দিয়ে এসো।

ব্যাগ লইয়া নিরঞ্জন স্টেশনে ছুটিল। এই সময়ে প্রতিপক্ষের গোলকিপার তাহার সম্মুখে পড়িলে, আর শুধু গোলকিপার কেন, সে একাই এখন বিপক্ষের একাদশ অক্ষৌহিণীর মোহাড়া লইতে পারে।

হাঁপাইতে হাঁপাইতে, ভাবিতে ভাবিতে, খুঁজিতে খুঁজিতে এবং মনে মনে বড় সাহেবের পিত্রন্তু করিতে করিতে নিরঞ্জন আসন্নযাত্রা দিল্লী মেলের একটি সেকেণ্ড ক্লাসের কামরায় প্রতিমাকে আবিষ্কার করিয়া ফেলিল। নিরঞ্জন জানলা দিয়া ব্যাগটা গলাইয়া দিয়া বলিল—এই নাও ব্যাগ। তারপরে নিজেও ঢুকিল। যে লোকটি তাহাকে তুলিয়া দিতে আসিয়াছিল, সে চলিয়া যাইবার পরে প্রতিমা আবিষ্কার করিয়াছিল যে, ব্যাগটা ফেলিয়া আসিয়াছে। প্রথম বিদেশ যাত্রার শঙ্কার সঙ্গে অনুপস্থিত ব্যাগের অভ্যন্তরের অত্যাবশ্যক দ্রব্যগুলির বিরহ মিশ্রিত হইয়া তাহার মনে যে জটিল কুয়াশার উদয় হইয়াছিল ব্যাগের আবির্ভাবে তাহা

লঘু হইয়া গেল এবং যেটুকু থাকিল তাহার উপরে নিরঞ্জনের উপস্থিতির আনন্দ প্রতিফলিত হইয়া এক রঙীণ আবেশের সৃষ্টি করিয়া তুলিল।

মেয়েদের কামরা। যতগুলি মেয়ে, তার চেয়ে অনেক বেশী ছেলেমেয়ে এবং এই সম্মিলিত সংখ্যার চেয়েও অনেক বেশী পোঁটলা পুঁটলি, তোরঙ, বিছানা, বাক্স, ব্যাগ, ডালা, কুলা, ধামা, কুঁজো প্রভৃতির অন্তহীন শ্রেণী ও অভ্রভেদী স্তূপ। তাহারি একান্তে, বাক্স-পেঁটরার উপত্যকার অতি সঙ্কীর্ণ স্থানে তপশ্চারিণী অপর্ণার মতো ন-যযৌ ন-তস্থৌ প্রতিমা দণ্ডায়মানা। গাড়ীর বারো আনা দখল করিয়া এক সরাওগী পরিবার আত্মপ্রতিষ্ঠা করিয়াছে। রাষ্ট্রভাষার আলাপের সহিত ছেলেমেয়েদের কান্নার বিলাপ যুক্ত হইয়া এক প্রলাপের সৃষ্টি হইয়াছে। সরাওগী পরিবারের পুরুষগণ প্রতিমাকে কোণ-ঠাসা করিতে করিতে প্রায় তাহার দমবন্ধের যোগাড় করিয়া তুলিয়াছে—সহায় সম্বলহীন প্রতিমা নতমুখী দণ্ডায়মানা, আর নীলাভ আলো তাহার স্বেদোজ্জ্বল, শিথিল বেণী, শঙ্কিত-সুকুমার মুখমণ্ডলে এক মায়ারসায়ন বিস্তার করিয়া দিয়াছে। সেই মুহূর্তে সেই বহুবার দৃষ্ট অথচ অদৃষ্টপূর্ব নারীমূর্তি দেখিয়া চৈত্রের প্রথম বিদ্যুৎ আভাসের মতো নিরঞ্জনের মনে ঝলক দিয়া উঠিল—প্রতিমা সুন্দরী। না, তাহার চেয়েও অধিক। সে প্রতিমাকে উপলক্ষ্য করিয়া স্বয়ং সৌন্দর্যকেই যেন আবিষ্কার করিয়া বসিল। ওই যে বেপথুমতী মূর্তি, ওই যে তন্বী রমণী, ওই যেন তাহার তমসার হৃদয়-বিদীর্ণ 'মা নিষাদ ত্বমগমঃ।' ওই যেন তাহার বেদনার বক্ষোদ্ভূত আনন্দের ঋক্।

ঠিক এইভাবেই, এই ভাষাতেই যে এই কথাগুলি তাহার মনে হইয়াছিল নিশ্চয় তাহা কেহ মনে করেন না। এমন হয় না, হওয়া সম্ভবও নয়, সেইজন্যই তো শিল্পের ও শিল্পীর আবশ্যক। নিরঞ্জন যদি ফুটবল খেলোয়াড় না হইয়া শিল্পী হইত তাহা হইলে সে যেভাবে আত্মপ্রকাশ করিত আমরা তাহাই করিতেছি মাত্র। তাহার বকলমে আমরা লিখিয়া যাইতেছি।

নিরঞ্জনের প্রতিমাকে যে কেবল সুন্দরী বলিয়া মনে হইল তাহা নয়, তাহার মনে হইল, সৌন্দর্য বলিতে যাহা বোঝায় প্রতিমা তাহাই, তাহার মনে হইল সৌন্দর্যের অপর নাম প্রতিমা। শরতের সন্ধ্যাকাশের অলৌকিক আভা উপছিয়া পড়িয়া যেমন পৃথিবীকে সুন্দর করিয়া তোলে, গাছের মাথা, পাহাড়ের চূড়া, জলাশয়ের কিনারা, ঘাসের ডগাটি ও মানুষের মুখে সেই দীপ্তিতে এক অপরূপতা লাভ করে, প্রতিমার সমস্ত সত্তা হইতে এক অপূর্ব রসায়ন বিকীরিত হইয়া পারিপার্শ্বিককে ঠিক তেমনি এক প্রকার দিব্যমূর্তি দান করিয়াছে। গাড়ীর

কামরার গদি-আঁটা মলিনতা, বিচিত্র পর্যায়ের জিনিষপত্র, কোলাহলরূপী ওই সরাওগী পরিবার—সমস্তই তাহাদের নিত্যকার তুচ্ছতা বর্জন করিয়া যেন এক সৌন্দর্যপ্রলেপ পাইয়াছে। প্রতিমার অনামিকার স্বর্ণাঙ্গুরীয়কের ঘনরক্ত চুণির টুকরা হইতে কি এক দৈব আভা যেন বিচ্ছুরিত হইতেছে। ওই যে প্ল্যাটফর্মের এঞ্জিন-উদ্গত বাষ্প—তাহা যেন আর ধূমজ্যোতি সলিলকণার ষড়যন্ত্র মাত্র নয়—কোন্ অপ্সরীর চেলাঞ্চল প্রান্ত বাতাসে বিকম্পিত। স্টেশনের কোলাহলের হাজার রকম সুর ও স্বর, যেন বিচিত্র তন্তুতে বোনা একখানি অমূল্য কিঙ্খাব। আবার ওই যে লালবাতি নীল হইয়া গিয়া আসন্ন বিদায়কে স্মরণ করাইয়া দিল, তাহার মূলে কি একটি কলের চাবির ইঙ্গিত? কখনই না। কত লক্ষ্য কোটি বৎসরের অভাবনীয় কার্যকারণ শৃঙ্খলের শেষপ্রান্ত ওই বালির গোড়ায় আসিয়া ঠেকিয়াছে। নিরঞ্জন পরম বিস্ময়ে নির্বাক হইয়া গেল। কিম্বা চিন্তার শক্তিও যেন তাহার লোপ পাইয়াছিল। সে নিতান্তই যন্ত্রচালিত মূঢ়ের মতো চলাফেরা করিতে লাগিল। এমন কি গাড়ী ছাড়িয়া দিলে প্রতিমাকে ভালো করিয়া একবার সে সম্ভাষণ জানাইতেও পারিল না।

শূন্যট্রেণ প্ল্যাটফর্মে দাঁড়াইয়া এক প্রকার অননুভূতপূর্ব গভীর বিষাদে তাহার চিত্ত ভরিয়া গেল। সে কিছুতেই বুঝিতে পারিল না—এই বিষাদের হেতু কি? প্রতিমার বিদায়ই কি এই বিষাদের কারণ? তাহাকে বিদায় সম্ভাষণ জানাইতে ভুলিয়া গিয়াছে বলিয়াই কি তাহার বিষণ্ণতা? কিম্বা সুন্দরী প্রতিমাকে সে কখনো পাইবে না বলিয়াই তাহার দুঃখ? অথবা এমন যে দিব্য সৌন্দর্য তাহা ক্ষণস্থায়ী, প্রতিমার দেহে এক সন্ধ্যার পথিকের মতো আশ্রয় লইয়াছে, আর কয়েক বৎসর পরেই চিরকালের মতো তাহা অন্তর্হিত হইবে বলিয়াই এই বিষাদ? সে কিছুই বুঝিয়া উঠিতে পারিল না। কোন্‌টা যথার্থ কারণ জানি না, শুধু এইটুকু জানি যে, যথার্থ সৌন্দর্যের মধ্যে এক প্রকার অবর্ণনীয় বিষাদ নিহিত, শুভ্র সুকুমার সৌন্দর্যের সারভূত তাজমহলের অভ্যন্তরে যেমন সুন্দরী মমতাজের মৃতদেহ সমাহিত। একবার সে যে-অন্ধকারে প্রতিমার ট্রেণ অন্তর্হিত হইয়াছে সেই দিকে তাকাইল। সূচীভেদ্য-তমিস্রার মধ্যে গার্ডের গাড়ীর পিছনকার লাল বাতিটি প্রতিমার অঙ্গুরীয়কের চুণির টুকরার মতো দীপ্যমান, আর কোথাও কিছু নাই। সে দৃষ্টস্বপ্ন ব্যক্তির মতো স্টেশনের বাহিরে আসিয়া দাঁড়াইল। আজ তাহার একি অভাবিত অভিজ্ঞতা। বাঙলাদেশে এত গুণী জ্ঞানী ধ্যানী শিল্পী থাকিতে সৌন্দর্যলক্ষ্মী এই ফুটবল খেলোয়াড়ের চোখেই কেন প্রতিভাসিত

হইতে গেলেন? পুরাকালে এদেশে মুনি ঋষি কবি ও পুণ্যাত্মার তো অভাব ছিল না। তবে ছন্দলক্ষ্মী কেন দস্যু রত্নাকরের ধ্যানের দ্বারাই আপনাকে আবিষ্কৃত করিলেন? প্রজ্ঞাবানেরা যাহার উত্তর দিতে পারেন নাই আমি তাহার কি চেষ্টা করিব?

মাতৃভক্তি

শাস্ত্রে আর মানুষে কেমন যেন চিরদিনের একটা আড়াআড়ি। শাস্ত্রের উপদেশ এক, মানুষে করে আর। শাস্ত্র বলে মিথ্যা কথা বলা উচিত নয়; মিথ্যা বলিতে মানুষের বড় আনন্দ; শাস্ত্র বলে পরদ্রব্য লোষ্ট্রের মত দেখিবে, মানুষ পরদ্রব্যকে লোষ্ট্রের মতো কুড়াইয়া লয়; শাস্ত্রে জননী জন্মভূমিকে স্বর্গের চেয়েও গরীয়সী বলিয়াছে ওদিকে পরশুরাম মাতৃহত্যা করিয়া পিতৃভক্তির পরাকাষ্ঠা দেখায়। ফলকথা শাস্ত্রে আর মানুষে চিরন্তন দ্বন্দ্ব—এ দ্বন্দ্ব বোধ করি ঘুচিবার নয়। আর যদি সত্যই কোন দিন ঘুচিয়া যায়—সংসার কি নীরস-ই না হইয়া পড়িবে?

শাস্ত্রে ও মানুষে এই বিরোধের কারণ কি? মানুষের স্বভাবের মধ্যেই কি বিরোধের হেতু নিহিত, না সংসারের স্বভাবের মধ্যেই তাহার স্থান? কিম্বা দুই দিকের ঘাত-প্রতিঘাতে এই দ্বন্দ্ব পরিস্ফুট হইয়া ওঠে? তত্ত্বালোচনার স্থান ইহা নয়—আর সাধ্যও আমাদের নাই—সে ভার পণ্ডিতদের উপরে ছাড়িয়া দিয়া—আমরা একটি গল্প বলিতে চেষ্টা করিব মাত্র।

এখন হইতে চল্লিশ বৎসর পূর্বে বিহারের কোন শহরে প্রতিদিন সকাল বেলায় মাতা ও পুত্রকে বেড়াইতে দেখা যাইত। পুত্রের বয়স পাঁচ, ছয়; মাতার বয়স ত্রিশের নিচে। যে বাড়িতে ইহারা থাকিত তাহার সম্মুখে একটি মাঠ ছিল। খুব ভোর বেলা উঠিয়া মাতা ও পুত্র এই মাঠে বেড়াইত। শীত গ্রীষ্ম বা বর্ষা বলিয়া তাহাদের প্রাতর্ভ্রমণের কোন ব্যতিক্রম কখনো ঘটে নাই। যখন তাহারা বেড়াইতে বাহির হইত পাড়ায় তখনো কেহ ওঠে নাই, তাহারা যখন ফিরিতেছে প্রাতর্ভ্রমণকারীর দলের তখন বাহির হইবার পালা। ভ্রমণকারীর দল হন্ হন্ করিয়া ছুটিয়া চলিয়াছে, চায়ের পূর্বে ফিরিতে হইবে—কিন্তু ইতিমধ্যে নির্দিষ্ট দূরত্ব অতিক্রম না করিলে নিরুপায়, কাহারো বাজেট এক মাইল, কাহারো দেড় মাইল, যাহার ডাক্তারের যেমন উপদেশ। এই সব ভূতগ্রস্তদের মধ্যে পেন্সনধারীর সংখ্যাই অধিক। বাড়িতে যে একটু আরামে ঘুমাইবে সে সুবিধা তাহাদের নাই; স্ত্রী, পুত্র বা কন্যাগণ ঠেলিয়া তুলিয়া দিয়াছে, ভোরের হাওয়ায় ফুসফুস-জোড়া সতেজ হইলে তবে তো পেন্সনের জের টানিয়া বাঁচিয়া থাকা সম্ভব হইবে।

তারপরে তিনি বলিলেন—ওষুধ তো পরের কথা—এখন রোগীকে পুষ্টিকর খাদ্য দেওয়া চাই।

—কি কি দিতে হবে?

ডাক্তার বলিয়া চলিল—ছানা, মাখন, দুধ, ঘি—বিধবা মানুষ কাজেই মাছ মাংস চলবে না, কিন্তু একটু করে 'বভরিল' দেওয়া যেতে পারে; তাছাড়া পেস্তা, বাদাম, কিসমিস অবশ্যই দিতে হবে। পুষ্টিকর খাদ্য দিয়ে রোগীকে সবল করে রাখতে পারলে তবে তো চিকিৎসা!

খুদিরাম শুধাইল—চিকিৎসার খরচ কি রকম?

ডাক্তার বলিল—এসব ব্যারামের চিকিৎসা ব্যয়সাধ্য বই কি! তবে কি না আমি আছি।

অর্থাৎ তুমি ব্যস্ত হইয়া যেন অন্য ডাক্তার ডাকিয়া বসিও না। এই উপলক্ষ্যে আমিই তোমার পকেট মারিবার ভার লইলাম।

ডাক্তার চলিয়া গেলে খুদিরাম পুষ্টিকর খাদ্য ও তাহার মূল্যের হিসাব করিয়া মোহগ্রস্তের মত বসিয়া রহিল। পুষ্টিকর দ্রব্যগুলির নাম সে শুনিয়াছে বটে তবে অধিকাংশই দীর্ঘকাল অনাস্বাদিত। তাহার জীর্ণ আয়ের হরধনুকে ব্যয়ের গুণ পরাইতে গেলে যে ভাঙিয়া পড়িবে তাহাতে তাহার অণুমাত্র সন্দেহ থাকিল না।

তৎসত্ত্বেও মাতার চিকিৎসার অর্থাৎ ঔষধ পথ্যের জন্য খুদিরামকে উদ্যোগী হইতে হইল। তাহার সাধ্য হোক আর সাধ্যাতীত হোক মাতার চিকিৎসার জন্য তাহাকে ঋণ করিয়াও ব্যয় করিতে হইবে। শাস্ত্র, সমাজ এবং লোকাচার সমস্তই এই ব্যবস্থার অনুকূলে। আমরা সত্য কথাই বলিব, খুদিরামের এতখানি করিবার ইচ্ছা ছিল না, কারণ সাধ্য ছিল না—যে-ঋণ কখনো সে শুধিতে পারিবে না সে-ঋণ জানিয়া শুনিয়া কেন সে করিতে যাইবে? তাহার সাধ্যমত চিকিৎসা করাই কি তাহার কর্তব্য নহে? তদতিরিক্ত করা কি তাহার পক্ষে অন্যায় নহে? কিন্তু এ সব কথা কেবল নিজের মনেই চিন্তা করা চলে, লোক-সমক্ষে প্রকাশ্য নহে। অনেকে বলিবেন—ইহা নিজের মনেও চিন্তার যোগ্য নহে। হোক বা না হোক খুদিরামের মনে এসব চিন্তা উদিত হইত বলিয়া কেহ তাহাকে কুপুত্র বলিলে আমরা তাহার সহিত একমত নহি। সংসারে আর দশ জন পুত্রের চেয়ে মাতৃভক্তিতে খুদিরাম যে নিম্নতর ধাপের—এ কথা আমরা স্বীকার করিতে প্রস্তুত নহি।

একদিকে বৃদ্ধা মুমূর্ষু জননীর ভোগে ছানা, মাখন, পেস্তা, বাদাম, দুধ, ঘি-র মাত্রা যতই বাড়িতে লাগিল খুদিরামের সংসারের অন্যান্য সকলের আহার্য হইতে মাছ, তরিতরকারি, তেল-নুনের মাত্রা ততই হ্রাস পাইতে থাকিল।

মাতার চিকিৎসা ও পথ্যের বহর দেখিয়া পাড়ার সবাই বলিত—হাঁ, মাতৃভক্তি একেই বলে। শুনিয়া খুদিরাম মনে মনে গজরাইত। তাহার অদৃষ্ট হাসিত। সেদিনকার প্রাতর্ভ্রমণকারীর দল থাকিলে আজ কি বলিত!

যদি জিজ্ঞাসা করো এমন অসঙ্গত ভাবোদয় খুদিরামের মনে কেন হইল? তবে বলিব, শুধু খুদিরামের নয়, অনুরূপ ক্ষেত্রে অধিকাংশ লোকেরই মনে এইরূপ চিন্তাস্রোতে প্রবাহিত হইয়া থাকে। তবে খুদিরাম ধরা পড়িল এইজন্যে যে, সে একজন সাহিত্যিকের হাতে পড়িয়া গিয়াছে।

আবার যদি জিজ্ঞাসা করো যে, কেন এমন কথা মনে উদিত হইয়া থাকে—তবে আমি কোন উত্তর না দিয়া খুদিরামের মুখমণ্ডলে চল্লিশ বৎসরের অর্থ-নৈতিক সংগ্রামের যে চিহ্ন অঙ্কিত হইয়া গিয়াছে তাহার দিকে তোমাকে তাকাইয়া দেখিতে বলি; তাহার বাসস্থানের অস্বাস্থ্যকরতা ও পোষাক-পরিচ্ছদের জীর্ণতার দিকে একবার তাকাইতে বলি; অফিসে তাহার যে ঋণ হইয়াছে যাহার ফলে বহুকাল হইল পূরা বেতন সে পায় নাই—এবং আর কখনো যে পাইবে সে ভরসাও নাই, সে কথা চিন্তা করিতে বলি; অফিসের নিকটে যে বলিষ্ঠ কাবুলিওয়ালা বসিয়া থাকে তাহার বলিষ্ঠতর বংশদণ্ডের কথা ভাবিতে বলি; তাহা ছাড়া, পরিচিত, অর্ধ-পরিচিত, বন্ধুবান্ধবের কাছে ঋণ ও হাওলাতের শতছিদ্র ঝাঁঝরিখানার কথা কল্পনা করিতে বলি। এইবার বুঝিতে পারিবে তাহার মাতৃভক্তিতে ভাঁটা পড়িবার কারণ। ভক্তি বল, স্নেহ বল, কিছুই অর্থ-নিরপেক্ষ নয়। দরিদ্র যে ধনীর চেয়ে হৃদয়বৃত্তিতে অধিকতর কঠিন তাহা নয়—কেবল তাহার কোমলতা প্রকাশের সুযোগের অভাব!

এই অর্থনৈতিক কুরুক্ষেত্রে সপ্তরথী-পরিবেষ্টিত যুধ্যমান খুদিরামের মনে চল্লিশ বৎসর আগেকার সেই সুখের স্মৃতি এক একবার উদিত হইয়া তাহার দীর্ঘনিশ্বাস পড়িত, তাহার চোখ ছলছল করিয়া আসিত। সে ভাবিত—আহা সেই তো বেশ ছিল! তাহার বড়ই দুঃখ হইত। পাঠক, আমাদেরও দুঃখ হয়। কিন্তু কি করিব—ইহাই সংসারের প্রকৃতি।

অন্নকষ্ট

রায় বাহাদুর অন্নদা মুস্তফী অন্নকষ্টে পড়িয়াছেন। রায় বাহাদুর দরিদ্র নন—বরঞ্চ তাঁহাকে ধনী বলাই উচিত। কলিকাতার উপরে তাঁহার পাঁচখানা বাড়ী—গোটা দুই বস্‌তি, খান চার পাঁচ মোটর গাড়ী, ব্যাঙ্কে স্বনামে বেনামে বহু টাকা, সিন্দুকে বোধ করি ততোধিক, দেশে জমিদারী, দেহে মেদ ও মগজে বুদ্ধি—ধনীর প্রায় সবগুলি লক্ষণই তাঁহাতে বিরাজমান। তৎসত্ত্বেও সত্য সত্যই তাঁহার আজ অন্নকষ্ট উপস্থিত। জানি আপনারা বিশ্বাস করিতেছেন না—কিন্তু আপনাদের দোষ দিই না, কারণ কথাটা আমিও প্রথমে বিশ্বাস করি নাই। অবশেষে প্রত্যক্ষদর্শীর সাক্ষ্যে এবং ডাক্তারের সার্টিফিকেট দেখিয়া স্বীকার করিতে বাধ্য হইলাম যে, রায় বাহাদুর সত্য সত্যই অন্নকষ্টে পতিত।

খবরটা বিস্ময়জনক সন্দেহ নাই—কিন্তু ততোধিক বিস্ময়জনক ইহার বিপরীত খবরটা। অন্নদা মুস্তফী যখন দরিদ্র ছিলেন (অবশ্য তখন রায় বাহাদুরও ছিলেন না) তখন তাঁহার অন্নকষ্ট ছিল না। তখন তাঁহার দরিদ্রের যোগ্য আর সব কষ্টই ছিল—কেবল এক অন্নকষ্ট ব্যতীত। আজ তাঁহার অর্থের অভাব নাই বটে কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে এ কি অনর্থপাত! যে-অর্থ আর সকলের ক্ষেত্রে অন্নকষ্ট দূর করে সেই অর্থ ই তাঁহাকে অন্নকষ্টে ফেলিয়াছে।

পাঠক, তুমি হয় তো ভাবিতেছ যে এমন ধনীর অন্নাভাব ঘটিল কি করিয়া? কিন্তু আমি তো অন্নাভাব বলি নাই—অন্নকষ্ট মাত্র বলিয়াছি। তবে কি অন্নাভাব ও অন্নকষ্ট এক বস্তু নয়? সব সময়ে নয়। অন্নাভাব ঘটে দরিদ্রের—আর ধনীদের ভাগ্যে অনেক ক্ষেত্রেই অন্নকষ্ট ঘটিয়া থাকে। অন্নদা-বাবুর অন্নের অপ্রতুল হয় নাই—কেবল সেই অন্ন গ্রহণ করিবার ক্ষমতা তাঁহার আজ অন্তর্হিত। ডাক্তারে বলিয়াছে আহার বিষয়ে রায় বাহাদুরের সামান্য একটু অসংযম ঘটিবে কি অমনি তাঁহার মৃত্যু অনিবার্য। কারণ শিবের জটায় সর্পের মতো মারাত্মক মাত্রায় 'ব্লাডপ্রেশার' রায় বাহাদুরের মাথায় ফণা তুলিয়াই আছে; আর মেদের বেষ্টনী শরীরে এমন পুরু যে হৃৎপিণ্ডের দব্‌দবানি বিচক্ষণ-তম চিকিৎসকের পক্ষেও ধরা কঠিন। কাজেই আহার-সংযমী রায় বাহাদুর দুপুর বেলায় মাগুর মাছের ঝোল দিয়া এক ছটাক সরু চাউলের ভাত খান;

রাতের বেলায় শুধু সাগু বা বার্লি! ইহাই রায় বাহাদুরের অন্নকষ্টের স্বরূপ। ইহা অন্নাভাবের কষ্ট না হইলেও—অন্নকষ্ট তাহাতে আর সন্দেহ কি? না থাকিলে না খাওয়া আর থাকা সত্ত্বেও না খাওয়ার মধ্যে কোন্‌টা অধিক দুঃখ-জনক? রায় বাহাদুর বলিলেন—তাঁহারটাই!

কিন্তু আগেই বলিয়াছি এমন অন্নকষ্ট তাঁহার বরাবর ছিল না। তখন সামান্য যাহা জুটিত তিনি খাইতে পারিতেন। তখন তাঁহার ওজন দেড় মণের কাছে ছিল—আর এখানকার মেদ-মেদুর দেহের অধিকাংশ চর্বি তখন ক্ষীর-সর-নবনীত ও সন্দেশাদি আকারে দোকানে ও গোপগৃহে সজ্জিত ছিল। আর মগজের বুদ্ধি তখনও আত্মবিকাশ করিবার অবকাশ পায় নাই।

এমন সময়ে মহাযুদ্ধ আলাদিনের প্রদীপ হাতে করিয়া বিশ্ববাসীর সম্মুখে আসিয়া উপস্থিত হইল। সেই প্রদীপটি কাড়িয়া লইবার জন্য ঘুঁটে-ওলা হইতে আরম্ভ করিয়া রাষ্ট্রনায়কদের মধ্যে সে কি মারামারি! দীর্ঘকালের জন্য প্রদীপটি কেহ পায় না। কেহ এক রাত্রির জন্য পাইল, কেহ এক মাসের, কেহ বা দুই মাসের জন্য! যার হাতে পড়িল সে-ই এক ঘষা মারিয়া ধন-দৌলতের অগ্নিশিখা প্রজ্জলিত করিল। অন্নদাবাবুর হাতেও দু'চার দিনের জন্য প্রদীপটি আসিল। তিনি নিপুণহস্তে প্রদীপ ঘষিয়া ঐশ্বর্যের দাবানল জ্বালাইয়া তুলিলেন। সেই দাবানলের দীপ্তিতে তাঁহার রাত্রের নিদ্রা আগেই গিয়াছিল—এখন সেই দাবা-নলের অগ্নি জঠরাগ্নিরূপে তাঁহাকে নিরন্তর দগ্ধ করিতেছে—তিনি অন্নকষ্টে ভুগিতেছেন।

যখন যুদ্ধ বাধিবার সংবাদ অনেকের মাথায় বজ্রের মতো পড়িল, অন্নদাবাবুর মাথায় পড়িল একটি টিকটিকি। উক্ত সরীসৃপ তাঁহার মাথায় পড়িয়াই তিনবার টিক টিক শব্দে ডাকিয়া উঠিয়া এক লাফে ঘরের মেঝেতে পড়িয়া প্রস্থান করিল। অন্নদাবাবু জানিতেন টিকটিকি মাথায় পড়িয়া ডাকিলে রাজযোগ উপস্থিত হয়—কিন্তু জন্তুটার রং ঈষৎ রক্তাভ হওয়া দরকার। তিনি টিকটিকির পেটের রং পর্যবেক্ষণ করিবার জন্যে তাহার পিছন পিছন ছুটিলেন, কিন্তু অবাধ্য সরীসৃপ ঘরের নর্দমায় ঢুকিয়া পড়িল। অন্নদাবাবু ভিতরে উঁকি মারিলেন, টিকটিকিটাকে দেখিতে পাইলেন না—কিন্তু কি একটা বস্তু চকচক করিয়া উঠিল? সেটাকে বাহির করিয়া তিনি দেখিলেন একটি গিনি! অন্নদাবাবু বিস্মিত হইয়া বসিয়া পড়িলেন, মুখে তাহার রা সরিল না। বিস্ময়ের ধাক্কা ভাঙিলে তিনি গিনিটি কপালে ঠেকাইয়া উঠিয়া পড়িলেন। সেই মুহূর্ত হইতে তাঁহার বিশ্বাস জন্মিল

যে যুদ্ধ তাঁহার কাছে আলিবাবার স্বর্ণগহ্বরের দ্বার খুলিয়া দিবার জন্যই সমুপস্থিত!

বাস্তবিক যুদ্ধ সম্বন্ধে অধিকাংশ লোকেরই কি এইরূপ ধারণা নয়? তাহাদের কাছে হিট্‌লার, বৃহত্তর জার্ম্মানী, ফ্যাসীবাদ, সাম্রাজ্যবাদ—সবই মায়া, সবই অলীক। তাহাদের কাছে যুদ্ধের একমাত্র সার্থকতা—তাহাদের ভাগ্য পরিবর্তন! একদিকে লক্ষ লক্ষ লোক মরিল, আর একদিকে লক্ষ লক্ষ লোক ফাঁপিল; একদিকে দুঃখ, আর একদিকে ঐশ্বর্য; একদিকে ধ্বংস, আর একদিকে নূতন নূতন বাড়ী ওঠা; কত লোক শীর্ণ হইল আর তৎপরিবর্তে কতলোক স্থূল হইল, কতলোকের অন্নাভাব—আর অন্নদাবাবুর মতো কত লোকের যে অন্নকষ্ট তাহার আর ইয়ত্তা নাই! 'কনসারভেশন অব্ এনার্জি'র একেবারে চরম উদাহরণ।

যুদ্ধের আগে অন্নদাবাবু চাকরি-হাটায় হাঁটাহাঁটি করিতেন। যুদ্ধ লাগিলে তিনি অন্যান্য ভাগ্যান্বেষীর মতো মুর্গিহাটায় হাটাহাটি সুরু করিলেন। লোহা, পাট, কাঠ, চূণশুরকি প্রভৃতির সোপান বাহিয়া তিনি যখন খানিকটা উচ্চে উঠিয়াছেন—তখন দুর্ভিক্ষ আসিয়া উপস্থিত হইল। একজনের যখন দুর্ভিক্ষ তখন অপরের সুভিক্ষ হইতে বাধা নাই। অন্নদাবাবু একটি লঙ্গরখানার পরিচালক হইয়া বসিলেন এবং সুরাবর্দ্দি-খিচুড়ি দান করিয়া বহুলোকের প্রাণ হরণ করিলেন। অবশ্য খিচুড়ির সরকারী 'ফরমুলা' অন্নদাবাবুর প্রতিভায় রূপান্তরিত হইয়াছিল। সেইসঙ্গে তিনি একটি এরোড্রোম তৈয়ারীর কন্‌ট্রাক্টও পাইলেন। কিন্তু যুদ্ধ তাঁহার আশানুরূপ দীর্ঘতা পাইল না। হঠাৎ যখন যুদ্ধ শেষ হইল অন্নদাবাবু দেখিলেন তাঁহার তহবিলের স্ফীতি এমন হয় নাই যাহাতে তাঁহার অন্নকষ্ট হইতে পারে। কিন্তু যুদ্ধের প্রারম্ভেই যাঁহার মাথায় টিকটিকি পড়িয়া তিনবার ডাকিয়াছে তাহার তো এরূপ হইবার কথা নয়!

অবশেষে অন্নদাবাবুর সুবর্ণ সুযোগ আসিয়া উপস্থিত হইল। মাঘের শেষে শীত যেমন একবার অন্তিম-কাপড় দিয়া তাহার প্রতাপ বুঝাইয়া দেয়—যুদ্ধের শেষে তেমনি 'নোট-অর্ডিনান্স' প্রচারিত হইয়া ভাগ্যান্বেষীদের শেষ সুযোগ দিল। নোট-অর্ডিনান্স প্রকাশিত হইবামাত্র অন্নদাবাবু কিছু টাকা সঙ্গে করিয়া গ্রামাঞ্চলে চলিয়া গেলেন। সেখানে বিধবা ও অসহায় ব্যক্তিদের সঞ্চিত একশত ও হাজার টাকার নোটগুলির উপরে তাঁহার ভরসা। অল্পকালের মধ্যেই তিনি একশ টাকার নোট পঁচিশ টাকায় এবং হাজার টাকার নোট তিনশ চারশ টাকায় কিনিয়া লইয়া প্রভূত অর্থ সঞ্চয় করিলেন। কলিকাতায় ফিরিয়া একটি বড়

বাড়ী কিনিয়া ফেলিয়া সেই টিকটিকির প্রতি কৃতজ্ঞতায় তাহার নামকরণ করিলেন—'টিকটিকি-নিবাস।'

এবারে অন্নদাবাবুর আশা পূর্ণ হইল। তিনি ব্যবসা হইতে অবসর গ্রহণ করিয়া স্থায়ী ও নিশ্চিন্ত হইয়া বসিলেন এবং তাঁহার অন্নকষ্ট আরম্ভ হইল।

বিচক্ষণ ডাক্তারের দল আদ্যন্ত পরীক্ষা করিয়া বলিল—'হেভি ব্লাড প্রেশার।' তাঁহার আহার একরকম বন্ধ হইবার উপক্রম হইল। দুপুরবেলায় এক মুঠা ভাত ও রাত্রে সাগু বা বার্লি। তাহার বেশী কিছু গ্রহণ করিলেই তাঁহার মৃত্যু অনিবার্য।

অথচ তাঁহার অভাব নাই। অন্নদাবাবুর পুত্র পরিজন ঠিক তাঁহার সম্মুখেই সাতাশ তারায় বেষ্টিত চন্দ্রের ন্যায় নানাজাতীয় খাদ্যের বাটি সাজাইয়া আহারে বসে! অন্নদাবাবু পরমাত্মার ন্যায় জীবাত্মার খাদ্যগ্রহণ দেখিতে থাকেন। এক একবার মনে হয়—দূর ছাই, ডাক্তারে অমন অনেক কথাই বলে—পেট ভরিয়া খাওয়া যাক্। তথাপি মনে পড়ে—না, এমন করিয়া অকারণে মরিলে চলিবে না। এবারের যুদ্ধে লাভের যে-আশা স্বর্ণমৃগের মতো তাঁহাকে ছলনা করিয়া পালাইয়াছে—ধরিতে পারেন নাই—আগামী মহাযুদ্ধে তাহাকে করায়ত্ত করিতে হইবে। এই মহৎ সঙ্কল্প মনে হইবামাত্র তাঁহার জীবনের প্রতি আসক্তি আবার ফিরিয়া আসে। অমনি তিনি জীবনের সার্থকতা বুঝিতে পারিয়া ধ্যানস্থ হন। এমন সময় তাঁহার গৃহিণী রূপার বাটিতে বিশুদ্ধ রবিনসন বার্লি লইয়া উপস্থিত হয়। তিনি তাহা নিঃশেষে পান করিয়া—একটি তৃপ্তির 'আঃ' শব্দ করিয়া শুইয়া পড়েন। ঘুমাইয়া তিনি টিকটিকির স্বপ্ন দেখেন—তাহার রংটা সোনার! আগামী যুদ্ধের আশায় অন্নদাবাবু অন্নকষ্ট সহ্য করিয়া বাঁচিয়া আছেন। ইহাই তাঁহার অন্নকষ্টের ইতিহাস।

শেষ